ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব

মওলানা সদরুদ্দিন ইসলাহী

অনুবাদ ও সম্পাদনা

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

মওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব

অনুবাদ ও সম্পাদনা

হাফেজ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

প্রকাশক

নাকিব পাবলিকেশন্স

২০৮, পশ্চিম নাখাল পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮

পরিবেশনায়

খায়রুন প্রকাশনী

বিক্রয় কেন্দ্র ঃ বুক্‌স এন্ড কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)

দোকান নং- ২০৯, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা -১১০০

ফোন ঃ ৭১১৫৯৮২, ৮৩৫৪১৯৬, ০১৭১৫-১৯১৪৭৭, ০১৭১৩-০৩৪২৩০

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব
মূল ঃ মওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী
অনুবাদক ঃ হাফেজ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

প্রকাশকাল ঃ
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৮

৬ষ্ঠ প্রকাশ
আগস্ট ঃ ২০০৬ ইং
শাবান ঃ ১৪২৭
ভাদ্র ঃ ১৪১৩

প্রকাশক ঃ
ফাতিমা শিরীন (নিঝু)
নাকিব পাবলিকেশন্স
২০৮, পশ্চিম নাখাল পাড়া, ঢাকা

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
আবদুল্লাহ যুবাইর

শব্দ বিন্যাস ঃ
মোস্তাফা কম্পিউটার্স
১০/ই-এ/১ মধুবাগ, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মুদ্রণ ঃ
আফতাব আর্ট প্রেস, ২/১তনুগঞ্জ লেন, ঢাকা

ISBN— 984-8455-49-10

মূল্য ঃ ৭৫.০০ টাকা

ভূমিকা

ইসলাম আল্লাহর দেয়া একমাত্র জীবন আদর্শ হিসেবে দুনিয়ার বুকে অবতীর্ণ। মানুষের ব্যক্তিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনের সকল দিক ও বিভাগই এ জীবন আদর্শের অন্তর্ভুক্ত। তাই ইসলামের আবেদন শুধু ব্যক্তি জীবনের ক্ষুদ্র পরিসরেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর দাবি সামাজিক জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সমানভাবে পরিব্যাপ্ত। পবিত্র কুরআনের প্রতি তাকালে দেখা যায়, মহান আল্লাহ মানুষের শুধু ব্যক্তি চরিত্রের পরিশুদ্ধির কথাই বলেননি, বরং সমাজ-জীবনে ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, অন্যায়-অবিচারের মূলোৎপাটন ও ফৌজদারি অপরাধের শাস্তি বিধানেরও তাগিদ দিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, পবিত্র কুরআন দুনিয়ার বুকে ইস-লামের নিরংকুশ বিজয় অর্জন, আল্লাহদ্রোহী মতবাদগুলোর সমূল উৎপাটন এবং মানব জাতির কল্যাণ সাধনকে রাসূলে করীম (স) ও তাঁর উম্মতের মিশনরূপে চিহ্নিত করেছে।

একারণেই আমরা দেখতে পাই যে, রাসূলে আকরাম (স) মসজিদে নববীতে বসে লোকদেরকে শুধু নামায-রোযা, হজ্জ যাকাত ইত্যাকার ইবাদতের কথাই বলেননি, বরং সমাজ ও রাষ্ট্রের তাবত সমস্যাবলীর সমাধান করেছেন; এমনকি, একই মসজিদে বসে তিনি বিচারকার্য সম্পন করেছেন এবং যুদ্ধ -বিগ্রহ সংক্রান্ত নির্দেশনাও দিয়েছেন। তার পরবর্তী ন্যায়নিষ্ঠ খলীফাগণও একই রূপ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁদের কেউই জীবনকে ব্যক্তিক ও সামষ্টিক এই দুই পর্যায়ে বিভক্ত করে ইসলামকে ব্যক্তি জীবনের ক্ষুদ্র পরিসরে সীমিত করেননি; বরং ইসলামের প্রতিটি আইন-বিধান ও আদেশ-নিষেধকে পুরোপুরি কার্যকর করার জন্যে তাঁরা সর্বশক্তি দিয়ে চেস্টা করেছেন এবং গোটা মানব জাতির কাছে আল্লাহ্‌র দেয়া এই মহান জীবন আদর্শের কল্যাণকারিতাকে সর্বতোভাবে তুলে ধরেছেন।

কিন্তু সোনালী যুগের পতনের পর মুসিলম জাতির ঘাড়ে উমাইয়া-আব্বাসিয়া রাজতন্ত্রের অভিশাপ চেপে বসার ফলে ইসলামের এই জীবনমুখী বৈপ্লবিক ধারা-টি একেবারে হারিয়ে গেছে এবং ধীরে ধীরে একে একটি ব্যক্তিগত ধর্মের পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছে। এভাবে মুসলমানরা একটি মহান জীবন আদর্শের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে একটি আত্মমর্যাদাহীন ও পরমুখাপেক্ষী জাতিতে পরিণত হয়েছে। আজকে তারা মানবজাতির কল্যাণ সাধনের মত গুরুদায়িত্ব পালন তো দূরের কথা, জাতি হিসেবে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের কথাটি

পর্যন্ত বিস্মৃত হয়ে আল্লাহ্‌দ্রোহী জাতিগুলোর অন্ধ অনুকরণ করতেও দ্বিধাবোধ করছে না। এরফলে গোলামী ও দাসত্বের শৃংখল ছিন্ন করে দুনিয়ার বুকে স্বাধীন জাতি হিসেবেও তারা মাথা তুলতে পারছে না।

এই সর্বনাশা আত্মবিস্মৃতির কবল থেকে মুসলিম জাতিকে উদ্ধার করা এবং তাদের মনে হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যেই আলোচ্য গ্রন্থের অবতহারণা। মূল গ্রন্থকার ভারতের একজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও মননশীল লেখক। উর্দু ভাষায় লিখিত এ গ্রন্থটি আমি অনুবাদ করেছি ১৯৬৮ সালে এবং ইতিপূর্বে এর কয়েকটি সংস্করণী প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা থেকে। বর্তমানে গ্রন্থটি প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছে ঢাকাস্থ নাকীব পাবলিকেশন। এ সংস্করণে গ্রন্থটির মুদ্রণ ও অঙ্গসজ্জাও যথাসম্ভব উন্নত করা হয়েছে। পাঠক মহলে গ্রন্থটির সমাদর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় আমি মহান আল্লাহ্‌র দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

ঢাকা ঃ মে, ১৯৯৬

বিনয়াবনত
মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

প্রসঙ্গত

দুনিয়ার প্রতিটি জীবনাদর্শই নিজের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির জন্যে তার অনুসারীদের কাছে কঠোর পরিশ্রম ও প্রাণপণ সাধনা দাবি করে। নিজেকে বিজয়ীর বেশে প্রতিষ্ঠিত করার দাবি জানায় না—দুনিয়ায় এমন কোন জীবনাদর্শ নেই। ইসলামী জীবনাদর্শও এ-নীতিভঙ্গির ব্যতিক্রম নয়। একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-পদ্ধতি—একটি উৎকৃষ্ট জীবনাদর্শ হিসেবে ইসলামও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ও জয়যুক্ত করার উদ্দেশ্যে সর্বশক্তি দিয়ে সংগ্রাম করার জন্যে তার অনুবর্তীদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানায়। ইসলামের শিক্ষানুসারে আল্লাহ্ তা'আলা এ জন্যেই তাঁর নবীকে পাঠিয়েছেন আর এই উদ্দেশ্যেই তাঁর কিতাব নাজিল করেছেনঃ

لِيَقُوْمَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ

যাতে করে লোকদেরকে একটি সুবিচারমূলক ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত করে দেয়া হয়।

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ

যাতে করে তিনি ইসলামকে সকল ব্যবস্থা ও আনুগত্যের ওপর বিজয়ী করে দেন।

নবী করীম (স) যখন তাঁর জাতির লোকদের সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন, তখন বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী উভয়েই সে দাওয়াতের মর্মবাণীটি ভালমত উপলব্ধি করেছিল। তারা বুঝেছিল যে, ইসলাম শুধু নজর-নিয়াজ, পূজা-পার্বণ ও আত্ম-সংশোধনেরই দাবি করে না, বরং সে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্য সকল শক্তির খোদায়ী ও প্রভুত্বকে খতম করতে এসেছে। সে গোটা মানবজাতিকে গায়রুল্লাহর গোলামী থেকে মুক্ত করে প্রকৃত মালিক ও মনিবের সামনে অবনত হওয়ার আহ্বান জানায়। এ কারণেই দেখা যায় যে, রাসূলে খোদা (স) ইসলামের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং কুফরীর মুলোচ্ছেদের জন্যে তাঁর সর্বোত্তম শক্তি নিয়োজিত করেছিলে। এমনকি, যখন মসজিদে নববীর ছাদ ছিল ঘাস-পাতার তৈরী এবং মুসলমানরা তার কাঁচা মেঝেতে বসে নামায পড়ত, আল্লাহর রাসূল তখনো ইসলামের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, ইসলামের বাণী প্রচার এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অস্ত্র সংগ্রহ করার বিষয়ে চিন্তা করতেন।

কিন্তু কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম জাতি তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে ভুলতে শুরু করেছে। একটি বিপ্লবী আদর্শের ধারক ও বাহক হিসেবে নিজের

মর্যাদাকে সে হারিয়ে ফেলেছে এবং নিছক কতিপয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান আঁকড়ে ধরে আছে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে, বাঘ যেন একেবারে মেষের পর্যায়ে নেমে এসেছে। এর ফলে একদিকে মুসলমানরা অপমান ও লাঞ্ছনার গভীর অতলে নেমে গিয়েছে অন্যদিকে গোটা দুনিয়া—যাকে পথ দেখানোর দায়িত্ব ছিল মুসলমানদের ওপরই ন্যস্ত—চরম ভ্রান্ত পথে এগিয়ে চলেছে। ফলে মানুষের জীবন আজ তার নিজের কাছেই বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এহেন পরিস্থিতিতে এই জাতিকে আবার তার জীবন-লক্ষ্য স্মরণ করিয়ে দেয়া এক বিরাট গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوا بِعَهْدِيْ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ -

আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর আর তোমরা আমার সঙ্গে ওয়াদা পূরণ কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে ওয়াদা পূরণ করব।

আলোচ্য বইটি এই উদ্দেশ্যেই লেখা হয়েছে। সহৃদয় পাঠকদের খেদমতে এমনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বই পেশ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আল্লাহ কাছে দোয়া করিঃ এই বইয়ের মাধ্যমে মুসলমানদের হৃদয়ে ইসলামী জীবন ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগ্রহ ও সঙ্কল্প আবার জাগ্রত হোক।

সূচীপত্র

মুসলিম জাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য

জাতির বিশিষ্ট মর্যাদা

মুসলিম জাতি[১] সৃষ্টি প্রসঙ্গে মহান স্রষ্টা নিজেই তাঁর সম্পর্কে বলেছেনঃ

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (ال عمران)

তোমরাই সর্বোত্তম জাতি; তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে সমগ্র মানব জাতির জন্যে।

এ কথাটির দু'টি অংশ রয়েছেঃ

একঃ মুসলিম জাতিই হবে দুনিয়ার গোটা মানব জাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। অন্য কোন জাতি, কোন সম্প্রদায় বা কোন দলই চিন্তা ও কর্মের বৈশিষ্ট্যে তার সমকক্ষ হবে না। (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ)

দুইঃ এ জাতি–এ মুসলিম উম্মতটি দুনিয়ার সাধারণ জাতি, সম্প্রদায় ও দলগুলোর ন্যায় জীবনের রঙ্গমঞ্চে বাঁধা-ধরা নিয়মে এমনিই এসে হাযির হয়নি; বরং এক বিশেষ উদ্যোগে ও পরিকল্পনাসহ তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তার সৃষ্টির পিছনে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল রয়েছে। দুনিয়ার তামাম মানব গোষ্ঠী এবং তার মধ্যে একটি বুনিয়াদি পার্থক্য রয়েছে ; তা হচ্ছে এই যে, সে তাদেরই মত কোন নগণ্য দলমাত্র নয়, বরং সে তাদের সবার থেকে পৃথক এবং সবচাইতে শ্রেয়। তাকে এক বিশেষ প্রয়োজনের খাতিরে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আয়োজনের সঙ্গে প্রেরণ করা হয়েছে। সেই প্রয়োজন পুরণের দায়িত্বে সে অভিষিক্ত হয়েছে চিরদিনের জন্যে (اخرجت للناس)। তাই নবী করীম (সঃ)-এর হাদীসেও এই জাতিকে স্পষ্টত 'প্রেরিত' (مبعوث) উম্মত বলে অভিহিত করা হয়েছে। যেমনঃ

فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ (بخارى)

তোমরা নম্রতার সঙ্গে কাজ করার জন্যে 'প্রেরিত' হয়েছ, কঠোরতার মধ্যে নিক্ষেপ করার জন্যে 'প্রেরিত' হওনি।

---

১. মূল পুস্তকে 'উম্মত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে হচ্ছে একই ঈমান ও প্রত্যয়ের অনুসারী মানব সমষ্টি। এ হিসেবে উর্দু ভাষায় ব্যবহৃত কওম এবং ইংরেজী Nation শব্দ দু'টিকে এর সমার্থক বলা চলে না। কেননা শেষোক্ত শব্দ দু'টি ব্যবহৃত হয় একই বর্ণ, ভাষা ও দেশোদ্ভূত মানবগোষ্ঠী সম্পর্কে। –অনুবাদক

আল্লাহ্ এবং রসুলের উল্লিখিত ঘোষণা থেকে স্পষ্টত প্রমাণিত হয় যে, অন্যান্য জাতি ও সম্প্রদায়গুলো হচ্ছে এক প্রকৃতির আর মুসলিম জাতি হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। মুসলিম জাতি একটি স্বতন্ত্র ধরনের, একটি বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী। তার এ স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্য থেকে স্বতঃই প্রতিপন্ন হয় যে, নিজস্ব চিন্তাধারায়, নিজস্ব কর্মপন্থায়, নিজস্ব উদ্দীপনায়, নিজস্ব মূল্যমানে, নিজস্ব বিচারবোধে, নিজস্ব মেজাজ-প্রকৃতিতে, নিজস্ব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে–এক কথায় জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগেই তার পৃথক ও বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। তার কোন একটি বিষয়কেই অন্য কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে না।

সৃষ্টির উদ্দেশ্য

এই ব্যাখ্যা থেকে অন্তত একথা সুনির্দিষ্টভাবে জানা গেল যে, এই জাতির সৃষ্টির পিছনে কোন বিশেষ ও স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য রয়েছে। এখন জিজ্ঞাস্য হলো, তার সৃষ্টির পিছনে নিহিত সেই উদ্দেশ্যটি কি? কুরআন উপরে উল্লিখিত আয়াতেই এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছে। বলা হয়েছেঃ

تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ

তোমরা সৎকর্মের নির্দেশ দাও, দুষ্কর্ম থেকে বিরত রাখ এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান পোষণ কর।

অর্থাৎ যে বিশেষ কাজের জন্যে মুসলমানদের এই দলটিকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, তারা গোটা মানব জাতিকে দুষ্কৃতির পথ থেকে বিরত রাখবে এবং সুকৃতির পথে চালিত করবে।

এই বিশেষ কাজ বা বিশেষ উদ্দেশ্যটি বিবৃত করার জন্যে আল্লাহ্ তায়ালা আরো দু'টি পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। তার প্রথমটি হল 'সত্যের সাক্ষ্য' (شهادت حق) তিনি বলেছেনঃ

وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (بقرة)

এ ভাবেই আমরা (হে মুসলমান!) তোমাদেরকে একটি মধ্যপন্থী জাতি বানিয়েছি, যাতে করে তোমরা (অন্যান্য) মানুষের জন্যে সাক্ষী হতে পার।

এমনি অর্থবহ এবং এ ধরণেরই শব্দ-বিশিষ্ট একটি আয়াত সুরায়ে হজ্জেও বর্তমান রয়েছে। অবশ্য যে-বস্তুটির সাক্ষ্যদানের জন্যে এ জাতি প্রেরিত হয়েছে, এ সম্পর্কিত কোন আয়াতেই তা বিস্তৃত করে বলা হয়নি। তার কারণ এই যে, উক্ত জিনিসটি আপনা থেকেই অত্যন্ত সুস্পষ্ট। বস্তুত যে জিনিসটি তাকে আল্লাহ্ তায়ালার তরফ থেকে দেয়া হয়েছে, সেটি ছাড়া বিশ্ববাসীর সামনে আর কোন্

বস্তুটির সাক্ষ্যদানের জন্যে তাকে দায়িত্বশীল করা যেত? এর প্রমাণ উক্ত আয়াতে উল্লিখিত শব্দাবলীর পরবর্তী শব্দগুলোতেই বর্তমান রয়েছে। তাতে বলা হয়েছেঃ 'যাতে পয়গম্বর তোমাদের জন্যে সাক্ষী হন' (ويكون الرسول عليكم شهيدا)। ভেবে দেখা দরকার যে, ঈমানদার লোকদের সামনে কোন্ বস্তুটির সাক্ষ্যদানের জন্যে আল্লাহর রসূল প্রেরিত হয়েছিলেন ? যদি তাঁর প্রতি অবতীর্ণ বস্তুটি 'সত্য দ্বীন' (دين حق) হয়ে থাকে আর এব্যাপারে কোন দ্বিমতের অবকাশ না থাকে, তাহলে এ-ক্ষেত্রেও কোন দ্বিমতের সম্ভাবনা নেই যে, যে-বস্তুটির সাক্ষ্যদানের জন্যে এ মধ্যবর্তী জাতির (امة وسط) অভ্যুদয় ঘটেছে, তা সেই সত্য দ্বীন ছাড়া আর কিছুই নয়। তাকে যেমন 'সত্য দ্বীন' বলে আখ্যা দেয়া যেতে পারে, তেমনি শুধু 'সত্য' (حق) বলেও উল্লেখ করা চলে।

দ্বিতীয় পরিভাষাটি হচ্ছে 'ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা' (اقامت دين)।

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ (شورى)

(হে মুসলমানগণ!) আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে সেই দ্বীন (জীবন-ব্যবস্থা)কে নির্ধারিত করেছেন, যা তিনি নূহ (আ)-এর প্রতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন আর (হে নবী) এখন তোমার প্রতি আমরা যার অহী নাযিল করেছি এবং আমরা ইব্রাহীম (আ), মুসা, (আ) ও ঈসা (আ)-কে এ নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, এ দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা) সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা বনর্ণা প্রসঙ্গে বলেনঃ

اِخْتَارَهُمُ اللّٰهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهٖ وَلِاقَامَةِ دِيْنِهٖ (مشكوة)

তাঁদেরকে আল্লাহ্ তাঁর নবীর সাহচর্য এবং তাঁর দ্বীনের প্রতিষ্ঠার জন্যে মনোনীত করেছেন।

এ হাদীসও এ-সত্যকে প্রমাণ করে যে, এ জাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্র মনোনীত দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা।

কুরআন বা হাদীসের উল্লেখিত তিনটি উদ্ধৃতির পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম জাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য হিসেবে যে কোন পরিভাষা গ্রহণ করা যেতে পারে। বলা যেতে পারে যে, এ জাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে 'সুকৃতির আদেশ ও দুষ্কৃতির প্রতিরোধ' (امر بالمعروف ونهى عن المنكر)। আবার এ-ও বলা যেতে

পারে যে, 'সত্যের সাক্ষ্য' ও 'ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা' হচ্ছে এর উদ্দেশ্য। কারণ এ তিনটি পরিভাষা একটি উদ্দেশ্যকেই বিভিন্ন রূপে প্রকাশ করেছে মাত্র। কাজেই এ তিনটির ভিতর থেকে যে-কোনটিকে ব্যবহার করা হবে, তার অর্থ ও লক্ষ্য সর্বাবস্থায় একই রূপ থাকবে।

কিন্তু অর্থ ও লক্ষ্যের অভিন্নতা সত্ত্বেও এ তিনটি পরিভাষা গভীরভাবে পর্যালোচনা করে, সকল দিক থেকে এর গুরুত্ব বিচার করলে দেখা যাবে যে, শেষোক্ত পরিভাষাটিতে যে পূর্ণতা, ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি রয়েছে, অন্যান্য পরিভাষায় তা নেই।

অধিকতর পূর্ণতার কারণ হল এ যে, এতে 'প্রতিষ্ঠা' (اقامت) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। প্রতিষ্ঠা শব্দটি একটি পূর্ণ অবস্থার চিত্র পেশ করে। পরবর্তী ব্যাখ্যা থেকে এটা সুস্পষ্টভাবে জানা যাবে।

অধিকতর ব্যাপকতার কারণ হলো, সংশ্লিষ্ট আয়াতে শুধু এটুকুই বলে দেয়া হয়নি যে, অমুক জিনিসটি মুসলমানদের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য; বরং সেই সঙ্গে এ কথাও সুস্পষ্টরূপে বলে দেয়া হয়েছে যে, এ কর্তব্য প্রত্যেক নবী এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীর উপরও ন্যস্ত ছিল। অন্যকথায় বলা হয়েছেঃ আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান পোষণ এবং তাঁর বন্দেগীর শপথ গ্রহণের মানেই হচ্ছে এ যে, তাঁর মনোনীত জীবন-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

অধিকতর বিস্তৃতির কারণ হলো যে, ঈমানদার লোকদেরকে যে জিনিসটির প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সংশ্লিষ্ট আয়াতে তা স্পষ্টত বিবৃত হয়েছে এবং নামোল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এ বস্তুটি হচ্ছে 'আদ্দীন' অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালার মনোনীত জীবন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা।

এ বৈশিষ্ট্যগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে এখানে 'ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা'—এ পরিভাষাটিকেই প্রধান পরিভাষা হিসেবে সাব্যস্ত করতে হলো। এ কারণে মুসলিম জাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনায় এর ব্যবহারই অধিকতর সমীচীন হবে।

ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অর্থ

'ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা' (اقامت دين) এ পরিভাষাটি মূলত দু'টি শব্দ দ্বারা গঠিত হয়েছে। প্রথমত 'প্রতিষ্ঠা' (اقامت) দ্বিতীয়ত 'জীবন-ব্যবস্থা' (دين)। এ কারণেই এর অর্থ বুঝতে হলে প্রথমত শব্দ- দু'টির পৃথক পৃথক অর্থ বুঝে নেয়া দরকার।

'প্রতিষ্ঠা' (اقامت) শব্দটি যখন কোন নিরেট বস্তুর জন্যে ব্যবহৃত হয়, তখন তার অর্থ হয় 'সোজা করা'। কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ

يُرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ (كهف)

'প্রাচীর (একদিকে ঝুঁকে পড়েছিল এবং) ধ্বসে পড়তে চেয়েছিল, কিন্তু সে তাকে সোজা করে দিল।'

আর যখন নিরেট বস্তুর পরিবর্তে কোন বিমুর্ত জিনিসের জন্যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়, তখন তার অর্থ দাঁড়ায় 'সুষ্ঠুভাবে কর্তব্য পালন করা'। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট কাজটিকে পরিপুর্ণ অভিনিবেশ ও প্রস্তুতির সঙ্গে উত্তমরূপে সম্পাদন করতে হবে। অভিধান শাস্ত্রে সুপন্ডিত আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেনঃ

اِقَامَةُ الشَّيْءِ تَوْفِيَتُهٗ حَقَّهٗ وَقَالَ قُلْ يَاَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ اَىْ تُوفُوْنَ حُقُوْقَهَا بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ (المفردات)

'কোন জিনিসকে প্রতিষ্ঠা করার তাৎপর্য এ যে, তার প্রতি যাবতীয় কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করতে হবে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেনঃ 'হে নবী, বলে দাও যে, হে আহলে কিতাব! তোমরা কোন সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নও, যতক্ষণ না তাওরাত ও ইঞ্জিলকে প্রতিষ্ঠিত করবে'। অর্থাৎ যতক্ষণ জ্ঞান ও বাস্তব উভয় দিক থেকে তাদের প্রতি কর্তব্য পালন না করবে।'

এ অর্থটিকে একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বোঝা যেতে পারে। কুরআনে নামায প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়া হয়েছে (اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ)। এখন 'প্রতিষ্ঠা' (اقامت) শব্দের উপরোক্ত অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে নামায প্রতিষ্ঠার অর্থ দাঁড়াবে এ যে, তার সমস্ত প্রকাশ্য রীতি-নীতি ও শর্তাবলী এবং তামাম অপ্রকাশ্য গুণরাজির সঙ্গে তাকে আদায় করতে হবে। এমনিভাবে আদায় করতে হবে যে, নামাযের উদ্দেশ্য যেন অতি সুন্দরভাবে অর্জিত হয়। অতএব, 'ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার' অর্থ হচ্ছে এই যে, তার অনুগামীগণ চিন্তা ও কর্ম উভয় দিক থেকে তার প্রতি বিশ্বাসের হক আদায় করবে।

কুরআনে ব্যবহৃত 'দ্বীন' (دين) শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–আনুগত্য আর পরিভাষা হিসেবে এর তাৎপর্য হচ্ছে–আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে নবীর মাধ্যমে তাঁর বান্দাদেরকে প্রদত্ত বন্দেগী ও জীবনযাত্রা প্রণালী। আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর রসুলের সুন্নাতে এই বন্দেগী ও জীবনযাত্রা প্রণালী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। সেই সব বর্ণনা সামনে রাখার পর এ কথায় আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, মানুষের কোন সমস্যা এবং জীবনের কোন একটি দিক ও বিভাগই এর পরিধির বাইরে নয়। এই দ্বীন বা জীবন-পদ্ধতি মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, বোধশক্তি এবং অন্তঃকরণের গভীরতম প্রদেশ থেকে শুরু করে তার

ইবাদাতগাহ্, তার গৃহের চার দেয়াল,তার বংশ-খান্দান এবং তার সামাজিক ও তামদ্দুনিক সংস্থাগুলো সমেত তার সমস্ত সামাজিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যার চরম প্রান্ত অবধি উপনীত হয়। সে প্রতিটি প্রশ্নে, প্রতিটি বিষয়ে এবং প্রতিটি দিক ও বিভাগ সম্পর্কেই সুনির্দিষ্ট পথ-নির্দেশ দান করে। সে মানুষের জন্যে এমন কোন ঘরোয়া (private) জিন্দিগী আদৌ সমর্থন করে না, যেখানে সে নিজের ইচ্ছা মাফিক কাজ করার স্বাধীনতা পাবে। সে মানুষের জন্যে এমন কোন 'দুনিয়া'র অস্তিত্ব স্বীকার করতে মাত্রই প্রস্তুত নয়, যেখানে সে নিজে উপস্থিত থাকবে না। সে প্রত্যয় (ايمانيات), আকায়েদ, ইবাদত, আখলাক (নৈতিকতা), তাকওয়া ও ইহসানকে যেমন নিজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে ঘোষণা করে, তেমনি পেশাব-পায়খানার রীতি-নীতি এবং দাম্পত্য সম্পর্কের ন্যায় বিষয়গুলোকেও নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন কোন জিনিস বলে স্বীকার করে না। এমন কি, অপরাধীর শাস্তিদানকেও সে 'আল্লাহর দ্বীন' বলে অভিহিত করেছে (وَلَا تَأْخُذْكُمْ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ-نور)। অনুরূপভাবে রাষ্ট্র পরিচালন, আইন প্রণয়ন, যুদ্ধ-সন্ধি ইত্যাদিকেও সে নিজের ইখতিয়ারভুক্ত বলে ঘোষণা করেছে।

'প্রতিষ্ঠা' (اقامت) ও 'দ্বীন' (دين) শব্দদ্বয়ের এই অর্থ সামনে রাখলে 'ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা' কথাটির মানে স্বভাবতঃই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'প্রতিষ্ঠা' (اقامت) শব্দের মানে হচ্ছে–চিন্তা ও কর্ম উভয় দিক থেকে সুষ্ঠুভাবে র্কতব্য পালন করা, আর দ্বীন (دين) শব্দের অর্থ হচ্ছে–আল্লহ্ তায়ালার পুর্ণাঙ্গ আনুগত্যের সঙ্গে জীবনের কোন একটি দিকও সম্পর্কহীন নয় এবং যার দাবি মানবীয় সমস্যার শেষ প্রান্তে গিয়ে পরিসমাপ্তি লাভ করে। কাজেই 'ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা'র (اقامت دين) সুনিশ্চিত অর্থ এই হবে এবং একমাত্র এটিই হতে পারে যে, এ ব্যবস্থার প্রতি ঈমান পোষণকারীগণ এ সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান লাভ করবে, এর বুনিয়াদী ধ্যান- ধারণা, রীতি-নীতি ও বিধি-বিধান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবে এবং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে পরিচিত হবে। সেই সঙ্গে সে এ দুনিয়ায় তাদেরকে কি মর্যাদা (position) দিয়েছে, তাদের সৃষ্টির কি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছে, সেই লক্ষ্য অবধি পোঁছানোর জন্যে চেষ্টা ও সাধনার কি পথ-নির্দেশ করেছে, তাদেরকে কি কি কাজ করার আদেশ দিয়েছে এবং কোন্ কোন্ কাজ থেকে বিরত রেখেছে, জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে তাদেরকে কী ভূমিকা গ্রহণের উপদেশ দিয়েছে, মোটকথা ব্যক্তিগত ও জাতিগতভাবে সে তাদের কাছে এ দুনিয়ায় কি ভাবে বসবাস করার, কি কি কাজ করার এবং কোন্ বস্তুতে পরিণত হবার দাবি জানায়–সে সব বিষয়ে তারা পুরোপুরি জ্ঞান অর্জন করবে। অতঃপর সেই জ্ঞান অনুসারে নিজেদের আচরণ ও ক্রিয়াকলাপ বিন্যস্ত ও পরিশুদ্ধ করতে শুরু করবে। কুরআন ও সুন্নাহর

প্রতিটি নির্দেশকে পালন করবে। শরীয়তের প্রতিটি বিধানকে কার্যকর করবে। ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার তাবত রীতি-নীতির ওপর এবং একমাত্র এরই ওপর জাতীয় জীবনের ইমারত গড়ে তুলবে। যে কোন ব্যাপারে কেবল এই দ্বীনের শেখানো দৃষ্টিভঙ্গিই গ্রহণ করবে এবং গোটা সমাজকে (society) এরই কাঙ্খিত রূপে গড়ে তুলবে। এমন কি, দর্শকের চোখে যেন গোটা সমাজ ও পরিবেশ একটি জীবন্ত ও গতিশীল কুরআন বলে মনে হয়। অন্য কথায়, একটি সুউচ্চ বস্তুকে সোজা খাড়া করে দিলে দর্শক যেমন একদৃষ্টিতেই তার আপাদমস্তক দেখে নিতে পারে, তেমনি এই গোটা 'দ্বীনকে' মানব জীবনে কার্যকর ও প্রভাবশীল করে তুলতে হবে–যাতে করে দূর-দূরান্তর থেকে একে দেখা মাত্রই 'চিনে' নেয়া যেতে পারে।

লক্ষ্য-বিস্মৃতির পরিণাম

নীতি ও লক্ষ্যের গুরুত্ব

কোন বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যের অনুগামী জাতির অস্তিত্ব নির্ভর করে আপন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি তার স্থির দৃষ্টির ওপর। আর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টির স্থিরত্ব নির্ভর করে সে লক্ষ্য অবধি পৌঁছবার রীতি-নীতির প্রতি সংশ্লিষ্ট জাতির আন্তরিক ভালবাসার ওপর। সে-জাতির লোকদের মধ্যে যদি আপন লক্ষ্যের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ এবং আপন রীতি-নীতির প্রতি গভীর প্রত্যয় বর্তমান থাকে, তবে তার কখনো বিলুপ্তি ঘটতে পারে না। এ অনুরাগ ও প্রত্যয়ই এ কথার নিশ্চয়তা দেয় যে, সম্মান ও সৌভাগ্য থেকে এ জাতি কখনো বঞ্চিত হতে পারে না। পরন্তু এ অনুরাগ ও প্রত্যয়ের স্বাভাবিক ও অনিবার্য দাবি হচ্ছে এই যে, জাতির সামাজিক ব্যবস্থাপনা তার নিজেরই করায়ত্ত থাকবে। তার কাম্য রীতি-নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, এমন কোন সামাজিক ব্যবস্থাপনা তার ওপর চেপে বসবে–এহেন পরিস্থিতিকে সে এক লহমার জন্যে বরদাশ্‌ত করতে পারে না। ঘটনাচক্রে এমন দুর্দিন যদি কখনো তার জীবনে এসেই পড়ে, তাহলে তার প্রতিটি ব্যক্তি ডাঙায় তোলা মাছের মত অস্থির হয়ে যাবে–আপন লক্ষ্য, নীতি ও জীবনধারার অনুরক্তি তাকে জীবন পণ করতে বাধ্য করবে। প্রচলিত জীবন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তার আপাদমস্তক উদ্বেল হয়ে উঠবে, তার সাথে কোনরূপ সক্রিয় সহযোগিতা বা আপোস-রফার ধারণা পর্যন্ত তার পক্ষে অসহনীয় হয়ে দাঁড়াবে। কেননা সে জানে যে, তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন যে রীতি-নীতির দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, এ অবাঞ্ছিত ব্যবস্থা তার টুঁটি চেপে রেখেছে। এ উদ্বেলতা ঠিক তখনি প্রশান্তির রূপ পরিগ্রহ করতে পারবে, যখন এ বাতিল পদ্ধতির ইমারত ভূমিসাৎ হয়ে পড়বে।

পক্ষান্তরে কোন জাতির মধ্যে যদি আপন নীতির প্রতি আস্থা শিথিল হয়ে যায় এবং নিজস্ব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি ভালবাসা নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে, তবে তাকে তার বিলুপ্তির অবধারিত লক্ষণ মনে করতে হবে। এ শিথিল আস্থা ও নিস্পৃহতার ফলে তার মধ্যে অপর কোন ব্যবস্থার সঙ্গে সহযোগিতা এবং বোঝাপড়ার মনোভাব জাগ্রত হলে তাতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই। এমন মনোভাব জাগ্রত হবার অর্থ হচ্ছে এই যে, জাতীয় জীবনের রক্ষাকর্তারা ধনাগারের চাবি শত্রুর হাতে তুলে দিয়েছেন। এখন যে কোন দিনই এ ধনাগার লুণ্ঠিত হতে পারে।

একে কেউ রোধ করতে পারলে একমাত্র কোন অলৌকিক শক্তিই তা করতে পারে। পরন্তু এ দুনিয়ায় পতন-উত্থান নির্বশেষে কারো প্রকৃতিতেই স্থিরতা নেই। এ কারণেই তার বিশ্বাস ও অনুরক্তিতে ঐ পতনের ক্রিয়াশীলতা আপন গতিতেই যথারীতি এগোতে থাকে। অবশেষে এক জায়গায় পৌঁছে সে এ ধন লুণ্ঠনের অনুভূতিটুকু পর্যন্ত লুটে নিয়ে যায়। বস্তুত এ সময়েই জাতির লোকদের মধ্যে ভিন্ন রীতি-নীতি ও জীবন-পদ্ধতির গোলামী করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এ সময় তারা সহযোগিতা ও আপোস-রফারও চরম প্রান্তে গিয়ে উপনীত হয়। তাদের নিজস্ব আদর্শিক ও নৈতিক মর্যাদার কথা তখন আদৌ স্মরণ থাকে না। তারা তখন নিজস্ব লক্ষ্য ও নীতি থেকে এতখানি বিচ্যুত হয়ে যায় যে, তাদের বাস্তব আচরণ এ জিনিসগুলোর ভ্রান্তি ও অগ্রহণযোগ্যতার পক্ষেই সাক্ষ্য দিতে শুরু করে। তারা নিছক তত্ত্ব (কদণমরহ) হিসেবেও এতটুকু স্বীকার করতে রাজী নয় যে, সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপর আবার এ আদর্শের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে কোনরূপ সংগ্রাম করতে হবে; বরং কোন কেন্দ্র থেকে এ ধরনের কোন আওয়াজ উচ্চারিত হলে তাকে তারা বিস্ময়ের সঙ্গে শ্রবণ করে এবং বিরোধ ও বিদ্বেষপূর্ণ ভাষায় তার জবাব দেয়। বস্তুত এমনিতরো স্থানে পৌঁছেই একটি আদর্শিক জাতির অপমৃত্যু ঘটে এবং তার অযোগ্য ও অপদার্থ সন্তানরা তাকে স্বহস্তেই মাটির তলদেশে সমাধিস্থ করে দেয়।

এই শেষোক্ত অবস্থায় জাতি বৈষয়িক দিক থেকেও একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং দুনিয়ার ধন-মাল ও রাজনীতিতে তাঁর জন্যে কোন ঠাঁই থাকবে না, এমন কোন কথা নেই; বরং সাধারণ পার্থিব কলা-কৌশল প্রয়োগ করে তার পক্ষে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও একটি বিরাট ও বিশিষ্ট মর্যাদার (position) অধিকারী হওয়া এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিপত্তি ও ঐশ্বর্যের জাঁকজমক এবং জাতীয় শক্তি ও মর্যাদা লাভ করা মোটেই অসম্ভব ব্যাপার নয়। কিন্তু এই সব মাহাত্ম্য ও প্রতিপত্তি সত্ত্বেও জাতির বুনিয়াদী লক্ষ্য ও নীতির দৃষ্টিতে তার অস্তিত্ব অনস্তিত্বেরই নামান্তর মাত্র। কারণ যে নীতি ও আদর্শের লাশ তার পদতলে পিষ্ট ও দলিত হচ্ছে, তার সীমাহীন লাঞ্ছনা বা গগণচুম্বী মর্যাদার সঙ্গে সে-লাশের কী সম্পর্ক? তার সম্পর্ক কেবল এ প্রশ্নের সঙ্গে থাকতে পারে যে, তাকে বিজয়ী ও কর্তৃত্বশীল করার ব্যাপারে জাতির লোকদের হৃদয়ে কতটুকু অনুরাগ রয়েছে? তার জন্যে তারা নিজস্ব জান-মাল, উপায়-উপকরণ ও শক্তি-সামর্থ্য কতটা কুরবানী দিচ্ছে? কিন্তু এসব কিছু না থাকলে সে-আদর্শ নিজেই বরং তাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করে দিবে। অতঃপর এর ধারকদের পক্ষ থেকেও সেই ঘোষণার সত্যতা স্বীকার করে নেয়াই হবে ন্যায়পরতা ও দায়িত্বানুভূতির স্বাভাবিক দাবি। এরপরও উক্ত আদর্শের নাম যথারীতি উচ্চারণ করা এবং এককালে তার সঠিক

প্রতিনিধিত্বের কারণে প্রাপ্ত জাতীয় উপাধি ধারণ করা তাদের পক্ষে কিছুতেই সঙ্গত হতে পারে না। কেননা এখন আর তারা তার প্রতিনিধি নয়।

ইসলামী নীতির একক বৈশিষ্ট্য

এ নীতিগত সত্যটি দুনিয়ার যে কোন জাতির বেলায়ই প্রযোজ্য। মুসলিম জাতিও এ সাধারণ নীতির ব্যতিক্রম হতে পারে না। তারও বাস্তব জীবনের স্থিতি, সূচনা ও সমাপ্তি তার জীবন-লক্ষ্য ও জীবন-আদর্শের ওপর নির্ভরশীল। অপর কোন জাতির পক্ষে তার বুনিয়াদী নীতি ও আদর্শের যেমন গুরুত্ব, তার পক্ষেও ঠিক তেমনি, বরং তার চাইতেও বেশি নিজস্ব আদর্শের গুরুত্ব। কেননা, জীরন সম্পর্কে অন্যান্য মতবাদের তুলনায় ইসলামী মতাদর্শের একটি বিশেষত্ব রয়েছে। তার এমন একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অপর কোন মতবাদ (ism) বা জীবন-ব্যবস্থায় খুঁজে পাওয়া যায় না। দুনিয়ায় একমাত্র ইসলাম ছাড়া আর সব মতাদর্শই মানুষের মস্তিষ্ক থেকে উদ্ভূত। এ কারণেই নিত্য-নতুন চিন্তা-ভাবনা, অভিজ্ঞতা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তথ্যের আলোকে তার ভিতরে পরিবর্তন ও সংশোধনের অবকাশ হামেশাই থেকে যায়। এমনকি, প্রয়োজনের বশীভূত হলে তার ভিতরে দেদার বহিরাগত নীতি পর্যন্ত স্থান দেয়া হয় এবং এ ব্যাপারে তার একান্ত নিষ্ঠাবান ও উৎসাহী অনুবর্তীও সাধারণত কোন টু-শব্দ পর্যন্ত করতে চায় না। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে ইসলামের ব্যাপার সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইসলামের দাবি হচ্ছে এই যে, তার পেশকৃত জীবনাদর্শ ও রীতি-নীতি কোন মানবীয় মস্তিষ্ক থেকে উদ্ভুত নয়; বরং এ হচ্ছে এমন মহাজ্ঞানী কর্তৃক উদ্ভাবিত–মানবজাতির স্বাভাবিক দাবিসমূহ, তার ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সুযোগ-সুবিধা এবং তার তামাম গোপন ও প্রকাশ্য চাহিদা সম্পর্কে যার নির্ভুল পরিমিতি বোধ রয়েছে এবং যার দৃষ্টি থেকে মানব জীবনের কোন একটি দিকও প্রচ্ছন্ন নয়। এ কারণেই এ মতাদর্শটি পূর্ণাঙ্গ, ন্যায়ানুগ ও সুষম মতাদর্শ। প্রকৃতির নিরেট সত্যের ওপর এটি প্রতিষ্ঠিত। এর ক্ষেত্র বিশ্বব্যাপক ও বিশ্ব-জনীন। স্থান ও কালের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী থেকে এটি সম্পূর্ণ মুক্ত এবং কোন রূপ সংশোধন ও পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা থেকে চিরদিনের জন্য বেনিয়াজ। মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিন্তা-ভাবনা, নিত্য-নতুন অভিজ্ঞতা ও তথ্য এর কোন একটি মূলনীতিকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না। এ কারণেই কেউ এর অনুবর্তিতার দাবি করার পরও এমন কোন দুঃসাহসের পরিচয় দিতে চাইলে সে হবে তার বিদ্রোহীদের অন্তর্ভুক্ত, তার অনুবর্তীদের মধ্যে নয়।

বলা যেতে পারে যে, ইসলামের এই ভূমিকা অত্যন্ত কঠোর এবং আদ্যপান্ত একনায়কত্বসুলভ। কিন্তু এ কথা কেবল এমন ব্যক্তিই বলতে পারে, যে ইসলামের খোদায়ী মতাদর্শ হবার দাবিই অস্বীকার করে কিংবা যে প্রকৃত সত্য

আর অনুমানের মধ্যে পার্থক্যই করতে জানে না এবং খোদায়ী জ্ঞানকে মানবীয় জ্ঞানের তুল্য বিবেচনা করে। নচেত এক ব্যক্তি খোদায়ী জ্ঞানকে ইসলামের পেশকৃত আদর্শের উৎস বলে ঘোষণা করবে এবং সেই সঙ্গে এ আদর্শকে সংশোধন ও পরিবর্তনযোগ্য বলেও দাবি করবে–বুদ্ধিবৃত্তির এর চাইতে বড় দেউলিয়াপনা আর কী হতে পারে! এ মতাদর্শের কোন ঘোরতর বিরোধীও সততা ও ন্যায়পরায়নতার দৃষ্টিতে কাউকে এ স্বাধীনতা দিতে পারে না যে, একদিকে সে ইসলামের প্রতি আস্থা ঘোষণা করবে, অন্যদিকে তার নীতি ও আদর্শের মূলে কুঠারাঘাত হানতে থাকবে। অবশ্য ইসলামের পূর্ণতার দাবির মধ্যে যদি কেউ অসম্পূর্ণতা দেখতে পায় এবং তার দৃষ্টিতে এর কোন নীতি সংশোধন ও পরিবর্তনযোগ্য বলে বিবেচিত হয়, তবে ইসলামকে বর্জন করার অধিকার তার সর্বদাই থাকবে।

এই বৈশিষ্ট্যকে অন্তর্নিবিষ্ট করে নেয়ার পর একথা সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, অপর কোন জাতির পক্ষে আপন মতাদর্শের বিরোধী আদর্শ ও মতবাদের সঙ্গে সহযোগিতা ও আপোস-রফা করা হয়ত সম্ভব হতে পারে; কিন্তু ইসলামের নামে গঠিত জাতির পক্ষে কোন অনৈসলামী জীবন পদ্ধতির সঙ্গে সমঝোতা বা আপোস-রফার ধারণা পর্যন্ত করা অবৈধ। তাই দেখা যায় যে, কুরআনের অবতরণ ও মিল্লাতে ইসলামিয়ার ভিত্তি স্থাপন কালে বিরুদ্ধ-শিবির (Camp) থেকে এ ধরনের নীতি (Policy) গ্রহণের জন্যেই বারংবার প্রস্তাব আসছিল। কিন্তু নবী করীম (স) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীগণকে উক্ত প্রস্তাবের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করার জন্যে আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে চূড়ান্ত নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়ঃ উক্ত শিবিরের লোকেরা তাদের ইসলাম-বিরোধী অপকৌশল ও তৎপরতাকে কোনক্রমেই সফল হতে না দেখে নবী করীম (স)-এর কাছে এই প্রস্তাব পেশ করেছিলঃ

ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَا اَوْ بَدِّلْهُ (يونس)

এ কুরআনের পরিবর্তে অপর কোন কিতাব নিয়ে আসুন অথবা এতে রদবদল করে দিন

এই প্রস্তাব থেকে এর উত্থাপকদের অভিপ্রায় অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। প্রকৃতপক্ষে এ ছিল একটি প্রস্তাব বা দাবির চাইতেও বেশি–তাদের পক্ষ থেকে এক আপোস-ফর্মূলা। তাদের বক্তব্য ছিল এই যে, মুহাম্মদ (স) তাঁর শিক্ষা-দীক্ষার ভিতর তাদের মুশরিকী আকায়েদ ও ধ্যান-ধারণার জন্যে কিছু ঠাঁই করে দিলে তারাও তাঁর বিরুদ্ধতা থেকে বিরত থাকবে এবং তাঁর কথা মেনে নিয়ে তাঁর একান্ত বাধ্য ও অনুগত হয়ে যাবে। তাদের এ প্রস্তাব বা

আপোস-ফর্মূলার জবাবে আল্লাহ্ তায়ালা নবী (সঃ)-কে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেনঃ

قُلْ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنْ أُبَدِّلَهُۥ مِن تِلْقَآئِ نَفْسِيٓ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّ

(يونس)

(হে নবী) তাদেরকে বলে দাও যে, আমি নিজের পক্ষ থেকে এই কুর্‌আনে কোন রদবদল করার মোটেই অধিকারী নই। আমি তো শুধু তারই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি অবতীর্ণ হয়।

নীতিগত ও মৌলিক বিষয়ের রদবদল তো অনেক বড় জিনিস। এমনকি আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নবীকে এ সম্পর্কেও অত্যন্ত কঠোরভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, সময়ের চাহিদা ও পরিস্থিতির দাবি যাই হোক না কেন, শরীয়তের কোন একটি খুঁটিনাটি আইনকেও তিনি রদবদল করতে পারেন নাঃ

أَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ (مائدة)

হে নবী! খোদার অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী তাদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা কর এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর না। (দেখো) এ-সম্পর্কে হুঁশিয়ার থেক, যেন খোদার অবতীর্ণ বিধানের কোন অংশ থেকে (গাফেল করে) এরা তোমায় ফেতনার মধ্যে নিক্ষেপ না করে।

এ হচ্ছে ইসলামী শিক্ষার ভিতর মৌলিক বা খুঁটিনাটি সংশোধনের আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টার ব্যাপার। এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে তারা আর একটি আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয়। তা হলো এই যে, মুহাম্মদ (সঃ) ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে আপোস-রফা করলে তারাও এ নীতি অবলম্বন করবে وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ - قلم: ٩ আর এতে করেই এ দ্বন্দ্বের অবসান হয়ে যাবে। এখানে 'আপোস-রফা'র অর্থ এই যে, রসূলে করীম (সঃ) শির্কের সমালোচনা থেকে বিরত হবেন এবং শুধু ইতিবাচক (Positive) দৃষ্টিতে তওহীদের দাওয়াত প্রচার করেই ক্ষান্ত থাকবেন। অর্থাৎ তাদের পয়লা প্রস্তাবটা ছিল ইসলাম ও শির্কের একটি জগাখিচুড়ী বানানোর আকাঙ্ক্ষা আর দ্বিতীয় প্রস্তাবটি ছিল ইসলাম ও শের্কের শান্তিপুর্ণ সহ-অবস্থানের আকাঙ্ক্ষার ফল। কিন্তু প্রথমটি গ্রহণ করা যেভাবে অসম্ভব বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল, তেমনি তাদের এই দ্বিতীয় প্রস্তাবটিও সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করা হলো। সেই সঙ্গে এ ধরনের কথার প্রতি আদৌ কর্ণপাত না করার জন্যেও আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ প্রদান করলেন।

কুরআনের এই সব ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ শুধু ইসলামের মূলনীতিরই নয়, বরং তার ব্যাপক শিক্ষা এবং বিশিষ্ট মেজাজ ও প্রকৃতির যথার্থ মর্যাদাও অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় নির্ধারণ করে দেয়। অতঃপর আর কাউকে একথা বলার অনুমতি দেয়া যেতে পারে না যে, ইসলামকে গ্রহণ করার পরও তার নীতি ও আদর্শের অনুসৃতিতে মানুষের আজাদী রয়েছে এবং প্রয়োজনমত তাতে সংশোধন ও পরিবর্তনও সে করতে পারে।

লক্ষ্য-সচেতনতার আদর্শ নমুনা

আজকে মুসলিম জাতির বাস্তব অবস্থা যা-ই হোক না কেন, কিন্তু আপন জিন্দিগীর সূচনায় প্রত্যেক আদর্শবাদী জাতির মতই এ জাতিও নিজস্ব লক্ষ্যের প্রতি গভীর অনুরাগ এবং আপন নীতি ও আদর্শের প্রতি নির্ভেজাল প্রত্যয় নিয়েই জেগে উঠেছিল। সে এমনিভাবে উত্থিত হয়েছিল যে, কোন বৃহত্তম বাধার পাহাড়ও তার মোড় ঘুরাতে সমর্থ হয়নি। এ পথে তাকে কিসের না সম্মুখীন হতে হয়েছে? জান ও মালের অগুণতি মুসীবত তার উপর ভেঙ্গে পড়েছে। কঠিনতম বিপদাপদ তাকে হুমকি দিয়েছে। রাতের ঘুম ও দিনের বিশ্রাম থেকে সে বঞ্চিত হয়েছে। এমনকি কারাভোগের পরীক্ষা পর্যন্ত তাকে দিতে হয়েছে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী—এবং তার এ সাক্ষ্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয় যে, দুঃখকষ্ট ও বিপদ-মুসীবতের এ ভয়াবহ ঝড়-তুফানের মধ্যেও এ জাতি তার আসল লক্ষ্য পথ থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণ বিচ্যুত হতেও কখনো রাজী হয়নি। অথচ সমঝোতা ও আপোস-রফার বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দিলে বিপদাপদের এ হাঙ্গামাই একেবারে মিটে যেত। দিন-রাত্রির অশান্তি শান্তি ও স্বস্তিতে রূপান্তরিত হত। তার অর্থনৈতিক সঙ্কটও বিদূরিত হত এবং গোটা আরবে তার রাজনৈতিক প্রতিপত্তি অতি সহজেই স্বীকৃতি লাভ করত। এ-সত্য যেমন ইতিহাস[১] থেকে জানা যায়, তেমনি কুরআনের স্পষ্ট ইঙ্গিতগুলো থেকেও প্রমাণিত হয়। কিন্তু তার নেতা ও অনুগামী সবাই জানতেন যে, এই সমঝোতা—শের্ক ও তওহীদের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের এ আহবান হচ্ছে তাঁদের পক্ষে মৃত্যু পরোয়ানার সমতুল্য। কেননা নিজস্ব নীতি ও আদর্শ বর্জন করার পর তাদের অস্তিত্ব আপন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে। এ কারণেই তারা প্রচণ্ডতম ঝড়-তুফানের মধ্যেও নিজেদের লক্ষ্যকেন্দ্র থেকে বিচলিত হয়নি। পরিস্থিতির কোন প্রতিকূলতা বা কোন অসুবিধাই তাদেরকে আপন মতাদর্শ

১. কুরাইশগণ নবী করীমের (সঃ) সামনে স্পষ্ট ভাষায় এই প্রস্তাব করেছিল যে, আপনি আমাদের উপাস্যদের সমালোচনা থেকে বিরত থাকলে আমরা শুধু আপনার বিরুদ্ধতাই পরিহার করব না, আপনার অভিপ্রেত ধন-মাল এনেও স্তুপীকৃত করব এবং আপনাকে আমাদের নেতা বরং বাদশাহ বলে গ্রহণ করব। (সীরাতে ইবনে হিশাম, প্রথম খণ্ড)।

থেকে চুল পরিমাণ বিচ্যুত করতে পারেনি। তাঁদের এ অতুলণীয় দৃঢ়তা দেখে মনে হচ্ছিল যে, সমস্ত জরুরী সমস্যা, বৈষয়িক অসুবিধা, বাহ্যিক কলাকৌশল এবং সময় ও পরিবেশের চাহিদা থেকে তাঁরা চোখ বন্ধ করে রেখেছেন, আর নিছক একটা 'পাগলামী' তাদেরকে 'বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার' শত্রুতে পরিণত করছে। তাই সেকালের রাজনীতিক ও চিন্তাবিদরা সর্বসম্মতভাবে তাদের সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিল যে, 'তাদের ধর্ম তাদেরকে ধোকায় ফেলে রেখেছে (غَرَّ هٰؤُلَاءِ دِيْنُهُمْ) এবং তারা হচ্ছে 'নির্বোধ' (سُفَهَاء)।

অবশ্য দুনিয়ার মানুষ শীগ্‌গীরই এই 'আত্মপ্রবঞ্চনা' ও 'নির্বুদ্ধিতা'র তাৎপর্য প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিল। কারণ অতি অল্পদিনের মধ্যেই মানবেতিহাসের সেই বিস্ময়কর বিপ্লব সংঘঘিত হলো, যার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণে বড়-বড় যুক্তিবাদী পর্যন্ত হিমসিম খেয়ে যান। যাঁদের আপন ঘরে মাথা গুঁজবার মত ঠাঁই ছিল না, 'কাইসার' (রোম সম্রাট) ও 'কিসরার' (পারস্য সম্রাট) রাজমুকুট পর্যন্ত তাদের চরণে লুটিয়ে পড়ল এবং একটি শতক অতিক্রান্ত হবার আগেই ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার বেশির ভাগ এলাকায় তারা ক্ষমতা বিস্তার করল। তারা কেবল এ সব দেশের মাটির ওপরই নয়, বরং সেখানকার অধিবাসীদের মন-মগজেও আসন গেড়ে বসল। ঐ সব কিছু ছিল নিঃসন্দেহে আপন জীবন-লক্ষ্য ও জীবন-আদর্শের জন্যে তাদের হৃদয়ে সঞ্চিত গভীর আত্মোৎসর্গ ও আনুগত্যের ফল–যা সেই লক্ষ্য ও আদর্শের জন্যে তাদেরকে মরতে ও বেঁচে থাকতে শিখিয়েছিল।

লক্ষ্য-সচেতনতার অবক্ষয়

ইসলামের এই প্রাথমিক যুগ অতিক্রান্ত হবার পরই এ জাতির জীবনে পতন যুগের সূচনা হলো। এই সময় এর লোকদের মন-মগজ থেকে জীবন লক্ষ্যের ছাপ ক্রমশ নিষ্প্রভ হতে শুরু করল। বিভিন্ন কারণে তাদের মধ্যে সমঝোতা ও আপোস-রফার ব্যাধি বদ্ধমূল হতে লাগল এবং যুগের গতির সঙ্গে তাল রেখেই তা বিকাশ লাভ করতে লাগল। মুসলিম সমাজে অনৈসলামী রীতি-নীতি ও মতাদর্শ বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের ন্যায় দ্রুত বিস্তার লাভ করতে লাগল। এর প্রতিরোধের জন্যে সত্যাশ্রয়ী আলিমদের পক্ষ থেকে অনেক রকম চেষ্টাও চালানো হলো। কিন্তু অশিক্ষিত জনসাধারণের অপরিপক্ক ধার্মিকতা এবং রাষ্ট্র-সরকারগুলোর দায়িত্বহীনতা তাদের সে প্রচেষ্টাকে পুরোপুরি সফল হতে দিল না। ফলে এই ব্যাধি মুসলিম সমাজ থেকে ক্রমে-ক্রমে ইসলামী নীতি ও চিন্তার শিকর উপড়ে ফেলতে লাগল। যতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রক্ষমতা এই জাতির করায়ত্ত ছিল, ততদিন এই নীতি ও আদর্শের ব্যাপারে সে সামগ্রিকভাবে আত্মবিস্মৃতি ও আত্মহত্যার পথ অবলম্বন করেনি। কিন্তু তার রাজনৈতিক পতনের

সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তিক পতনের দ্রুতগতিও বন্যার বেগ ধারণ করল। সেই পতনের ধারা আজ এমনি অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে, এ-জাতির আজ নিজেকেই যেন চিনতে পারছে না। তার লোকদের বিপুল অংশ আজ নিজস্ব নীতি ও আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে একেবারেই ভুলে বসেছে। আজকে এ জিনিসগুলোকে তার সামনে রাখা হলে সে শুধু বিস্ময়ই বোধ করে না, কখনো কখনো পরম নিশ্চিন্ততা ও নির্ভরতার সঙ্গে তাকে অনৈসলামী বা ইসলাম-বহির্ভূত প্রমাণ করার চেষ্টা করে। পক্ষান্তরে যে জিনিসগুলো উক্ত নীতির একেবারে পরিপন্থী, তারা সেগুলোর ওপর উন্মত্তের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সেগুলোকে ইসলামসম্মত ঘোষণা করতে কোমর বেঁধে লেগে যায়। ফলে তার সমগ্র চেষ্টা-সাধনা আজ নিজেরই জীবন-লক্ষ্যের বিনাশ সাধনে ব্যয়িত হচ্ছে। অবশ্য এ আত্মতুষ্টিও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, এসব কিছু নাকি ইসলাম এবং মুসলিম জাতির পক্ষে কল্যাণপ্রসু হবে। দৃশ্যত এ একটি দাবি মাত্র, কিন্তু এ দাবি মোটেই প্রমাণ-নির্ভর নয়। আল্লাহ্ যাকে দু'টি চক্ষু দিয়েছেন, তিনি নিজেই দেখতে পারেন যে, বাস্তব সত্য এর বিপরীত ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ সত্য অনস্বীকার্য যে, এ জাতির মধ্যে মুষ্টিমেয় লোকদের এমন একটি দলও বর্তমান রয়েছে, খোদার ফযলে যারা আত্মবিস্মৃতি ও আত্মহত্যার এ পর্যায়ে এখনো গিয়ে পৌঁছেন নি। বরং তাঁদের দৃষ্টি আপন লক্ষ্যের দীপ্তিতে এখনো সমুজ্জ্বল। তাঁরা ইসলামের নীতি, আদর্শ ও লক্ষ্যের স্মৃতি আপন হৃদয়ে সযত্নে লালন করছেন। কিন্তু এ সত্যকেও অস্বীকার করা চলে না যে, এই আত্মসচেতন সংখ্যালঘু দলটির বেশির ভাগ লোকের অবস্থাই বাস্তব দৃষ্টিতে খুব সন্তোষজনক নয়। তাদের মধ্যে লক্ষ্যের স্মৃতি নিছক একটি 'পবিত্র স্মৃতি' হিসেবেই বিরাজ করছে। তার ভিতরে হয় জীবনের কোন উত্তাপই নেই, নতুবা থাকলেও এতটা ক্ষীণ যে, তা অনুভূতই হয় না। পরিস্থিতির প্রতিকুলতা এবং বিরুদ্ধ শক্তিগুলোর প্রচণ্ডতা তাদের মগজে এমন কোন পুঁজিই বাকী থাকতে দেয়নি, যার অভাবে কোন মহৎ লক্ষ্য এবং আদর্শের নামোচ্চারণই কখনো ভাল বোধ হতে পারে। এই কারণে তারাও নীরব সমঝোতার শান্তিপূর্ণ মনোভাব গ্রহণ করেছেন। সেই সঙ্গে তাদের ওপর 'রাজনীতি ও দূরদৃষ্টির' পক্ষ থেকে 'ধর্মীয় উন্মাদ' হবার অপবাদ যাতে চেপে না বসে, তৎসম্পর্কে সচেতন থাকাটাও তাদের স্থায়ী নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁরা সব কিছুই জানেন এবং বোঝেন; কিন্তু নিজেদেরকে 'এই বুঝিয়ে' নীরব রয়েছেন যে, দ্বীন-ইসলামের সহজসাধ্য কর্মনীতি রাখা হয়েছে। আল্লাহ্ কাউকে তার শক্তির চাইতে বেশী দায়িত্বশীল বলে অভিহিত করেন নি। বরং যে সব পদক্ষেপ ও আচরণে বিপদের ঝুঁকি রয়েছে, তার থেকে বিরত থাকারই উপদেশ দেয়া হয়েছে।

এ জাতি 'রহমতের অনুরূপ অভিশাপ' নিয়মের আওতাধীন

এই পরিস্থিতিতে এ জাতি আজ দুনিয়ার কর্তৃত্ব ও সৌভাগ্যের অধিকারী হলেও তাতে ইসলামের পক্ষে কিছু আকর্ষণের জিনিস ছিল না। কেননা, ইসলামের দৃষ্টিতে এর নিছক রাজনৈতিক ক্ষমতার কোনই মুল্য নেই। তার যা কিছু সম্পর্ক ও আকর্ষণ, তা হচ্ছে তার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে। এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে পেছনে ফেলে তার ধারক ও বাহকগণ গোটা দুনিয়ার বাদশাহী লাভ করলেই বা তাতে কি লাভ? কিন্তু প্রকৃতি এ জিনিসটিও আজ আর তাদের আয়ত্তাধীন রাখে নি। তারা আপন সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে বিসর্জন দিয়ে যে বস্তুটি লাভ করেছে, তা হচ্ছে শুধু গোলামী বা নিম-গোলামীর কলঙ্ক-টিকা। এ কলঙ্ক-টিকা অন্য যে কোন জাতির ললাটে লাগতে পারে, কিন্তু বিশ্বরাজের দল 'হিজবুল্লাহ'র ললাটে কখনো লাগতে পারে না। এ কলঙ্ক-চিহ্ন এমনি ঘৃণ্য যে, এটা দেখে যে কোন দর্শক ঠিক তেমনি বিস্মিত হয়ে যায়–এ জাতির প্রারম্ভিক যুগে এর উত্থান দেখে যেমন বিস্মিত হত। অর্থাৎ উত্থান ও পতনের সাধারণ দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম জাতির উত্থান যেমন একটি অলৌকিক ব্যাপার (মু'জেজা) ছিল, তেমনি আজকে তার এই পতনও হচ্ছে একটি 'পাল্টা মু'জেজা'। মানুষের বুদ্ধি-বৃত্তি না সেই অস্বাভাবিক সৌভাগ্যের কোন সন্তোষজনক কারণ বিশ্লেষণ করতে পারে আর না পারে এই অস্বাভাবিক দুর্ভাগ্যের। এমন কি এ জাতির একটি বিরাট অংশ এই ভেবে বিস্মিত যে, আমাদের কিসের থেকে কি হয়ে গেল! তারা থেকে থেকে শুধু ভাবছে, আমাদের এহেন দুরবস্থার কারণ কি? আমরা স্বীকার করি যে, আমাদের ঈমানে দুর্বলতা এসেছে। আমরা দুষ্কৃতিকারী হয়ে পড়েছি। আমাদের নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটেছে। আমরা ধর্মীয় বিধানের প্রতি উদাসীন। এ সবই সত্য, তবু ভাল-মন্দ যেমনই থাকি না কেন, আজ দুনিয়ায় শুধুমাত্র আমরাই তওহীদের ঝাণ্ডাবাহী। কারো সামনে আমরা মাথা নত করে থাকলে শুধু খোদার সামনেই করি। তাঁর মহান রসূলের আনুগত্য-শৃংখল শুধু আমাদেরই গলায় পরিহিত। তাঁর বিধানের কিছু পালন করলে আমরাই করে থাকি। আমাদের মুকাবেলায় গোটা দুনিয়াই হচ্ছে কাফের ও মুশরেক। তারা খোদার অবাধ্য ও তওহীদে অবিশ্বাসী। তারা রসূলের বিরোধী ও কুরআনের শত্রু। এতৎসত্ত্বেও আমরা অধঃপতিত আর তারা সমুন্নত; আমরা দরিদ্র আর তারা বিত্তবান; আমরা লাঞ্ছিত-অপমানিত আর তারা ক্ষমতাশালী; আমরা পরাধীন ও পদানত আর তারা স্বাধীন ও কর্তৃত্বশীল–এটা কেমনতরো কথা। অথচ আমরা যখন অপরের তুলনায় বেশী আল্লাহ্ তায়ালার নিকটবর্তী, তখন তাদের চাইতে উক্ত অনুগ্রহগুলো আমাদেরই বেশী প্রাপ্য!

এই বিস্ময়কর প্রশ্ন উদয় হবার আসল কারণ এই যে, আমরা জাতিসমূহের উত্থান-পতন সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত দর্শনের সঙ্গে একেবারেই অপরিচিত হয়ে পড়েছি। নতুবা প্রাকৃতিক ও নৈতিক উভয় দিক থেকে আমরা তো যথোচিত স্থানেই দাঁড়িয়ে আছি। বস্তুত জীবনের কর্মক্ষেত্রে দু'রকম বিধি ক্রিয়াশীলঃ প্রথম প্রাকৃতিক বিধি, দ্বিতীয় নৈতিক বিধি।[১] জাতিসমূহের উত্থান ও পতনে এ উভয়বিধ কানুনেরই সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে একটি পার্থক্য আছে। তাহলো এই যে, প্রাকৃতিক বিধি এককভাবেই কোন জাতিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে বিজয় ও সাফল্য দান করতে পারে; কিন্তু নৈতিক বিধির পক্ষে প্রাকৃতিক বিধির কিছুমাত্র সাহায্য গ্রহণ না করে এককভাবে কোন জাতিকে বিজয়ী ও সফলকাম করে তোলা সম্ভবপর নয়। কারণ খোদা তার মধ্যে এমনি কোন শক্তিই সঞ্চিত রাখেন নি! অবশ্য জাতিসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধবিগ্রহে নৈতিক বিধির একটি বিশেষ 'মীমাংসা শক্তি'র মর্যাদা রয়েছে। এই বিশেষ শক্তিটি সে প্রাকৃতিক বিধি ও বস্তুগত শক্তির বর্তমানেই প্রয়োগ করে থাকে। অর্থাৎ উভয় পক্ষ যদি শুধু বস্তুগত প্রস্তুতির সাথেই যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে যে, পক্ষ যুদ্ধের উপায়-উপকরণ বেশী নিয়ে ময়দানে এসেছে, বিজয় সে-ই লাভ করবে। পক্ষান্তরে এক পক্ষে যদি শুধু বস্তুগত শক্তি থাকে আর দ্বিতীয় পক্ষে থাকে কেবল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি, তবে দ্বিতীয় পক্ষের পরাজয় সুনিশ্চিত; বরং কার্যকারণের এই দুনিয়ায় এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতাই নয়। কিন্তু বস্তুগত কলাকৌশল ও উপায়-উপকরণের দিক থেকে যদি উভয় পক্ষ সমান হয় আর সেই সঙ্গে এক পক্ষ নৈতিক শক্তিতেও সুসমৃদ্ধ হয়, তবে নিঃসন্দেহে এই শেষ পক্ষ বিজয় লাভ করবে এবং পক্ষদ্বয় সমান বস্তুগত সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত থাকার কারণে দৃশ্যত যুদ্ধের কখনো চূড়ান্ত মীমাংসা হওয়া উচিত না হলেও তার নৈতিক শক্তি বরং সামনে এগিয়ে এর ফয়সালা তার অনুকুলেই ঘোষণা করবে। বরঞ্চ কুরআন তো আরো সামনে এগিয়ে বলেছে যে, বস্তুগত উপকরণের দিক থেকে সে যদি প্রতিপক্ষের এক দশমাংশও হয়, তবু তার নৈতিক শক্তি বিশেষ 'মীমাংসা শক্তি' হয়ে তাকে বিজয়ী ও পরাক্রান্ত করে তুলবে। এর পন্থাটা হচ্ছে এই যে, এই শক্তি প্রকারান্তরে আল্লাহ্ তায়ালার গায়েবী মদদ ও অতি-প্রাকৃতিক (Supernatural) সাহায্যের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়।

১. এখানে 'নৈতিক বিধি' বলতে প্রকৃত ধর্মীয় নৈতিকতাকে বুঝানো হয়েছে–সুবিধাবাদ ও অভিজ্ঞতাজাত নৈতিকতা নয়। নচেত সুবিধাবাদী নৈতিকতা থেকেও যদি কোন জাতি বঞ্চিত হয়ে যায়, তবে শুধু প্রাকৃতিক বিধির ওপর নির্ভর করে সে জয়লাভ করতে পারে না। পরন্তু এখানে সুবিধাবাদী নৈতিকতাকেও প্রাকৃতিক বিধির মধ্যে শামিল করা হয়েছে। কারণ নিজস্ব রূপের দিক থেকে তা বৈষয়িক কলাকৌশল বৈ কিছুই নয়, তাকে স্বত-ভাবে নৈতিকতা আখ্যা দেয়া একেবারেই ভুল।

তবে এর জন্যে শর্ত এই যে, একদিকে সে আপন সাধ্যানুযায়ী বস্তুগত উপায়-উপকরণ ও কলাকৌশল ব্যবহারে ত্রুটি করবে না, অন্যদিকে তার ঈমানকে খুব দৃঢ়মূল এবং আচরণকে নির্মল ও নিষ্কলুষ করে নেবে। অন্য কথায় বলা যায়, তার ভিতরে আপন নীতি ও আদর্শের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা এবং নিজস্ব জীবনাদর্শের প্রতি জীবন্ত অনুরাগ থাকতে হবে। এই গায়েবী মদদ ও অতি-প্রাকৃতিক সাহায্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালার তরফ থেকেও স্পষ্টত ওয়াদা করা হয়েছে। যেমনঃ

كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ (بقرة: ٢٤٩)

'কতই না ছোট্ট দল বিরাট দলের ওপর আল্লাহ্র হুকুমে বিজয়ী হয়েছে।' (বাকারা–২৪৯)

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ *

(ال عمران: ١٣٩)

'শৈথিল্য প্রদর্শন করো না, শঙ্কাগ্রস্তও হয়ো না–তোমরাই সমুন্নত থাকবে, যদি তোমরা মুমিন হও।' (আল-ইমরান–১৩৯)

إِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ (انفال)

'যদি তোমাদের বিশজন অবিচল ও ধৈর্যশীল লোক থাকে তো তারা দু'শো লোকের ওপর বিজয় লাভ করবে।'

أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (انبياء: ١٠٥)

'নিঃসন্দেহে, আমার সৎকর্মশীল বান্দারাই পৃথিবীর শাসনকর্তা হবে।' (আল নাবা–১০৫)

وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

(مائدة: ٥٢)

'যে কেউ আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং মুমিনদেরকে নিজের সঙ্গীরূপে গ্রহণ করবে, তো (সে-ই সফলকাম ও সমুন্নত হবে) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র দলই হবে বিজয়ী ও পরাক্রান্ত।' (মায়েদা-৫২)

এই গায়েবী মদদের দৃষ্টান্ত প্রত্যেক যুগেই পাওয়া যেতে পারে। খোদ এই জাতির প্রাথমিক ইতিহাস এই ধরনের ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ। বদর, ওহোদ,

আহজাব ও হুনাইনের যুদ্ধে খোদার 'অদৃশ্য' সেনারা যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, কুরআনের পৃষ্ঠায় আজো তা' সুরক্ষিত রয়েছে।

কোন মুমিন সম্প্রদায়কে সমুত্থিত করার এই হচ্ছে বিশিষ্ট পদ্ধতি। এই বিশিষ্ট পদ্ধতিই মুসলিম জাতির প্রারম্ভিক যুগকে অসাধারণ মহত্ত্ব ও সমুন্নতির যুগে পরিণত করেছিল।

কিন্তু অন্যান্য ঈমানদার জাতির ন্যায় এই জাতিও যেমন খোদার এই বিশেষ কৃপাদৃষ্টির অধিকারী, তেমনি তার দায়িত্ব ও কর্তব্যও অত্যন্ত নাজুক। তাকে উপরিউক্ত বিশেষ প্রতিশ্রুতির সঙ্গে একটি বিশেষ সতর্কবাণীর দ্বারাও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত সে সতর্কবাণী থেকে সে নিজের কর্ণ-কুহরকে বন্ধ করে রেখেছে। প্রকৃতপক্ষে এই আচরণটাই তার পক্ষে ভুল ধারণা ও আত্মবিনাশের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং উল্লিখিত প্রশ্নটি জাগিয়ে তুলেছে। কথাটা একটু বিস্তৃত করে বললে দাঁড়ায় এইঃ কুরআনে বিধৃত আল্লাহ্‌র রহমত ও নিয়ামতের কানুন অনুযায়ী যে ব্যক্তি ও দলের ওপর আল্লাহ্ তায়ালার ফযল ও করম যতটা বেশী, সেই ফযল ও করমের প্রতি অকৃতজ্ঞতা অর্থাৎ খোদায়ী বিধানের প্রতি বেপরোয়া মনোভাব গ্রহণে তার সাজাও তত বেশী কঠোর ও ভয়াবহ হয়ে থাকে। পরাধীনতা ও ব্যর্থতার যত সাজা তিনি অন্যান্য জাতিকে অসদাচরণের জন্যে দিয়ে থাকেন, ততটা অসদাচরণের জন্যে তার বিশেষ অনুগ্রহধন্য জাতিকে তিনি দ্বিগুণ কি কয়েকগুণ বেশী শাস্তি দিয়ে থাকেন। এ-প্রসঙ্গে কুরআন মজীদের কয়েকটি সাক্ষ্য উদ্ধৃত করা যাচ্ছে। সর্বপ্রথম নবী করীম (সঃ)-এর উচ্চতম মর্যাদার কথাই বলা যাক। কারণ তাঁর চাইতে প্রিয়তম ও ঘনিষ্ঠতম মানুষ দুনিয়ায় কখনো আবির্ভূতই হয়নি। কিন্তু তবু সেই প্রিয়তম মানুষটিকে লক্ষ্য করেই এ কথা বলা হয়েছিলঃ

وَلَوْ لَآ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيْلًا * اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا *

(بنى اسراءيل: ٧٤-٧٥)

আমরা যদি তোমায় (সত্যের ওপর) অবিচল না রাখতাম তো শীগ্‌গীরই তুমি ঐ কাফেরদের প্রতি কিছু না কিছু ঝুঁকে পড়তে; (এরূপ যদি হত তো) নিশ্চিতরূপে আমরা তখন তোমায় জীবন ও মৃত্যু উভয় ক্ষেত্রে (অর্থাৎ উভয় জগতে) দ্বিগুণ আযাব ভোগ করাতাম। অতঃপর তুমি আমাদের বিরুদ্ধে কাউকেই আপনার সাহায্যকারী পেতে না। (বনি ইসরাইল)

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে রসূলের পুণ্যবতী সহধর্মিনীদের কথা বলা যেতে পারে। তাঁদেরকে উম্মুহাতুল মুমিনীন বা মুমিনদের জননী হবার সম্মান দান করা হয়েছিল এবং তাঁরা সাধারণ নারীদের মত নয়, এ কথাও বলে দেয় হয়েছিল। (يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ) পরন্তু তাঁরা একনিষ্ঠ মনে আল্লাহ্ ও রসূলের তাবেদারী করলে এবং সৎকর্মে নিয়োজিত থাকলে সাধারণ লোকদের তুলনায় তাঁরা দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবেন, এ কথাও জানিয়ে দেয়া হয়েছিল।

وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا * (احزاب: ٣١)

কিন্তু সেই সঙ্গে এ সত্য সম্পর্কেও তাঁদেরকে অবহিত করা হয়েছিল যেঃ

يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ (احزاب: ٣٠)

হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমাদের যে-কেউই, প্রকাশ্য নির্লজ্জতায় লিপ্ত হবে, তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দান করা হবে। (আহযাবঃ ৩০)

ব্যক্তির পরে জাতির দৃষ্টান্ত পেশ করা যাক। ইহুদী জাতির প্রতি বহুকাল ধরে খোদায়ী অনুগ্রহ বর্ষিত হয়েছে। তাদেরকে দুশমনের কবল থেকে বাঁচাবার জন্যে সমুদ্র শুকিয়ে দেয়া হয়েছে। তাদের আর্থিক দুর্গতির সময় আসমান থেকে 'মান্না ও সালওয়া' অবতীর্ণ হয়েছে। তরু-লতাহীন মরুভূমির মধ্যে রহমতের ফেরেশতারা তাদের মাথার ওপর মেঘের ছায়া বিস্তার করে চলেছে। সর্বোপরি তাদেরকে দুনিয়ার সমগ্র জাতির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এই সমুন্নত ও অনুগৃহীত জাতিই (বর্তমান তওরাতের ভাষায় 'খোদার নিজস্ব জাতি') যখন তার বন্দেগীর প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে এবং খোদায়ী বিধানের প্রতি বিদ্রোহ করে ফাসেকী ও ফাজেরীর মধ্যে নিমজ্জিত হলো, তখন তাদের ওপর খোদার গযব ভেঙ্গে পড়ল। এমনিভাবে ভেঙে পড়ল যে, পূর্বে এ জাতি যতখানি সমুন্নত ছিল, এখন ঠিক ততখানিই অপদস্থ হয়েছে; তখন যতটা অনুগৃহীত ছিল, ততটাই এখন অভিশপ্ত হয়েছে।

ফলকথা, আল্লাহ্ তায়ালার একটি অপরিবর্তনশীল নিয়ম এই যে, তাঁর অভিশাপ রহমতেরই অনুরূপ হয়ে থাকে। এই নিয়মটি যথার্থই ন্যায়পরতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই সাধারণ মানব প্রকৃতিও এই ধারার অনুগামী। আমরা একজন অপরিচিত লোকের কাছ থেকে তেমনি আচরণ প্রত্যাশা করি না, যেমন

করে থাকি আপন প্রিয়জনের কাছ থেকে। একজন ভিন্ন লোক আমাদের কথা না মানলে কিংবা তার প্রতি অসত্যারোপ ও বিরুদ্ধতা করলে সেজন্যে আমরা বেশী ক্রুদ্ধ বা উত্তেজিত হই না। কিন্তু এ কাজগুলোই আমাদের কোন নিমকখোর ভৃত্য বা স্নেহভাজন পুত্রের দ্বারা সম্পাদিত হলে আমাদের ক্ষোভ ও ক্রোধের আর অন্ত থাকে না। এবং আমরা তার এই কাজের এমন জবাব দিয়ে থাকি, একজন ভিন্ন লোককে যা কখনো দিতে পারি না। এই পার্থক্যের কারণটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ভিন্ন লোকরে বিরুদ্ধতার অর্থ হলো, বড়জোর সে একটি সত্য কথার বিরোধী বা দুশমন। কিন্তু এই আপনজনদের বিরুদ্ধতার মানে হলো, তাদের মধ্যে সত্য-বিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গে নিমকহারামীও বর্তমান রয়েছে। মানুষের বিবেক কখনো এমনতরো অপরাধকে মার্জনা করতে পারে না। আপন বান্দাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালাও ঠিক এ নীতিই প্রয়োগ করে থাকেন। যে-সব ব্যক্তি বা জাতি তাঁর বিশিষ্ট অনুগ্রহ লাভে ধন্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বিধি-বিধানের বিরুদ্ধাচারণে লিপ্ত হয়, সাধারণ অবস্থার তুলনায় তাদেরকে তিনি দ্বিগুণ শাস্তি দিয়ে থাকেন। কেননা, তারা যুগপৎ দু'টি অপরাধে অপরাধীঃ প্রথম সত্য-বিরোধীতার, দ্বিতীয় অকৃতজ্ঞতা ও নিমকহারামীর।

খোদার এই সুন্নাতের আলোকেই মুসলিম জাতির অতীত ও বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখা উচিত। আল্লাহ্ তায়ালা এই জাতির সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করে আসছেন? ইতোপূর্বে অন্যান্য জাতিকে যে সব নিয়ামত দান করা হয়েছিল এবং যা আজ পর্যন্ত কোন জাতিরই কপালে জোটেনি, তার প্রায় প্রতিটি নিয়মত দ্বারাই কি এ জাতিকে ধন্য করা হয়নি? এই যে সারা 'জাহানের নেতৃপদ'[১] ও 'সবচাইতে শ্রেষ্ঠ উম্মত'[২] হবার মর্যাদা, এই 'মধ্যবর্তী উম্মত'[৩] ও 'মানুষের জন্যে সাক্ষ্যদানকারী'র[৪] উপাধি, এই 'দ্বীনের পরিপূর্ণতা'[৫] ও 'নিয়ামতের সুসম্পূর্ণতার'[৬]

(১.২) كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (ال عمران: ١١٠)

(তোমরাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি, তোমাদেরকে সমগ্র মানুষের নেতৃত্ব ও পথ-নির্দেশের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।)

(৩.৪) كَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (بقرة)

(এভাবেই আমরা তোমাদেরকে একটি মধ্যবর্তী উম্মত বানিয়েছি, যাতে করে তোমরা সমস্ত মানুষের জন্যে (সত্যের) সাক্ষ্যদাতা হও।)

(৫.৬) اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي (مائدة: ٥)

(আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে সুসম্পূর্ণ করলাম।)

পুরস্কার ইতোপূর্বে আর কোন জাতি কি পেয়েছিল? যদি না পেয়ে থাকে তো গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার যে, এই জাতির কাঁধে কত গুরুতর দায়িত্ব ন্যস্ত? আর সেই দায়িত্ব পালনে অবহেলার পরিমাণ কত মারাত্মক হতে পারে? শাস্তি ও পুরস্কারের যে আইন আল্লাহ্ তায়ালার প্রিয়তম নবী এবং তাঁর পূণ্যবতী স্ত্রীদের বেলায়ও এতটা কঠোর, অন্যদের বেলায় তা কি কিছুমাত্র নম্র হতে পারে? এই 'শ্রেষ্ঠতম জাতি'টিকে যে উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছিল, তার বাস্তব আচরণ যদি তেমনি কিংবা তার কাছাকাছিও হয়, তাহলে বর্তমান দুরবস্থার জন্যে তার অবশ্যই বিস্ময় প্রকাশের অধিকার রয়েছে। কিন্তু সে যদি তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে গাফেল হয়ে থাকে তো তার বিস্ময় আপন দুরবস্থার জন্যে নয়, বরং তার নির্বুদ্ধিতা ও আত্মতুষ্টির জন্যেই প্রকাশ করা উচিত। খোদা কবে কার প্রতি জুলুম করেছেন যে, আজ এই জাতির ব্যাপারে তিনি ইনসাফকে ভুলে যাবেন এবং ভুল করে তাকে অকারণ অধঃপতনের গর্ভে নিক্ষেপ করবেন? একটু ভেবেই দেখা উচিত যে, এই জাতির প্রতি কি দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল এবং বর্তমানে সে কিভাবে তা পালন করছে? তার প্রতি অর্পিত এই দায়িত্বের জরুরী পরিচয় যদিও ইতোপূর্বে বিবৃত হয়েছে তবু এ ব্যাপারে আরো কিছু বক্তব্য পেশ করা সমীচীন বলে মনে করি। কুরআন মুসলমানদেরকে বলেঃ

اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ

(اعراف:٣)

তোমাদের প্রভুর তরফ থেকে যা কিছু নাযিল হয়েছে, তার আনুগত্য কর এবং তাঁকে বর্জন করে (অন্যান্য মিথ্যা) খোদাদের আনুগত্য করো না।(আ'রাফ-৩)

মুসলমানদের আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত এবং দুনিয়ার জীবন-নাট্যে তার কি ধরনের ভূমিকা পালন করা উচিত? কুরআন মজীদের এই একটি মাত্র আয়াত–ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিক থেকেই–এ কথার সুস্পষ্ট জবাব দিয়েছে। তার কি করা উচিত এবং কি করা অনুচিত–এর থেকে এ কথাও স্পষ্টভাবে জানা যায়। একদিকে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে যে কোন আদেশ ও নির্দেশই আসুক না কেন, তার প্রতিপালন তার পক্ষে অপরিহার্য কর্তব্য। সে নির্দেশ আকায়েদ ও ইবাদাত সম্পর্কিত হোক আর আখলাক ও আচরণ সম্পর্কিত, ব্যক্তিগত সমস্যা সংক্রান্ত হোক কি সামগ্রিক সমস্যা সংক্রান্ত, মসজিদ-মাদ্রসা সম্পর্কিত হোক কি ঘর-বাজার সম্পর্কিত, পরিষদ ও পার্লামেন্ট সংক্রান্ত হোক কি যুদ্ধ ও সন্ধি সম্পর্কিত–এই আদেশ ও নির্দেশই হবে তার দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি; এটাই তার ভূমিকা নির্ধারণ করবে এবং এরই অনুবর্তী হয়ে তাকে চলতে হবে। অন্যদিকে নিজের এই প্রকৃত মালিক (এবং তাঁর প্রেরিত

পয়গম্বর) ভিন্ন অপর কোন দিক থেকে কোন মতবাদ, কোন আদর্শ, কোন বিধান ও সিদ্ধান্ত যদি তার সামনে আসে তো তা হবে তার পক্ষে বাতিল ও পরিত্যাজ্য। অন্যকথায়, আপন প্রভুর প্রতিটি নির্দেশ পালন করা যেমন তার পক্ষে প্রয়োজনীয়, সে-নির্দেশের বিরোধী প্রতিটি বহিরাগত জিনিসকে দূরে নিক্ষেপ করাও তার পক্ষে তেমনি আবশ্যক।

কুরআনের এই সুস্পষ্ট নির্দেশের পর কেবল মাত্র দু'টি পথই অবলম্বন করা যেতে পারেঃ হয় তার প্রতি অস্বীকৃতি জানাতে হবে, নতুবা বিনাশর্তে তার সামনে নতি স্বীকার করতে হবে। অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের মানে হচ্ছে এই যে, মানুষ কুরআনকে সত্য বলে মানবে না এবং আদেশ ও নির্দেশ দানের অধিকারকে আল্লাহ্ তায়ালার জন্যে নির্দিষ্ট বলেও মনে করবে না। তেমনি এই নির্দেশকে বিনাশর্তে মেনে নেবার অর্থ হচ্ছে এই যে, স্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী কুরআনকে সত্যাশ্রয়ী বলে তো মানবেই, তদুপরি সে এ ঘোষণা ও স্বীকারোক্তিও করবে যে, আল্লাহ্ তায়ালার কোন একটি নির্দেশ পালনেও সে দ্বিধাবোধ করবে না। এ হচ্ছে নিতান্তই একটি প্রকাশ্য এবং সহজ-সরল সত্য; এ-সম্পর্কে কোন দ্বিমতের কল্পনাও করা চলে না। এ সত্যটি অবহিত হবার পর দ্বীন-ইসলামের কোন কোন বিধি-ব্যবস্থা গ্রহণ করা আর কোন কোনটি এড়িয়ে চলার আচরণটা যে কিরূপ অযৌক্তিক এবং হাস্যকর হতে পারে, তা অনুমান করা মোটেই কঠিন নয়। এইরূপ সুবিধাবাদী নীতি গ্রহণকারীদের সম্পর্কে কুরআন নিম্নোক্ত ভাষায় তার সাফ ও সুস্পষ্ট ফয়সালা ঘোষণা করছেঃ

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ

......الخ (بقرة: ٧٥)

তোমরা কি খোদার কিতাবের কতকাংশ বিশ্বাস কর আর কতকাংশ কর অবিশ্বাস? যারা এরূপ করে, তাদের শাস্তি এছাড়া আর কিছুই নয় যে, তারা দুনিয়ায় লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে এবং আখেরাতেও তাদের কঠিনতম আযাবের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। (বাকারা-৮০)

কুরআনের এ ঘোষণা এ কথাই অকাট্যরূপে প্রমাণ করে যে, তার দাবি হচ্ছে পরিপূর্ণ আনুগত্যের অর্থাৎ সে যা কিছুই বলবে, কেবলমাত্র তা-ই বাস্তবায়িত করতে হবে। সে তার অনুগামীদের জন্যে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে, তাদের পক্ষে তা অতিক্রম করার কোনই অবকাশ নেই। যারা এ ধরনের কাজ করে, তাদেরকে সে জালেম বলে আখ্যায়িত করেছে।

وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ* (بقرة: ٢٢٩)

সুতরাং কুরআনের প্রতি ঈমান পোষণ তথা মুসলিম হবার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, তার ভিতরে যা কিছুই রয়েছে, তার কোন তুচ্ছতম অংশও বর্জন করা যাবে না।

এবার এ জাতি তার গুরুদায়িত্ব কিভাবে পালন করছে, তা-ও একবার দেখে নেয়া যাক। সর্বপ্রথম মগ জটিকে বাইরের সমস্ত প্রভাব থেকে মুক্ত করে مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দৃষ্টিপাত করুন। অতপর জাতির গোটা বাস্তব আচরণ সযত্নে পর্যালোচনা করুন। তৎপর অনুমান করুন, কুরআনের কতগুলো বিধান কার্যকরী হচ্ছে? যারা মুসলমানী নাম ধারণ করেও ইসলামের প্রতি প্রকাশ্য বিদ্রোহী এবং তার নীতি ও আদর্শের সত্যতায় অবিশ্বাসী, অথবা যাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে ইসলামী আইন লংঘন, বরং তার নিশ্চিহ্নকরণেই ব্যয়িত হচ্ছে এবং যাদেরকে ফিক্‌হী পরিভাষায় ফাসেক ও ফাজের বলা হয়, তাদের কথা ছেড়েই দিন। বরঞ্চ যে সব ব্যক্তি ও মহল নেকী, তাকওয়া, ঈমান ও সৎকর্মের দিক থেকে প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, তাদের প্রতিই দৃষ্টিক্ষেপ করুন। এখানেও আপনারা বড়জোর এইটুকুই দেখতে পাবেন যে, ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত খোদায়ী বিধানগুলোর প্রতি তাঁরা উদাসীন নন। এখানে নামায-রোযা পুরোপুরিই প্রতিপালিত হচ্ছে; যাকাত-সদকাহও আদায় হচ্ছে; তসবিহ ও অজীফা পাঠও দেদার চলছে; মিথ্যা, পরনিন্দা (গীবত), কটু ভাষণ ও কুৎসা রটনা দ্বারাও জবানের পবিত্রতা হানি হচ্ছে না; দম্ভ ও অহমিকা, রিয়া ও প্রদর্শনী, খেয়ানত ও প্রতিশ্রুতিভঙ্গ, জুলুম ও নির্যাতন, উৎকোচ ও হারামখোরী এবং ফেতনা ও ফাসাদের কালিমা থেকেও তাঁরা পবিত্র। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও দ্বীন-ইসলামের সামাজিক ও সামগ্রিক বিধি-ব্যবস্থা ও সমস্যাবলীর ব্যাপারে তাদের উদাসীনতা ও নিস্পৃহতা অমুত্তাকী মহলের মতই লক্ষ্যণীয়। কুরআন যদি শুধু মানুষের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কেই আলোচনা করত তো নিঃসন্দেহে এভাবে কুরআনের আনুগত্য করলেই তার হক পুরোপুরি আদায় হয়ে যেত। কিন্তু সে তো জীবনের সামগ্রিক বিষয়গুলোকে ব্যক্তিগত সমস্যাবলীরই সমান গুরুত্ব প্রদান করছে। সে নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত আদায় করার এবং আমানত, বিশ্বস্ততা, সত্য ভাষণ, আন্তরিকতা, ওয়াদা রক্ষা, সদাচরণ, হালাল ভক্ষণ ইত্যাকার নৈতিক গুণরাজিতে ভূষিত হবার নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে এও বলেছে যেঃ

اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ (اعراف: ٥٤)

সাবধান, সৃষ্টিলোক আল্লাহ্‌র এবং এখানে আইন চলবে তাঁরই।

لَآ اِلٰـهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنَ ـ (الانبياء : ٢٥)

আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ ইবাদতের যোগ্য এবং প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের উপযোগী নয়। কাজেই শুধু তাকেই আপন মাবুদ, মনিব ও বাদশাহ বলে মান্য কর।

اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ (نحل: ٣٦)

একমাত্র খোদারই বন্দেগী ও দাসত্ব কর এবং তামাম বাতিল মাবুদকে বর্জন কর।

وَقَدْ اُمِرُوْا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ (نساء: ٦٠)

প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের যে সব মিথ্যা দাবিদার খোদার বাদশাহীর প্রতি বিদ্রোহ করে তাঁর প্রজাদের ওপর নিজের শাসন চালাতে চায়, তাদের দাবিকে অগ্রাহ্য কর।

وَلَا تُطِيْعُوْٓا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ (شعراء: ١٥١)

যে-সব লোক আল্লাহ্র অধিকার সম্পর্কে গাফেল এবং তাঁর নির্ধারিত সীমালংঘন করে, তাদের কথায় ভ্রুক্ষেপ করো না।

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ (مائدة: ٤٩)

কোন বিষয়ে বিচার-ফয়সালা করতে হলে তা' খোদায়ী বিধানের পরিপ্রেক্ষিতেই কর।

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ (نساء: ٦٠)

কোন বিষয়ে বিচার-ফয়সালা করতে হলে উক্ত বিধানের অনুসারী আদালতের শরণাপন্ন হও; কেননা গায়রুল্লাহর আইনানুযায়ী চালিত আদালতে মুকাদ্দমা পেশকারী ব্যক্তি হচ্ছে মুনাফিক।

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ ....
الظَّالِمُوْنَ .... الْفَاسِقُوْنَ* (مائدة: ٤٤-٤٨)

আর খোদায়ী বিধান ছেড়ে নিজস্ব আইনানুযায়ী বিচার-ফয়সালাকারী হচ্ছে জালেম, ফাসেক ও কাফের।

এমনিভাবে আরো বলা হয়েছেঃ

وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (مائدة: ٢)

কোন দুষ্কৃতি বা জুলুমের বিকাশ বৃদ্ধিতে কোনরূপ সহায়তা করো না।

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ (بقره: ١٩٣)

কুফরীর ধ্বজাবাহীদের সঙ্গে লড়াই কর, যতক্ষণ না ফেতনা একেবারে নির্মূল হয়ে যায় এবং শুধু আল্লাহ্‌র আনুগত্যই বাকী থাকে।

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا (مائدة: ٣٣)

যে-কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সঙ্গে লড়াই করবে, তার থেকে খোদার দুনিয়ায় বেঁচে থাকার অধিকার ছিনিয়ে নাও।

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا (مائدة: ٣٨)

যে-কেউ চুরি করবে, তার হাত কেটে দাও।

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ (نور: ٢)

যে-কেউ ব্যভিচার করবে, তাকে শাস্তিস্বরূপ একশ' বেত্রাঘাত করো।

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً (نور: ٤)

যে-কেউ কোন সতীসাধ্বী নারীর ওপর জিনার অপবাদ চাপাবে, তাকে আশিটি চাবুক মার।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ (بقرة: ١٧٨)

যে-ব্যক্তি কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে, তারও শিরোচ্ছেদ কর।

মোটকথা, এইরূপ বেশুমার শরয়ী বিধান রয়েছে, যা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনকে অতিক্রম করে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনকেও নিজের আয়ত্তাধীন রাখতে চায়। আর যে-কুরআনে নামায, রোযা ইত্যাদির কথা বিবৃত হয়েছে, এই সব কিছুও তাতেই বর্তমান রয়েছে। কাজেই এ বিধানগুলো কার্যকরী না করা পর্যন্ত দ্বীনের আনুগত্য এবং কুরআনের প্রতি আমলের হক আদায় হচ্ছে—একথা কিভাবে মনে করা যায়? এ সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌র কিতাবের প্রতি পুরোপুরি আমলের প্রতিশ্রুতি দানকারী এই জাতির পক্ষে অন্যান্য বিধানের ন্যায়

এ বিধানগুলোও কার্যকরী করা একান্ত অপরিহার্য। বরং প্রকৃত ব্যাপার এই যে, নিজস্ব মৌলিক গুরুত্বের দিক থেকে অধিকাংশ বিধানই হচ্ছে ঈমানের ভিত্তি এবং পরকালীন মুক্তির পুর্ব-শর্ত। এ কারণেই তার প্রতি মনোযোগী হওয়া প্রতিটি মুসলমানের পক্ষে প্রাথমিক কর্তব্য। কিন্তু 'খালেস দ্বীনদার ও খোদাভক্ত মহলেও' তার প্রতি আমলের নিদর্শন পাওয়া দূরের কথা, তার আকাঙ্ক্ষা পর্যন্ত প্রায় তিরোহিত। আজকেও আমাদের প্রভু (মাবুদ) ও রাজাধিরাজ (শাহানশাহ) আল্লাহ্ তায়ালা সন্দেহ নেই, কিন্তু তার প্রভুত্ব ও রাজত্বের শেষ পরিধি হচ্ছে মসজিদের চার প্রাচীর পর্যন্ত। এর বাইরে আমাদের প্রভু ও শাসক হচ্ছে এমন সব মানুষ, যারা আমাদের মতই নগণ্য সৃষ্টি; যারা নিজেরাও সেই একই প্রভুর গোলামী এবং একই শাসকের আইনের তাবেদারীর জন্যে জন্মলাভ করেছে। পরন্তু এদের অধিকাংশই হচ্ছে আল্লাহ্ ও রসূলের প্রকাশ্য বিদ্রোহী এবং কুফরী ও ভ্রষ্টতার নায়ক। আর কিছু সংখ্যক 'মুসলমান' নামধারী হলেও তারা দুনিয়ায় মানুষের স্বাধীন জীবনের ব্যাপারে খোদার কর্তৃত্বের অধিকারকে নিজেদের হাতেই তুলে নিয়েছে। বস্তুত গোটা 'মুসলিম জাতি'ই আজ খোদাকে ত্যাগ করে এ দু'ধরনের 'প্রভু'কে নিজেদের বিধানদাতা ও শাসনকর্তা বানিয়ে নিয়েছে। এ দুনিয়াবী প্রভুরা যেসব আইন জারি করে, তা-ই হচ্ছে তাদের গ্রহণযোগ্য আইন–কুরআন ও সুন্নায় বর্ণিত আইনের কোন গুরুত্ব এখানে নেই। পরন্তু জীবনের এই সব মৌলিক ব্যাপারে জাতি প্রথমে আপোস-রফা এবং পরে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করায় এবং নিজেরই মত মানুষের হাতে রাষ্ট্র ব্যবস্থার চাবি-কাঠি তুলে দিয়ে তাকে শাসনকর্তারূপে মেনে নেয়ায় রাষ্ট্রের সাথে সম্পৃক্ত জীবনের বহুতরো বিষয় স্বভাবতই অনৈসলামী ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়ে চলেছে। এর ফলে তার জীবন-আদর্শের বহুলাংশই–তার রাজনৈতিক মতবাদ, অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণা ও সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার মূল ভিত্তিই বদলে গিয়েছে; তার জীবনের গোটা কাঠামো এবং জীবন সমস্যার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিই ভিন্নরূপ ধারণ করেছে। আজ সে লা-শরীক আল্লাহ্র অখণ্ড প্রভুত্বের পরিবর্তে মানবীয় প্রভুত্বের নিশানবর্দার সেজেছে! শুধু তাই নয়, বরং যে-জীবন-পদ্ধতির মুলনীতি থেকে শাখা-প্রশাখা পর্যন্ত সবটাই অনৈসলামী, অকুরআনী ও কুফরীসুলভ, তাকে শুধু গ্রহণই করছে না, তার যন্ত্র চালনায়ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করছে। আজ তার লোকেরা নেহাত পরিতুষ্টির সঙ্গেই খোদার দেয়া বিধান পরিত্যাগ করে মানুষের মনগড়া আইনানুযায়ী বিচার-ফয়সালা করছে ও করাচ্ছে; অথচ তারা জানে যে, এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্র নির্দেশ এটা নয়। আজকে ধর্মত্যাগ, চৌর্যবৃত্তি, ব্যভিচার, মিথ্যাপবাদ ও হত্যাপরাধের জন্য কোথাও কুরআন ও সুন্নাহ নির্ধারিত শাস্তি প্রদান করা হচ্ছে না;[১] অথচ তারা তাদের প্রকৃত শাসনকর্তার কাছে এ মর্মে ওয়াদা করেছিল এবং আনুগত্যের শপথ নিয়েছিল যে, তারা উক্ত দণ্ডবিধিকে জারি করবে। এইভাবে

১. এটা অবশ্য বহু পূর্বের কথা। এখন বিচ্ছিন্নভাবে কোথাও কোথাও এইসব দন্ডবিধির কিছু কিছু কার্যকর করা হচ্ছে —অনুবাদক

দেখা যায় যে, কুরআনের একটি বিরাট অংশ শুধু লিখন-পঠনের মধ্যেই সীমিত হয়ে রয়েছে, তার ধারক ও রক্ষকদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে তার কোনই সম্পর্ক নেই। আমাদের মধ্যে যদি কুরআনী শিক্ষার সত্যিকার উপলব্ধি এবং ইসলামের অভ্রান্ত দূরদৃষ্টি বর্তমান থাকে আর প্রবৃত্তির চালবাজী আমাদের ঈমানের প্রাণসত্তাকে অন্তঃসারশূন্য না করে থাকে, তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে, তওরাত ও ইঞ্জিলের সঙ্গে আহলে কিতাবরা যেরূপ ব্যবহার করেছিল, কুরআনের সাথে আমরা প্রায় তেমনি ব্যবহারই করে চলেছি। অবশ্য কুরআন আল্লাহ্ তায়ালার সর্বশেষ হেদায়েত-নামা বিধায় এবং সেহেতু তিনি নিজেই এর হেফাজতের প্রতিশ্রুতি দেয়ায় অতীতের কিতাবগুলোর ন্যায় এর কোন শব্দ রদ-বদল ও বাক্য কাটছাঁট করার দুঃসাহস কামিয়াব হতে পারে না। কিন্তু এছাড়া এমন আর কোন জুলুম বা খেয়ানত নেই, যা অন্যান্য জাতি তাদের নিজস্ব কিতাবের সঙ্গে করে থাকলেও মুসলমানরা তার থেকে বিরত রয়েছে। বরং বাস্তবক্ষেত্রে তারা কুরআনের একটি বিরাট অংশকে ভুলে গিয়েছে, জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তাকে সামনে রাখার পরিবর্তে পেছনে ফেলে রেখেছে এবং 'কতক বিশ্বাস আর কতক অবিশ্বাসের' নীতি অনুসারে পূর্ণ নিশ্চিন্ততার সাথে তারা এগিয়ে চলছে। সুতরাং আল্লাহ্ তাদের প্রতি أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ-এর যোগ্য বিবেচনা অভিযোগ আরোপ করবেন না এবং তার বিধান অনুযায়ী তাদেরকে خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا দুনিয়ার জীবনে 'অপদস্থ ও লাঞ্ছিত' করবেন না, এমন আশা করার কোন কারণ নেই।

আপনি কি করবেন?

কর্তব্যের ডাক

আমরা যদি আমাদের বর্তমান অবস্থাকে হুবহু বহাল রাখা অপসন্দ করি এবং আমাদের প্রতি 'নিজের সঙ্গে শত্রুতা' করার এবং একটি 'কর্তব্য-অচেতন দল' হওয়ার যে-অপবাদ চেপে বসেছে, তাকে মানুষ ও খোদার সামনে থেকে অপসৃত করতে চাই, তবে তার একমাত্র উপায় এই যে, আমাদের আত্মসচেতন হতে হবে–নিজস্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য আমাদের স্মরণ করতে হবে। সর্বোপরি আমাদের নিজস্ব জীবন-লক্ষ্যকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে; কারণ মুসলমান হিসেবে অন্য কোন জীবন-লক্ষ্য আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এটা কোন সদ্বিশ্বাস বা রক্ষণশীল মনোবৃত্তির ফল নয়। বরং যে কিতাবকে আমরা খোদার কালাম বলে বিশ্বাস করি, যাকে সত্য পথ-নির্দেশ ও নির্ভুল জ্ঞান-উৎস বলে আখ্যা দেই এবং যার প্রতিটি কথাকে আমরা নির্দ্বিধায় মেনে নেবার ওয়াদা করেছি, এ হচ্ছে তারই ফয়সালা। এ কিতাবের অবতরণকালে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলোর অনুসারীগণ (ইহুদী ও খৃস্টান) কতকটা এমনি অবস্থায়ই লিপ্ত ছিল। কুরআন তাদের এই প্রত্যয়গত গোমরাহী এবং বাস্তব দোষ-ত্রুটির সমালোচনা করে তার মন্দ পরিণাম সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দিলে এবং আল্লাহ্‌র সত্য দ্বীন পেশ করে তাদের কাছে তার আনুগত্যের দাবি জানালে তাদের শিরা-উপশিরায় জাহিলিয়াতের অগ্নি দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠে। কেননা তাদের এ অহমিকা ছিল যে, একমাত্র তারাই আসমানী ধর্মের অনুগামী, বরং তার চাইতেও ঊর্ধ্বে–তারা আল্লাহ্‌ তায়ালার পুত্র এবং তাঁর একান্ত আপনজন। এ কারণেই তাদের সামনে আর কেউ হেদায়েত ও ইমামতের নিশানবাহী হয়ে আসবে, এটা কিছুতেই তারা সহ্য করতে পারেনি। ফলে উক্ত দাবির জবাবে তারা হিংসাত্মক পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করল। তারা একদিকে ইসলামের প্রতিবাদ ও তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে এবং অপরদিকে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করল। তাদের এইসব অসার যুক্তি ও দাবির জবাবে আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেনঃ

قُلْ يَاهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا
أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ (مائدة: ٦٨)

'(হে নবী, তাদেরকে) বলে দাও যে, হে আহলে কিতাব! যতক্ষণ না তোমরা তওরাত, ইঞ্জিল এবং তোমাদের প্রভূর কাছ থেকে অবতীর্ণ জিনিসকে প্রতিষ্ঠিত করবে, ততক্ষণ তোমরা কোন আসল সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নও।'

(মায়েদা-৬৮)

অর্থাৎ বর্তমান অবস্থায় থেকে তোমরা কিছুতেই সাক্ষ্য ও প্রমাণসহ সত্য ধর্ম সম্পর্কে কথা বলার উপযুক্ত নও। কেননা যে ভিত্তির ওপর তোমাদের জাতীয় স্বাতন্ত্রের ইমারত দাঁড়িয়েছিল, সেই ভিত্তিকেই তোমরা উপড়ে ফেলে দিয়েছ। এ ব্যাপারে তোমরা কেবল তখনই কথাবার্তা বলার হকদার হতে পার, যখন প্রকৃত বাদশার তরফ থেকে বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ বিধি ব্যবস্থাসমূহ তোমরা পালন করে চলবে এবং নিজেদের বাস্তব জীবনকে সেই বিধানের অনুসারী করে তুলবে। সেই সঙ্গে খোদার কিতাবের যে অংশকে তোমরা নিজেদের কর্মজগত থেকে নির্বাসিত করেছ, তাকে আগাগোড়া কার্যকরী করবে। যে-সত্যগুলো সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করানো হয়েছিল,তার হেফাজত ও ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে বিস্মৃত কর্তব্য স্মরণ করবে এবং তোমাদের জীবনের যে লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিল, তাকে আবার আঁকড়ে ধরবে।

এবার এই কুরআনী ফয়সালার আলোকে নিজেদের অবস্থা পর্যালোচনা করা যেতে পারে। পূর্ববর্তী কিতাবীদের ন্যায় মুসলিম জাতিরও সত্যানুসরণের বাস্তব নমুনা হচ্ছে এই যে, খোদার কিতাবের একটি অংশ শুধু বরকত আর তেলাওয়াতের জন্যেই রেখে দেয়া হয়েছে। সে অংশের সঙ্গে তার কোনই বাস্তব সম্পর্ক নেই। এমতাবস্থায় ন্যায় বিচার কি বলে? তাদেরকেও কোন সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নও'-এর শাস্তিযোগ্য বলে সাব্যস্ত করা এবং 'কুরআনকে প্রতিষ্ঠিত' না করা পর্যন্ত 'সত্যের সাক্ষ্যদাতা' ও 'শ্রেষ্ঠ উম্মত' হবার সম্মানের অনুপযুক্ত ভাবা ছাড়া কি অন্য কিছু ভাবা চলে? অবশ্যই নয়। সে যদি এ অবস্থায়ও নিজের বক্ষদেশে উক্ত সম্মানের পদক ঝুলিয়ে রাখে, তবে নিঃসন্দেহে তা হবে এক ধরনের দুর্নীতি। কাজেই সে যদি নিজের হারানো মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হতে চায়, তবে তার সুনির্দিষ্ট উপায় হচ্ছে এই যে, নিজের কর্তব্যের গুরুভারকে আবার তার কাঁধে তুলে নিতে হবে! এবং দুনিয়ার প্রতিটি কাজ, প্রতিটি ঝামেলা, প্রতিটি ব্যস্ততা ও প্রতিটি আকর্ষণ থেকে পরাঙ্মুখ হয়ে এই একটিমাত্র কাজের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। এই হচ্ছে তার মর্যাদা এবং তার জীবন-উদ্দেশ্যের অনিবার্য দাবি। এ দাবির সামনে নতি স্বীকার করা ছাড়া তার জাতীয় বৈশিষ্ট্যের পুনরুজ্জীবনের আর কোনই পথ নেই।

জাতীয় মুক্তির রাজপথ

এমনিভাবে এ-জাতির দুনিয়াবী সম্মান ও সৌভাগ্য লাভেরও এছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নেই। এর অনস্বীকার্য প্রমাণ হচ্ছে অপমান ও লাঞ্ছনা জর্জরিত বনী-ইসরাঈল সম্পর্কে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটিঃ

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ (مائدة: ٦٥)

এই কিতাবধারীরা যদি ঈমান পোষণ করত এবং খোদা-ভীতির পথ অবলম্বন করত, তো আমরা তাদের দোষ-ক্রুটিগুলো দূর করে দিতাম এবং নিয়ামতের বাগিচায় তাদের প্রবেশ করাতাম। আর যদি তারা তওরাত, ইঞ্জিল-এবং তাদের প্রভুর তরফ থেকে অবতীর্ণ হেদায়াতকে কায়েম করত, তো উপর থেকে তাদের ওপর রেজেক বর্ষিত হত এবং নিচ থেকেও উদ্গত হত। (মায়েদা-৬৫)

এই ছিল বনী-ইসরাঈল জাতির হারানো সৌভাগ্য ফিরে পাবার উপায়। কুরআনের এ বাণীর আলোকে মুসলিম জাতির কর্তব্য নির্ধারণ করাটাও কোন কঠিন কাজ নয়। রোগের ঐক্য ও সাদৃশ্য একই রূপ ওষুদের দাবি করে। ধ্বংস ও ব্যর্থতার অভিশাপ যে-পথে বনী-ইসরাঈলের মধ্যে নেমে এসেছিল, আহ্‌লে কুরআনের মধ্যেও ঠিক সেই পথেই এসেছে। কাজেই একথা সুস্পষ্ট যে আহ্‌লে কিতাবদেরকে যে-পথের নির্দেশ করা হয়েছিল, কেবল সেই পথেই এর থেকে মুক্তি লাভ করা যেতে পারে। কুরআন বলে—আর স্পষ্টত তার কথাই একজন মুমিনের পক্ষে শেষ কথার গুরুত্ব রাখে—আহ্‌লে কিতাবরা খোদায়ী বিধি-বিধানের কতকাংশকে বর্জন করেছিল এবং কতকাংশকে ভুলে বসেছিল। এর ফল তাদের ওপর থেকে খোদার কৃপাদৃষ্টি উঠে গিয়েছিল এবং আসমানী গযব তাদের ওপর ভেঙে পড়েছিল। এর থেকে তাদের মুক্তিলাভের উপায় ছিল উক্ত বিধি-বিধানকে পুনরায় তাদের বাস্তব জীবনে কার্যকরী করা। এমতাবস্থায় কারও মন-মগজ যদি কুরআনে হাকীমের ভাষা বুঝবার যোগ্যতা থেকে একেবারে শূন্য না হয়ে থাকে, তাহলে উক্ত আয়াতে নির্দেশিত বাণীর তাৎপর্য উপলব্ধি করা তার পক্ষে মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়। আল্লাহ্ তায়ালা যাকে বোধশক্তি এবং অন্তঃকরণ দান করেছেন, তিনি কুরআনের উক্ত আয়াতের মধ্যে এ আওয়াজও শুনতে পারেনঃ

কুরআনের অনুবর্তীরা যদি ঈমান পোষণ এবং খোদা-ভীতির পথ অবলম্বন করত, তাহলে আমরা তাদের দোষ ত্রুটিগুলো দূর করে দিতাম এবং তাদেরকে নিয়ামতের বাগিচায় প্রবেশ করাতাম। আর তারা যদি কুরআনকে কায়েম করত, তাহলে তাদের জন্যে ওপর থেকেও রিজিক বর্ষিত হত এবং পায়ের নীচ থেকেও উদগত হত।

এও শুনতে পারেনঃ

হে আহ্‌লে কুরআন! তোমরা আদৌ আসল সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নও, যতক্ষণ না কুরআনকে কায়েম করবে।

ফলকথা, 'কুরআনের প্রতিষ্ঠা' তথা দ্বীন-ইসলামের প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে এই জাতির জন্যে একমাত্র ব্যবস্থাপত্র। এটি আগে থেকেই আল্লাহ্ তায়ালা নির্দেশ করে দিয়েছিলেন। তিনি এ-ও বলেছিলেন যে, এই জিনিসটির ওপরই তোমাদের পরকালীন সৌভাগ্য এবং ইহকালীন মঙ্গল নির্ভরশীল। তোমরা যখনি এই দু'টি জিনিসের সন্ধান করবে, তখন এপথই অবলম্বন করতে হবে, এছাড়া আর সর্বত্রই শুধু মরীচিকা, সেখানে শুধু হোচট খাওয়া ছাড়া আর কিছুই তোমরা পাবে না। অর্থাৎ যেখান থেকে আমরা পিছু হটে এসেছি, কুরআন সেখানেই আমাদের ফিরে যাবার নির্দেশ দিচ্ছে। সুতরাং ইমাম মালেকের (রহ) নিম্নোক্ত কথাটির ভিতর কোন ভবিষ্যদ্বাণী অথবা কোন গুপ্ত রহস্য নেইঃ

لن يصلح اخر هذه الا بما صلح به اولها

এই জাতি যে-জিনিসটির বলে প্রথম যুগে কল্যাণ ও মঙ্গল লাভ করেছিল, শেষ যুগেও তার সাহায্যেই লাভ করবে।

বরং তাঁর মুমিনসুলভ দূরদৃষ্টি এ উজ্জ্বল সত্যটিকে পূর্ণ প্রত্যয়ের সঙ্গে তুলে ধরেছে। কোন ঈমানদার ব্যক্তির মনে এ ছাড়া আর কোন কথার উদয়ই হতে পারে না। 'দ্বীনের কল্যাণ' সম্পর্কে বলা যায় যে, তার জন্যে দ্বীনের প্রতি আনুগত্য ছাড়া আর কোন মাধ্যম কল্পণাই করা যায় না। কারণ, একথা সুস্পষ্ট যে, দ্বীনের রূপায়নের দ্বারাই দ্বীনী সংশোধন সম্ভব হতে পারে। তাছাড়া জাতির 'দুনিয়াবী কল্যাণ'ও তার সত্যের সাক্ষ্যদাতা পদে অভিষিক্ত হবার কারণ এই দ্বীনের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। কেননা, তাকে যে সৌভাগ্য ও সমুন্নতি দান করা হয়েছিল, তা ছিল ঐ জীবন-লক্ষ্যের প্রতি আনুগত্যের প্রতিফল। তেমনিভাবে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে বিজয় ও সাহায্যের যত ওয়াদা দিয়েছিলেন, তার সবটাই ছিল এই দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার শর্তাধীন। তাই মুসলমানদেরকে যখন এই সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল যে, তোমরাই সমুন্নত হবে এবং তোমাদের মুকাবিলায় তোমাদের দুশমনরা পরাজিত

ও পদানত হবে (اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ), তখন তার সঙ্গে 'তোমরা যদি মুমিন হও' -এর শর্তটিও আরোপ করা হয়েছিল। স্পষ্টত এ কোন সাময়িক বা বিশেষ ওয়াদা ছিল না, বরং এ ছিল একটি স্থায়ী ও নীতিগত ওয়াদা। এমন কি, হাদীস থেকে এ-ও জানা যায় যে, এই জাতির মধ্যে যে-দলটি দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার কর্তব্য পুরোপুরি আদায় করবে, বিশেষভাবে কেবল সেই দলটিই তার সম্মান ও সৌভাগ্যের প্রতিনিধি হবে। নবী করীম (সঃ) বলেনঃ

إِنَّ هٰذَا الْاَمْرَ فِىْ قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيْهِمْ اَحَدٌ اِلَّا كَبَّهُ اللّٰهُ عَلٰى وَجْهِهِ مَا اَقَامُوا الدِّيْنَ (بخارى)

নিঃসন্দেহে, এই খিলাফত ততক্ষণ পর্যন্ত কোরাইশদের মধ্যেই থাকবে, যতক্ষণ তারা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত রাখার কর্তব্য পালন করতে থাকবে (এমতাবস্থায়) যে-ব্যক্তি তাদের সঙ্গে শত্রুতা করবে, আল্লাহ্ তাকে উল্টোভাবে (দোযখে) নিক্ষেপ করবেন।

পূর্ববর্তী আলোচনার সারসংক্ষেপ

এ পর্যন্তকার গোটা আলোচনা থেকে কতিপয় নীতিগত ধারা লির্গলিত হয়ঃ

প্রথম এই যে, এই জাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল আল্লাহ্র দ্বীনের প্রতিষ্ঠা এবং আজও তা-ই রয়েছে।

দ্বিতীয় এই যে, এই কর্তব্য সম্পাদনে আল্লাহ্ তায়ালার গায়েবী সাহায্য হামেশা তার সহায়তা করে আসছে। প্রকৃতপক্ষে এ গায়েবী সাহায্যের বদৌলতেই সে অতুলনীয় সম্মান ও সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছিল।

তৃতীয় এই যে, এই জাতির উত্থান ও পতন আসলে প্রাকৃতিক আইন ও বস্তুগত উপায়-উপকরণের ওপর নয়, বরং নৈতিক বিধানের ওপর নির্ভরশীল। অন্য কথায়, যে-কর্তব্য পালনের জন্যে সে দুনিয়ায় প্রেরিত হয়েছে, তার ওপরই তার সমুত্থান নির্ভরশীল। কিন্তু এ কর্তব্য পালনে সে যদি ঔদাসীন্যের পরিচয় দেয় তো অন্যান্য জাতির তুলনায় সে আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে দ্বিগুণ শাস্তির উপযোগী হবে।

চতুর্থ এই যে, এই জাতির বর্তমান অবস্থা একথাই স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, সে আল্লাহ্র কিতাবের একটি বিরাট অংশকে কার্যত বর্জন করেছে এবং দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার কর্তব্য সম্পর্কে গাফেল হয়ে পড়েছে।

পঞ্চম এই যে, কুরআনী ঘোষণার প্রেক্ষিতে এই জাতির মুক্তি ও কল্যাণের

একটি মাত্র পথ ছাড়া বাকী সমস্ত পথই চিরতরে বন্ধ। সে পথটি হচ্ছে এই যে, তাকে তার জীবনের কর্তব্য সঠিকভাবে জেনে নিতে হবে এবং আল্লাহ্‌র দ্বীনকে পুরোপুরি কায়েম করার জন্য কায়মনোবাক্যে আত্মনিয়োগ করতে হবে। পক্ষান্তরে সে যদি এ পথ ছেড়ে অন্য কোন পন্থা অবলম্বনের চেষ্টা করে, তবে তার সমস্ত প্রয়াস-প্রচেষ্টা শুধু বিফলেই যাবে না, বরং সে পথটি তাকে তার নিজস্ব স্থান থেকে আরো বহু দূরে সরিয়ে নিবে এবং তার অবশিষ্ট সম্মান ও সৌভাগ্যটুকুও ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। কেননা, সে তার দ্বীনী বন্ধন ছিন্ন করে অন্যান্য জাতির মুকাবিলায় কখনো অগ্রগতি লাভ করতে পারে না। আর দৃশ্যতঃ সে কখনো উন্নতি লাভ করলেও তা হবে অন্যের দান মাত্র–অন্যের দয়া-অনুগ্রহের ওপরই নির্ভর করবে তার অস্তিত্ব। বস্তুত এর চাইতে বড় অপমান আর কিছুই হতে পারে না।

পাশ-কাটানোর পথ

পলায়নী মনোবৃত্তির তাগিদ

এ সত্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে যে-ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান পোষণ করে, যে মুসলমান হিসেবে বাঁচতে এবং মুসলমান হিসেবে মরতে চায়, যার মনে ইহলৌকিক কর্তব্য-কর্ম সম্পর্কে পারলৌকিক জবাবদিহির অনুভূতি বর্তমান রয়েছে, সর্বোপরি যে বিশ্বাস করে যে, খোদার কালাম যা কিছু বলে, উত্থান-পতন ও মান-অপমানের যে দর্শন বাতলায়, তা মানুষের মনগড়া দর্শনের ন্যায় আন্দাজ-অনুমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, বরং তার ভিত্তি হচ্ছে পরম সত্যের ওপর–তার সর্বাংশই সমান সত্য–এমন ব্যক্তির পক্ষে সকল দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে, সমস্ত আওয়াজ থেকে কান বন্ধ করে, প্রবৃত্তি ও শয়তানের সমস্ত প্রতারণা ও অসওয়াসা থেকে মনকে পবিত্র করে এবং তামাম আশঙ্কা থেকে নির্ভীক হয়ে উক্ত সিরাতে মুস্তাকীমে দৃঢ়ভাবে পদক্ষেপ করা এবং সত্য দ্বীনকে কায়েম করার কাজে সমস্ত দৈহিক ও মানসিক শক্তি নিয়োজিত করা ছাড়া আর কোন পথই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। অবশ্য সে নিজের বুদ্ধিমত্তা ও কলাকৌশল প্রয়োগ করে তার জন্যে সময়োচিত কর্মকৌশল চিন্তা করতে পারে, যুগধর্মের প্রেক্ষিতে বিশেষ ধরনের কর্মপন্থা গ্রহণ করতে পারে, পরিবেশের চাহিদা অনুযায়ী কোন বিশিষ্ট কর্মনীতি (Policy) উদ্ভাবন করতে পারে; কিন্তু সে কিছুতেই নিজের উদ্দেশ্য ও জীবন-লক্ষ্যে কোনরূপ রদ-বদল কিংবা তাকে মূলতবী করে দিতে পারে না। এ-ধরনের যে-কোন পদক্ষেপ নিশ্চিতরূপে তার অধিকার-বহির্ভূত। উপরিউক্ত পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে এবং উক্ত জীবন-লক্ষ্যকে বর্জন করে সে যে পদক্ষেপই গ্রহণ করবে, তা হবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিদ্রোহ এবং জাতীয় আত্মহত্যার পদক্ষেপ। এমতাবস্থায় তার দৃষ্টান্ত হবে এমন নাদান অন্ধের মত, যে কোন গভীর খাদের দিকে এগিয়ে চলছে আর তার শুভাকাঙ্খী দিশারী তাকে সেদিকে যেতে চিৎকার করে বারণ করছে এবং তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছে। কিন্তু সে একদিকে তার দিশারীর জ্ঞান, সততা, শুভাকাঙ্খা ও আন্তরিকতার প্রশস্তি গাইছে বটে, অন্যদিকে তার নিষিদ্ধ পথে চলবার জন্যে জিদ ধরছে। কারণ সে পথটি তার কাছে অপেক্ষাকৃত ঢালু মনে হচ্ছে, তাতে সে পা-ও বাড়াতে পারছে সহজে। অন্যদিকে দিশারীর নির্দেশিত পথটি কিছু উন্নত বলে ধারণা হচ্ছে বটে, কিন্তু তাতে পা বাড়াতে হলে কিছুটা অসুবিধা পোহাতে হয়।

দুর্ভাগ্যবশত আজ সমগ্র জাতি ঠিক এমনি অন্ধের ভূমিকা পালন করে চলছে। সে যে-পথেই কোন জাতিকে চলমান ও কর্মতৎপর দেখতে পায়, সে পথেই সে ছুটে চলতে প্রস্তুত। সে পথটি তার কাছে একটু সহজ, সমান্তরাল ও চিত্তাকর্ষক মনে হলেই হল–তা তাকে নিশ্চিত ধ্বংস ও ব্যর্থতার দিকে নিয়ে গেলেও আপত্তি নেই। কোন পথে যদি তার পদক্ষেপ করতে আপত্তি থেকে থাকে তো তা হচ্ছে দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথ। কারণ এ পথটি তার কাছে দুর্গম ও কন্টকাকীর্ণ বলে মনে হয়। কুরআন তাকে অন্যান্য সমস্ত পথ থেকে বিরত রেখে এই একটি মাত্র পথের দিকে আহবান জানায়; কিন্তু সে তা শুনেও না শোনার ভান করে। কুরআন বলে, 'আমিই তোমার একমাত্র শুভাকাঙ্খী।' সে জবাবে বলে, 'এটা তো আমারও ঈমান।' কুরআন বলে, 'আমিই তোমার পথপ্রদর্শক ও ত্রাণকর্তা'। সে জবাব দেয়, 'এ কথা কোন কাফের অস্বীকার করে?' কুরআন বলে, 'আমি কখনো মিথ্যা বলি না, কখনো ভ্রান্ত জিনিস পেশ করি না, কখনো অনুমান, কল্পণা ও অমূলক ধারণার ওপর নিজের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করি না'। সে জবাব দেয়, 'একথায় সন্দেহ নেই।' কুরআন বলে, 'সত্যজ্ঞান কেবল আমারই কাছে রয়েছে, আমি হামেশাই সঠিক পথ নির্দেশ করি, আমার শিক্ষার ভিতরেই তোমার এবং সমগ্র মানবতার মুক্তির রহস্য নিহিত রয়েছে।' সে জবাব দেয়, 'একথা সন্দেহাতীত।' কুরআন বলে, 'আমি ছাড়া সব কিছুই বাতিল, আমার বিরোধী সবকিছুই নিরেট জাহেলিয়াত। আমার প্রতিকূল প্রত্যেকটি জিনিসের মধ্যে ধ্বংস ও ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই নেই।' সে জাবাব দেয়, 'অবশ্য-অবশ্যই'। কিন্তু যখনি কুরআন বলে, 'তোমার জন্যে আমার কাছে একটি অসিয়ত রয়েছে এবং তা হচ্ছে দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার অসিয়ত', অমনি তার জবান–যা এতক্ষণ তার প্রতিটি দাবির সত্যতা স্বীকারে মুখর ছিল–একেবারে বন্ধ হয়ে যায় এবং তার পরিবর্তে বাহানা ও অজুহাতের এক বিরাট বাহিনী সামনে এসে দাঁড়ায়,–যাতে করে এই কপটসুলভ মৌনতার কারণে তার অন্তরের গভীরতম প্রদেশে উত্থিত তরঙ্গকে দমিয়ে দেয়া যায়। কারণ অপরাধী মানুষের মধ্যে যদি আত্মসম্মানবোধের কিছু মাত্র অস্তিত্ব থাকে তো লোকদের সামনে সে কখনো অপরাধী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে ইচ্ছুক হয় না। এই আত্মমর্যাদাবোধের ভিতর কর্তব্যানুভূতির উত্তাপ থাকলে অবশ্য সে অপরাধের কাফ্‌ফারা আদায় করতে এবং বাস্তব কাজের মাধ্যমে তার কলঙ্ক-চিহ্ন মুছে ফেলতে বাধ্য হয়। কিন্তু এর ব্যতিক্রম হলে-তার হৃদয় এ অনুভূতি থেকে একেবারে শূন্য হলে, তখন এ অপরাধটাকে সত্য ও সুকৃতিসম্মত বলে প্রমাণ করার চেষ্টায়ই তার সমস্ত মানসিক যোগ্যতা ব্যয়িত হতে থাকে। এ সময় তার প্রবৃত্তি তাকে নির্দোষিতার ধোঁকায় ফেলবার জন্যে অক্লান্ত চেষ্টায় লিপ্ত হয়। তার

নির্দেশেই তার মস্তিষ্ক বাহানার একটি চমকপ্রদ মুখোশ তৈরী করে দেয়। সেটিকে আপন মুখমণ্ডলে পরিয়ে নিয়ে নিজেকে এই বলে প্রবোধ দেয় যে, সে মোটেই ভ্রান্ত-পথগামী নয়। অতঃপর সে অন্য লোকদেরকেও এমনি প্রবোধ দেয়ার চেষ্টা ও আকাঙ্খা পোষণ করতে থাকে। যাতে করে তার কলঙ্ক-চিহ্নের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করবার মত কেউ না থাকে।

বস্তুত জাতীয় কর্তব্য ও জীবন-লক্ষ্য রূপায়ণে মুসলিম জাতির অবস্থা হচ্ছে ঠিক এইরূপ। সে নিজের কর্তব্যচ্যুতির স্বপক্ষে অনেকটা এ ধরনের নির্দোষিতারই অভিনয় প্রদর্শন করছে। কয়েক শ' বছরের অধঃপতন তার কর্তব্যানুভূতিকে একেবারেই শোচনীয়ভবে দমিয়ে দিয়েছে। ফলে কোন জীবন-লক্ষ্যের রূপায়ণের জন্যে—বিশেষত দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জনের জন্যে—যা কখনো সহজ কাজ ছিল না, যার মধ্যে ধন-প্রাণ উৎসর্গ, আরাম-আয়েস পরিত্যাগ এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার বিলুপ্তি একেবারে প্রাথমিক শর্ত—যে-সব মহৎ আবেগের প্রয়োজন হয়ে থাকে, তার থেকে তার হৃদয় প্রায় শূন্য হয়ে পড়েছে। এ কারণেই সে নিজের অপরাধ স্বীকার করে তার প্রতিকারের চেষ্টা করা এবং হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধার করার পরিবর্তে আদপেই কোন দায়িত্ব স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। বরং নানারূপ অপ্রাসঙ্গিক বাহানা তুলে সে বাকী অনুভূতিটুকুও দমিয়ে চলছে। এ সমস্ত বাহানাও বিভিন্ন ধরনের; বিভিন্ন লোক কর্তব্য পালনের আহবানের জবাবে বিভিন্ন রূপ অজুহাত পেশ করে। এ সমস্ত বাহানা ও অজুহাত—অন্য কথায় পলায়ন ও পাশ-কাটানোর এই 'দর্শন' জাতির শতকরা নিরানব্বই ভাগেরও বেশী লোকের পক্ষে দৃষ্টির আচ্ছাদনে পরিণত হয়েছে এবং এ গুলোর অসারতা তুলে না-ধরা পর্যন্ত আপন কর্তব্যের দিকে তাদের ফিরে আসা প্রায় অসম্ভব। কাজেই এ বাহনাগুলো পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা এবং সমালোচনার দৃষ্টিতে এগুলোর যথার্থ মূল্যায়ন করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

পাশ-কাটানোর 'দর্শন'

সাধারণভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এ বাহানা কিংবা পাশ-কাটানোর এ 'দর্শন' হচ্ছে মোটামুটি পাঁচটিঃ

এক দলের বক্তব্য এই যে, কাজের লোকের জন্যে কোন অবস্থায়ই তার প্রকৃত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভের পথ বন্ধ নয়। কাজেই আল্লাহ্ যাকে সৎকাজ, খোদাভীতি ও খোদার পথে প্রত্যাবর্তনের তওফিক দিয়েছেন, সে আজও দ্বীনের কাজ সঠিকভাবে সম্পাদন করছে, আপন কর্তব্যগুলো পালন করে চলছে, দ্বীনের প্রতিষ্ঠা করছে, সত্যের সাক্ষ্যদান করছে এবং লোকদেরকে সৎকাজের নির্দেশ ও

উৎসাহ প্রদান করছে। এখন বাকী থাকে শুধু কুরআন ও সুন্নাহর উপরিউক্ত সামাজিক ও সামগ্রিক বিধানগুলো। এগুলো হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এগুলোর লক্ষ্য হচ্ছে মুসলমানদের শাসকবর্গ–জনসাধারণ নয়। বর্তমানে যেহেতু কোথাও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত নেই,[১] এ কারণেই ঐ বিধানগুলোর প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠার দায়িত্বের কোন প্রশ্নই উঠে না। অবশ্য জনগণের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত কিছু কিছু বিধান হয়ত কার্যকরী হচ্ছে না–যেমন অনৈসলামী আদালতের মাধ্যমে বিষয়াদির মীমাংসা না-করানোর এবং অনৈসলামী আইন মোতাবেক বিচার-ফয়সালা না করানো ইত্যাদি। এগুলো শুধূ তারা নিরুপায়বশএ করছে। আর শরীয়তেও এক সাধারণ মূলনীতি রয়েছে যে, নিরুপায় অবস্থায় নাজায়েয কাজও মুবাহ হয়ে যায়। কাজেই কুরআনের এক অংশ বর্জন করা এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কর্তব্য বিস্মৃত হবার সাধারণ অভিযোগ অভ্রান্ত নয়।

দ্বিতীয় দলের বক্তব্য এই যে, নিঃসন্দেহে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে মুসলিম জাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য। কিন্তু বর্তমান প্রতিকূল পরিবেশে এ লক্ষ্য অর্জনের কোনই সম্ভাবনা নেই। কাজেই বর্তমান অবস্থায় তার জন্যে চেষ্টা-সাধনা করা সময় ও শক্তির অপচয় ছাড়া কিছু নয়। পরন্তু দুনিয়ার সামনে তাকে খোলাখুলি পেশ করা শুধু অযৌক্তিক ও অদূরদর্শিতারই পরিচায়ক নয়, বরং জাতীয় স্বার্থের পক্ষেও অত্যন্ত ক্ষতিকর ও মারাত্মক। এই কারণেই দ্বীনী খেদমতের জন্যে আপাতত কিছু ছোটখাট ধরনের পন্থা অবলম্বন করা উচিত–যা কার্যকরী করা সম্ভব এবং বাস্তব অভিজ্ঞতায় দ্বীন-ইসলামের পুনরুজ্জীবনে কল্যাণকর প্রমাণিত হয়েছে এবং যা পরবর্তীকালে আমাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্যে পরিবেশকে তুলনামূলকভাবে বেশী অনুকূল করে তুলতে সমর্থ। অতঃপর বর্তমান অবস্থা যখন বদলে যাবে এবং আমাদের মিশনের পক্ষে তা একটা প্রতিকূল বলে বিবেচিত না হবে, তখনি এজন্যে সরাসরি চেষ্টা-সাধনা করা সম্ভব হবে।

তৃতীয় দলের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে এই যে, আলোচ্য লক্ষ্যের সত্যতার ব্যাপারে কোন প্রশ্নের অবকাশ নেই। কিন্তু এ কাজের জন্যে সিদ্দীক (রাঃ) ও ফারুক (রাঃ)-এর মত লোকদের দরকার–আমাদের পক্ষে তেমন হওয়া সম্ভবপর নয়। কাজেই এটা শুধু আমাদের সাধ্যায়ত্ত কাজই নয় পরন্তু নবীর কাছ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা যে মিশনকে ত্রিশ বছরের বেশী চালাতে পারেননি, তার জন্যে আমাদের মত দুর্বল ঈমানদারদের অস্থিরতা প্রদর্শন তকদীরের সাথে লড়াই করারই শামিল। চৌদ্দশো' বছরের পূর্বেকার যুগ এখন আর ফিরে আসতে পারে না।

---

১. এটাও বহুকাল আগেকার কথা। দুনিয়ার বর্তমান অবস্থায় এ অজুহাতটিও প্রযোজ্য নয়
–অনুবাদক

চতুর্থ দলের চিন্তাধারা হচ্ছে এই যে, কাজের কোন পথ যখন উন্মুক্ত হবে এবং কোন সাহসী কাফেলা সে পথে সাফল্যে সঙ্গে যাত্রা শুরু করবে, তখন আমরাও উঠে দাঁড়াব। অর্থাৎ কোন চেষ্টা-সাধনার সূচনাই তাদের পদক্ষেপকে ত্বরান্বিত করতে পারে না; বরং কিছু লোককে যখন অগ্রগামী বলে তারা দেখতে পাবে এবং তারা সুদৃঢ় ও অবিচলভাবে এগিয়ে গিয়ে অনেকখানি পথ পরিস্কার করে দেবে তাদের পক্ষে তখনি পদক্ষেপ করা জরুরী বিবেচিত হবে।

পঞ্চম দলের লোকেরা হযরত ইমাম মাহদীর আগমন-প্রতিক্ষায় বসে আছে। অবশ্য আলোচ্য লক্ষ্যের সত্যতার ব্যাপারে এই দলের কোন মতানৈক্য নেই। কিন্তু তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে অনেকটা এ ধরনের যে, এ কাজের জন্য আল্লাহ্ তায়ালা ইমাম মাহদীকে পাঠানোর ওয়াদা করেছেন। তাঁরই নেতৃত্বাধীনে এ আন্দোলন চালিত হবে। তাঁর আসবার আগে সাধারণ উম্মতের ওপর এ কাজের কোন বিশেষ দায়িত্ব নেই। কাজেই এ-মার্থাব্যাথাটি খামাখা আমাদের বরণ করে নেয়া উচিত নয়।

এই দলগুলোর এবং এদের এই চিন্তাধারার উৎস হচ্ছে মুসলমানদের ধার্মিক ও দ্বীনদার বলে পরিচিত মহলটি। এ-ছাড়া যে মহলটি নিজের জীবন থেকে দ্বীন-ইসলামকে কার্যত নির্বাসিত করেছে, যারা জীবনের সমস্যাদিতে কুরআন ও সুন্নাহর কোন ইখতিয়ার (Authority) স্বীকার করতেই প্রস্তুত নয়, তাদের চিন্তাধারা উল্লেখ করা সম্পূর্ণ নিরর্থক। কেননা, এই পর্যালোচনায় তাদের কথা স্থান পাবারই অধিকারী নয়, বরং তারা নিজেরাও সম্ভবত এটা পসন্দ করবে না।

এবার ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেক দলের চিন্তাধারা সাক্ষ্য-প্রমাণের মানদণ্ডে যাচাই করে দেখা যাক। এতে করে সেগুলোর সঠিক গুরুত্ব জানা যাবে এবং এর কোন একটি বাহানাও আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এতটুকু হ্রাস পায় কিনা একথাও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাবে।

দ্বীনের আংশিক আনুগত্যে সন্তুষ্টি

গোটা শরীয়তের আনুগত্য করার অপরিহার্যতা

একথা দাবি করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয় যে, কুরআন ও সুন্নাহয় শুধু নামায-রোযা ও হজ্জ-যাকাত সম্পর্কিত কর্তব্যগুলোই বিবৃত হয়েছে এবং মুমিনের কাছে শুধু এই নির্দিষ্ট বিধানগুলোই পালন করে চলবার দাবি জানানো হয়েছে। তেমনিভাবে একথা বলারও কেউ দুঃসাহস করতে পারে না যে, ইবাদত ও আখলাক ছাড়া অবশিষ্ট বিধানগুলো হচ্ছে (নাউযুবিল্লাহ) নিছক পৃষ্ঠাভরার বিষয়। বরঞ্চ এ-একটি সর্বস্বীকৃত সত্য যে, কুরআন ও সুন্নাহর বিধানগুলো হচ্ছে বন্দেগী ও আনুগত্যের একটি ব্যাপকতর পদ্ধতি এবং জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ বিধান। এর প্রতিটি অংশই হচ্ছে অনুসৃতি ও কার্যোপযোগী। কেউ জ্ঞানগত দিক থেকে তার ভিতরে হয়ত পার্থক্য সূচিত করতে পারে এবং তার পুরস্কার ও প্রতিফলের মধ্যেও হয়ত অনুপাত নির্ণয় করতে পারে; কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তার ভিতরে না কেউ পার্থক্য করার অধিকারী আর না তার কোন প্রয়োজন আছে। একজন গোলামের কাজ হচ্ছে মনিবের ছোট-বড় সমস্ত হুকুম তামিল করা। তার পক্ষে জরুরী ও অজরুরীর বিতর্ক সৃষ্টি করে কতক হুকুম তামিল করা এবং কতক অগ্রাহ্য করার কোনই অধিকার নেই। মনিবের হুকুম হুকুমই, তা যে-কোন অবস্থায় পালন করা কর্তব্য। মুসলমানও আল্লাহ্ তায়ালার পূর্ণাঙ্গ দাসত্ব এবং তাঁর সার্বক্ষণিক গোলামীর ওয়াদায় আবদ্ধ। এমতাবস্থায় তার মনিবের কাছ থেকে যদি এই মর্মে দু'টি নির্দেশ আসে যে, নামাজ পড় এবং চোরের হাত কেটে দাও, তাহলে সমান মনোযোগ সহকারে উভয় নির্দেশ পালন করাই হচ্ছে তার কর্তব্য। কারণ সে যদি উভয় নির্দেশের মধ্যে শুধু প্রথমটি পালন করে আর দ্বিতীয়টি শুনেও চুপ করে থাকে, তাহলে তার এই আচরণকে আল্লাহ্ তায়ালার পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য এবং তাঁর বিধান-শাস্ত্র কুরআনের পূর্ণ অনুবর্তন বলে কে আখ্যা দিতে পারে? অথচ তামাসার ব্যাপার এই যে, কুরআনের শুধু দু'একটিই নয়, অসংখ্য বিধান আজ অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে, তবুও আমাদের আত্মতুষ্টি হচ্ছে এই যে, দ্বীন-ইসলামের আনুগত্যের দাবি আমরা পুরোপুরি পালন করে চলছি।

রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চনার ওজর

এর পরবর্তী অজুহাত হলো এই যে, আমরা আদপেই ঐ বিধানগুলোর জন্যে দায়ী নই–ঐগুলো প্রবর্তনের দায়িত্ব হচ্ছে মুসলমানদের শাসনকর্তার। আজকে

ইসলামী রাষ্ট্র নেই বিধায় ঐ বিধানগুলো প্রবর্তন করার কোন প্রশ্নই ওঠে না এবং সেহেতু বর্তমানে এ দায়িত্ব পালন জরুরীও নয়। বস্তুত এ হচ্ছে অপরাধের প্রকাশ্য অজুহাত এবং এ অজুহাতটি খোদ অপরাধের চাইতেও নিকৃষ্টতর। কুরআনের কোথাও একথা বলা হয়নি যে, হে মুসলমানদের শাসনকর্তা! তুমি চোরের হাত কেটে দাও; অথবা হে ইসলামী রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ! ব্যভিচারীকে তোমরা চাবুক মার। বরং এ ধরনের আইন প্রবর্তনের নির্দেশ যেখানে দিয়েছে, সেখানে গোটা জাতিকেই সে সম্বোধন করেছে। যেমন চৌর্যবৃত্তি সম্পর্কিত আয়াতে বলা হয়েছেঃ

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا (مائده: ٤)

চোর পুরুষ হোক আর নারী, তার হাত কেটে দাও।

এই শব্দটির ভিতরে অবশ্য একথা স্পষ্টত উল্লেখ নেই যে, এখানে কা'কে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু এর ভিতরে এমন দু'টি বুনিয়াদী কারণ রয়েছে, যার ভিত্তিতে ঈমানদারদের গোটা সমাজকেই এ নির্দেশের লক্ষ্য বলে অভিহিত করা যেতে পারে। প্রথম কারণ এই যে, যতক্ষণ কোন নির্দেশ সম্পর্কে এ ব্যাখ্যা না থাকবে অথবা কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকবে যে, এটা অমুক বিশেষ ব্যক্তির বা বিশেষ শ্রেণীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, ততক্ষণ তাকে সমগ্র ঈমানদারের জন্যে সাধারণ নির্দেশ মনে করতে হবে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, এ আয়াতের মাত্র তিন আয়াত পূর্বেই . يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا . বলে ঈমানদারগণকে নির্বিশেষে সম্বোধন করে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। মধ্যবর্তী দুটি আয়াতে কাফেরদের মন্দ পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং তারপরই এসেছে চৌর্যবৃত্তি সম্পর্কিত এই আয়াতটি। এর সুস্পষ্ট মানে হচ্ছে এই যে, . يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا . এর সম্বোধন থেকে এখানে যা' কিছু বলা হয়েছে, হাত কাটার নির্দেশটিও তারই অন্তর্ভুক্ত। এর লক্ষ্য কোন বিশেষ ব্যক্তি বা মুসলমানের কোন বিশেষ শ্রেণী নয়, বরং সমগ্র মুসলমানই এর লক্ষ্য। তাই আল্লামা ইবনে জরীব তিবরী (রহ) এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেনঃ

يقول جل ثناءه من سرق من رجل او امرأة فاقطعوا ايها الناس يده فلا تفرطوا ايها المؤمنون فى اقامة حكمى على السراق وغيرهم من اهل الجرائم الذين اوجبت عليهم حدودا فى الدنيا (تفسير ابن جرير جلد ٧، صفحه ١٣٢)

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ হে লোকসকল! যে পুরুষ বা নারী চুরি করবে, তারহাত কেটে দাও। হে মুসলমানগণ! চোর এবং যেসব অপরাধীর জন্যে আমি দুনিয়ায় শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছি, তাদের প্রতি আমার নির্ধারিত আইন প্রয়োগে অণুমাত্রও গাফলতি করো না।

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, فاقطعوا শব্দের প্রকৃত সম্বোধন-পদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লামা জরীর এক জায়গায় ايها الناس এবং অন্যত্র ايها المؤمنون শব্দ ব্যবহার করেছেন। কোথাও তিনি يا اولى الامر বলেন নি। কেবল তাই নয়, এ প্রসঙ্গে তিনি একথাও সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, সম্বোধন পদের এই সার্বজনীনতা শুধু এই আয়াত পর্যন্তই সীমিত নয়, বরং সমস্ত দণ্ড বিধি আইনের বেলায়ই এ নীতি সমভাবে প্রযোজ্য এবং তার সর্বত্রই ঈমানদারগণকে সমষ্টিগতভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। অন্য কথায় বলা যায়, এ বিধানগুলো প্রবর্তন ও কার্যকরী করার দায়িত্ব হচ্ছে গোটা জাতির। এ কারণেই ঐ বিধানগুলোর লক্ষ্য শাসনকর্তাগণ বিধায় এ ব্যাপারে জাতির সাধারণ লোকদের কোন দায়িত্ব নেই, এ হচ্ছে একটা বাজে অজুহাত। এটা কোনমতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

অবশ্য এ ব্যাপারে একটি কথা সত্য এবং শুধু সত্যই নয় বরং নিতান্ত জরুরীও বটে। তা'হলো এই যে, এই বিধানগুলো শাসনকর্তাদের মাধ্যমেই জারি করতে হবে। কেননা রাষ্ট্র ব্যবস্থা এটাই দাবি করে। নচেত সমাজের মধ্যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে এবং কোন সামাজিক কাঠামোই বাকী থাকবে না। অথচ ইসলামের চাইতে শান্তি ও শৃঙ্খলার বড় দাবিদার আর কেউ হতে পারে না।

এবার দু'টি কথা সপ্রমাণিত ও সর্বজনস্বীকৃত হলোঃ প্রথম এই যে, সামগ্রিক বিধানগুলোর আসল লক্ষ্য ও জিম্মাদার হচ্ছে গোটা জাতি। দ্বিতীয় এই যে, ঐ বিধানগুলো কার্যত শাসনকর্তাগণই জারি করে থাকেন। এ দু'টি সার্বজনীন কথার মিলিত অর্থ দাঁড়ায় এই যে, শাসনকর্তাগণ ঐ বিধানগুলো জারি ও প্রবর্তন করে থাকেন গোটা জাতির তরফ থেকে, তাদের প্রতিনিধি হিসেবে—আসল জিম্মাদার আর দায়িত্বশীল হিসেবে নয়। এই নিগূঢ় সত্যটির পরিপ্রেক্ষিতে যদি কখনও এমনি প্রতিনিধিত্ব করার মত লোক বর্তমান না থাকে কিংবা বর্তমান থাকলেও সে তার কর্তব্য পালন না করে, তবে এ দায়িত্বভার স্বভাবতই তার আসল লক্ষ্য অর্থাৎ গোটা জাতির ওপর ন্যস্ত হবে। এমতাবস্থায় শাসনকর্তা বর্তমান না থাকলেও তা নিযুক্তকরা এবং বর্তমান থেকেও ঐ বিধানগুলো কার্যকরী না করলে তার জন্যে তাকে বাধ্য করা কিংবা তাকে অপসারিত করে অন্য লোককে সেখানে

অভিষিক্ত করা জাতির পক্ষে অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়বে। অধিকতর স্পষ্ট ভাষায় বলা যায়, এ বিধানগুলো হচ্ছে 'ফরযে কেফায়া' ধরনের। শাসনকর্তাগণ এটি প্রতিপালন করলে গোটা জাতির কর্তব্যই আদায় হয়ে যাচ্ছে। অন্যথায় এ হবে একটি সামাগ্রিক গোনাহ। এর দায়িত্ব গোটা জাতির কাঁধেই ন্যস্ত হবে।

এ পর্যন্ত এসে হয়ত আর একটি প্রশ্ন তোলা হবে। তা হলো এই যে, এই বিধানগুলো কার্যকরী করার জন্যে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ক্ষমতা–যার বর্তমানে জাতি নিজের মধ্য থেকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করতে এবং তার মাধ্যমে এ কর্তব্যটি সম্পাদন করতে পারে–আমাদের কাছে কোথায়? নিঃসন্দেহে এ একটি সুচিন্তিত প্রশ্ন এবং এ সম্পর্কে কোন দ্বিমতের অবকাশ নেই যে, এ ধরনের বিধান কার্যকরী করার আসল জিম্মাদার ও দায়িত্বশীল গোটা জাতি হলেও কার্যত এর প্রবর্তন একটি জবরদস্ত শক্তি (Coercive prower) অর্থাৎ রাষ্ট্রক্ষমতার বর্তমানেই হতে হবে। সে শক্তি ছাড়া এ জাতীয় বিধান কার্যকরী করা মোটেই সম্ভবপর নয়। এ কারণে এ কর্তব্যটি সম্পাদনের জন্যে–অন্যকথায় কুরআনের একটি বিরাট অংশ কার্যকরী করার জন্যে রাষ্ট্রশক্তির অস্তিত্ব অত্যাবশ্যক। কিন্তু এই প্রশ্ন সম্পর্কে ভাববার বিষয়টা কী? রাষ্ট্রশক্তির অবর্তমানে আমাদের তথা গোটা জাতির দায়িত্ব কি কিছুমাত্র হ্রাস পায়? অথবা তা আরও কঠোর এবং ভারী হয়ে দাঁড়ায়? কিংবা খোদার প্রতি 'শুকরিয়া' জানিয়ে এভাবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলা উচিত যে, যাক কুরআনের একটি বিরাট অংশ কার্যকরী করার দায়িত্ব থেকে তো অব্যাহতি পাওয়া গেলো? অথবা যে রাষ্ট্রক্ষমতা না থাকার ফলে খোদার অসংখ্য বিধানের আনুগত্যের সৌবাগ্য থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি এবং শুধু বঞ্চিতই নয়, তার বন্দেগীর হক্ আদায় করার কোনো উপায় পর্যন্ত নেই এবং খোদায়ী কিতাব পরিবর্জন ও বিস্মৃত হবার প্রাচীন গোমরাহির জুনরাবৃত্তি করতে হচ্ছে– সেই শক্তি অর্জনের চেষ্টা করা উচিত? অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে নিজের মন-মগজকে যুক্তিবাদীসুলভ কূটতর্ক থেকে মুক্ত করে হৃদয় ও বিবেকের আওয়াজের প্রতি কর্ণপাত করুন। তারা এই প্রশ্নগুলোর কী জবাব দিচ্ছে, শুনুন। বিশ্বাস করুন, যে হৃদয়ে ঈমানের সামান্য উত্তাপও বর্তমান রয়েছে, তা কখনো শান্তি ও স্বস্তির সঙ্গে এই পরিস্থিতিকে সহ্য করবার অনুমতি দিবেনা। কাজেই ঐ বিধানগুলো কার্যকরী করার উপযোগী শক্তির বর্তমানে তার ওপর যদি একটিমাত্র কর্তব্য ন্যস্ত হয় তো তার অবর্তমানে জাতির ওপর দু'টি কর্তব্য ন্যস্ত হবেঃ প্রথমত সেই শক্তি অর্জন করা, দ্বিতীয়ত সে শক্তির দ্বারা ঐ বিধানগুলো কার্যকরী করানো। কেননা এএকটি স্বকৃত নীতি যে, যে-বস্তুর ওপর কোনো কর্তব্য পালন নির্ভরশীল হয়ে দাড়ায়, সে বস্তুটি অর্জন করাও ফরয হয়ে প্রড়। যে ব্যক্তি কোআন কন্ঠস্থ না থাকা কিংবা জায়নামাজ অপবিত্র থাকার অজুহাতে নামাজ পড়েনা,

তাকে ভর্ৎসনা করতে আপনারা হয়তো এক লহমাও দেরী করবেন না; বরং তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগই তুলবেন যে, লেকটি তার কর্তব্য সম্পর্কে উদাসীনর, তার মনে নামাজের প্রতি কোনো গুরুত্ব বা অনুরাগ নেই। নচেত এমন ঠুন্‌কো অজুহাত কখনো সে দেখাত না, বরং দুনিয়ার সমস্ত কাজ-কারবার ছেড়ে দিয়ে প্রথমে সে কোরআন মুখস্ত করা বা জায়নামাজ পাক করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হতো। অথচ কী তাজ্জবের ব্যাপার যে কোরআনী বিধান কার্যকরী করার উপওযাগী শক্তি আয়ত্তাধীন নেই বলে তার এক বিরাট অংশকে নিষ্ক্রীয় রেখে মুসলমানরা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রয়েছে। আর এই মিথ্যা আত্মতুষ্টিতে তার মুমিনসুলভ অনুভূতি এতোটুকু আঘাত পর্যন্ত পাচ্ছে না। তার তাক্‌ওয়া ও পরহেজগারী সম্পর্কে তার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি একটু প্রশ্ন পর্যন্ত তুলছেনা, এমন কি নিজের এই অজুহাতকে তার আয়ত্তাধীন না থাকলে নিজের সমস্ত শক্তি-ক্ষমতা ও কলাকৌশল প্রয়াগ করে তা র্জন করা যে তারই সর্বপ্রথম কর্তব্য—একথাটি পর্যন্ত সে তীলয়ে চিন্তা করে না।

নিঃসন্দেহে এক একটি কঠিন কাজ এবং এর জন্যে সমগ্য শক্তি উৎসর্গ না করা পর্যন্ত এটা পুরোপুরি সম্পন্নও হতে পারেনা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, মুমিনের শক্তি—তা দৈহিক হোক আর মানসিক, আর্থিক হোক কি আত্মিক—কিসের জন্যে দেয়া হয়েছে? তার দিল-দিমাগ, তার জান-মাল তো তার নিজস্ব সম্পত্তি নয় যে, তাকে সঞ্চিত করে রাখবে; বরং যেদিন সে ঈমানের স্বীকৃতি ঘোষণা করেছে, সেদিনই সে এ জিনিসগুলো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির বিনিময়ে তাঁর কাছে বিক্রি করে দিয়েছেঃ

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

(توبة: ١١١)

আল্লাহ্‌ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল বেহেশতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন।

এই 'কেনা-বেচা' সম্পাদিত হবার পর এই জিনিসগুলো তার কাছে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে ন্যস্ত আমানত ছাড়া আর কিছুই নয়। আর 'আমানত' সম্পর্কে একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, মালিক ফেরত চাওয়া মাত্রই নিঃসঙ্কোচে তা' প্রত্যর্পণ করা আমানতদারের অবশ্য কর্তব্য। এই কারণেই কোন মুমিন যতক্ষণ তার ঈমানের দাবিকে অস্বীকার না করে, ততক্ষণ আল্লাহ্‌ তায়ালা তার ন্যস্ত আমানত যখন যে ভাবে ফেরত চাইবেন, অমনি তা' এনে হাযির করা তার অপরিহার্য কর্তব্য। এই আমানত আল্লাহ্‌ তাঁর মু'মিন বান্দার কাছে কেন ন্যস্ত করেছেন, নিজের কিতাবেই তিনি সে কথার জবাব দিয়েছেনঃ

جَاهِدُوا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ (توبة: ٤١)

নিজেদের ধন-মাল ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ কর।

এবার বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে মু'মিনের জান-মাল নিয়োজিত হবে তা হচ্ছে আল্লাহ্র পথ–অন্য কথায় তাঁর মনোনীত দ্বীন-ইসলাম। এই কারণেই সে উল্লিখিত জিনিসগুলোকে অকুণ্ঠচিত্তে আল্লাহ্র পথে উৎসর্গ করার মাধ্যমেই শুধু বন্দেগীর দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে। নতুবা যে জিনিস খোদার ক্রীত এবং আমাদের কাছে মাত্র আমানত হিসেবে রক্ষিত, চাওয়া মাত্রই তাঁর পথে ব্যয় করতে টালবাহানা করা কোন মামুলি অপরাধ নয়, বরং নিকৃষ্ট ধরনের খেয়ানত ও দুষ্কৃতির শামিল। এর একটি দৃষ্টান্ত হলোঃ এক ব্যক্তির ওপর খোদা কতিপয় আমানত ন্যস্ত রেখেছেন, যাতে করে তার আনুগত্যের পথে কোন বাধার সৃষ্টি হলে সম্ভাব্য সকল উপায়ে সে তা দূর করতে পারে; কিন্তু বাধার সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও লোকটি উক্ত আমানত প্রয়োগ করে তাকে দূর করার পরিবর্তে বাধার অজুহাত তুলে সেই নির্দেশ থেকেই নিজেকে দায়মুক্ত বলে ঘোষণা করছে এবং পরম নিশ্চিন্ততার সাথে উক্ত আমানতগুলোকে বলপূর্বক আপন প্রবৃত্তির সেবায় নিয়োজিত করছে। এমন ব্যক্তি নিজের প্রতি কত বড় জুলুম করে চলছে তা কল্পণাও করা যায় না।

উপায়হীনতার অজুহাত

অনৈসলামী রাষ্ট্রশক্তির বর্তমানে যে সমস্ত বিধান কার্যকরী করা সম্ভব নয়, এই খোঁড়া অজুহাতটি ছিল সেগুলো সম্পর্কে। এছাড়া এমন আরও কতিপয় বিধান রয়েছে, যেগুলো কার্যকরী করার পথে এই কুফরী রাষ্ট্র শক্তিও কোন অন্তরায় নয়; কিন্তু তা সত্ত্বেও এই অজুহাতে সেগুলোকে ফেলে রাখা হয়েছে যে, এটা নিরুপায়বশত হয়ে যাচ্ছে আর নিরুপায় অবস্থায় হারামও তো জায়েয হয়ে যায়। একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, এটা প্রথমটার মতই একটি গুরুত্বহীন অজুহাত। এ ধরনের কথা শুধু জনসাধারণের মানসিকতা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা কিংবা নিরুপায় অবস্থা সংক্রান্ত জরুরী সীমা ও শর্তাবলী সম্পর্কে নিতান্ত অজ্ঞতার ভিত্তিতেই বলা যেতে পারে। তাই যে নিরুপায়কালীন বিধানের আশ্রয়ে এই ধরনের কথা বলা হয়, তার বক্তব্যের প্রতি কিছুটা আলোকপাত করা যাকঃ

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ*

(بقرة: ١٧٢)

অবশ্য যে ব্যক্তি নিরুপায় হয়ে যায় (এবং সে কারণে হারাম খেয়ে নিজের জীবন রক্ষা করে) এমনি অবস্থায় যে, (ঐ হারাম বস্তু খাবার প্রতি) সে কোন আকর্ষণও বোধকরে না আর (অপরিহার্য পরিমাণের চাইতে) সীমা লংঘনও করে না তো তার জন্যে কোন গোনাহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মার্জনাকারী এবং অনুগ্রহকারী।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই আয়াতে একটি হারাম বস্তু ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ কথা সুস্পষ্ট যে, এই অনুমতি শর্ত বা সীমাহীন নয়; বরং এর জন্যে তিন তিনটি শর্ত আরোপ করা রয়েছে এবং এর সুযোগ গ্রহণ করতে হলে তার প্রতিটি শর্তই পূর্ণ করা অত্যাবশ্যক বলে ঘোষণা করা হয়েছে।ঃ

এর প্রথম শর্ত এই যে, পরিস্থিতি বাস্তবিকই নিরুপায়জনক হতে হবে এবং হালাল উপার্জনের সমস্ত উপায় এমনি বন্ধ হয়ে যাবে যে, হারাম ছাড়া জান বাঁচানোর আর কোন সম্ভাব্য উপায়ই বর্তমান থাকবে না।

দ্বিতীয় শর্ত এই যে, হারামের এই ব্যবহার غَيْرَ بَاغٍ (আকর্ষণমুক্ত) হতে হবে। অর্থাৎ মনের ভিতর তার প্রতি কোন আকর্ষণ থাকবে না, বরং তার ব্যবহারকালে পূর্ণ বিরূপ মনোভাব ও তীব্র সঙ্কোচবোধ জাগরুক থাকতে হবে।

তৃতীয় শর্ত এই যে, হারামের এই ব্যবহার ঠিক ততটাই করা যাবে, যতটা জান বাঁচানোর জন্যে অপরিহার্য।

এই তিনটি শর্তসহ কেউ যদি কোন নাজায়েয বস্তু ব্যবহার করে তো আল্লাহ্ তায়ালার কাছে সে অবশ্যই অপরাধী বলে সাব্যস্ত হবে না। কিন্তু এর কোন একটি শর্তও অপূর্ণ থেকে গেলে এই অনুমতির কোন সুযোগ গ্রহণ করা যেতে পারে না। এমতাবস্থায় কেউ এর সুযোগ গ্রহণ করলে তা হবে প্রকাশ্য দুর্নীতির নামান্তর এবং তাকে অবশ্যই আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে তার কুফল ভোগ করতে হবে।

ইসলামের নিরুপায়কালীন আইনের ব্যাখ্যা এখানে স্পষ্টভাবে পেশ করা হলো। এবার তার আলোকে নিজেদের সামগ্রিক আচরণ পদ্ধতি সঠিকভাবে পর্যালোচনা করুন এবং জাতির যেসব খোদাপরস্তু ব্যক্তি বাতিল রাষ্ট্রশক্তির অধীনে জীবন যাপন করতে, 'সীমালংঘনকারীদে'র (مسرفين) আনুগত্য করতে, লা-দ্বীনী আইন পরিষদে গিয়ে আইন রচনাকারী হতে, অনৈসলামীর আদালতে নিজের বিষয়াদি পেশ করতে এবং খোদাদ্রোহী আইন অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করতে তেমনি অক্ষমতা, অপ্রসন্নতা ও সঙ্কোচ বোধ করে, একজন মুমিন যেমন একখণ্ড শুকরের মাংস গলাধঃকরণ করতে বোধ করে থাকে–তাদের সংখ্যা বলুন। কোটি কোটি মানুষের এই বিরাট বাহিনী কি গাইরুল্লাহর প্রভুত্ব এবং

সীমালংঘনকারীদের আনুগত্যকে প্রকৃতপক্ষে কুরআনে বর্ণিত অক্ষমতা ও উপায়হীনতার সঙ্গে সরদাশত করছে? মুসলমানদের এই বিরাট দলটি যে সকাল-সন্ধ্যা খোদাদ্রোহী আদালত প্রদক্ষিণ করে থাকে, তারা কি নিজেদের এই কাজকে মূলত হারামই মনে করে এবং একে নেহাত নিরুপায় অবস্থায়ই গ্রহণ করে থাকে? এবং তাদের মধ্যে কি আপন প্রবৃত্তির গোলামী, খোদা নির্ধারিত সীমার প্রতি উপেক্ষা এবং শরয়ী বিধানের প্রতি বিদ্রোহ করার মত কোন চেতনা ক্রিয়াশীল থাকে না? সেখানে কি তারা শুধু এ জন্যই গমন করে যে, শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তারা নিজেদের জান-মালের নিরাপত্তার জন্যে কোন সম্ভাব্য পথ খুঁজে পায় না? যে সব মুসলিম জজ-ম্যাজিস্ট্রেট অনৈসলামী আইন-কানুন অনুযায়ী 'ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে' নিজেদের জীবন অতিবাহিত করে দেন, তারা কি প্রকৃতই দারিদ্র্য ও অন্নকষ্টের (مَخْمَصَةٌ) কবলে নিক্ষিপ্ত হন এবং এহেন 'অক্ষমতার' জন্যেই এই পেশাটি গ্রহণ করে থাকেন? তারা যখন মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র নির্ধারিত বিধি-বিধান পেছনে ফেলে খোদা-বিমুখ মানুষের রচিত বিধান অনুসারে বিচার-ফসালা করেন, তখন এই কাজের অনিষ্টকারিতা কি তারা মনে প্রাণে উপলব্ধি করেন এবং নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে অনুশোচনা বোধ করেন? এই কাজটি কি তারা সম্পূর্ণ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ হয়েই সম্পাদন করেন? এই প্রশ্নগুলোর জবাব যদি নেতিবাচক না হয়, তবে নিঃসন্দেহে এরা সবাই فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ এর অনুমতি ও সুবিধা লাভের উপযোগী। আর এমনি হলে হয়তো আমাদেরও কোন বক্তব্য থাকত না। কিন্তু এ এক অনস্বীকার্য সত্য যে, বাস্তব অবস্থা এর শতকরা একশ ভাগেরও অনুরূপ নয়। যদি কেউ আত্মানুশীলনের সাহস নিয়ে প্রকৃত অবস্থা পর্যালোচনা করে, তবে নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই সে সত্য মানতে বাধ্য হবে যে, উক্ত আদালতে গমন কিংবা তাতে আসন গ্রহণ কালে নিরুপায়জনিত শর্তাবলীর প্রয়োজন পর্যন্ত সাধারণ কারো মনে জাগে না। যে সব মুসলমান দারিদ্র্য ও অন্ন কষ্টের পীড়নে সত্যই অক্ষম হয়ে পড়ে এবং যার পক্ষে জীবন ধারণের জন্যে এই নাপাক রেজেক গ্রহণ ছাড়া আর কোন উপায়ই নেই, আদালতের আসন অবধি পৌঁছার সৌভাগ্য তার কবে হয়েছিল। সেখানে তো কেবল তারাই পৌঁছাতে পারে, যারা আগে থেকেই স্বচ্ছল ও সঙ্গতিসম্পন্ন কিংবা অন্তত مَخْمَصَةٌ বলার মত চরম দারিদ্র্যে যারা জর্জরিত নয়। কাজেই একথা স্বীকার করতেই হবে যে, এ সবকিছু নিতান্ত শান্ত মনে এবং আগ্রহ ও আন্তরিকতার সঙ্গেই করা হচ্ছে। এই আসন অবধি পৌঁছার উদ্দেশ্য নিয়েই সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষিত করে তোলা হচ্ছে। যারা একবার পৌঁছে গেছেন, তারা পদোন্নতির চেষ্টায় হামেশা ব্যস্ত রয়েছেন। অথচ কার্যত নিরুপায় অবস্থার কারণে কেউ এই উপার্জন-উপায় গ্রহণ করলে তার ঈমানের স্বাভাবিক

তাগিদেই এ ব্যাপারে সে আদৌ নিশ্চিন্ত না, বরং এটি বর্জন করে কোন বৈধ উপার্জন উপায় তালাশ করার জন্যে সে অস্থির থাকত। কিন্তু এমন লোক তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। কাজেই এই স্বেচ্ছাকৃত খোদাদ্রোহিতাকে কিভাবে অক্ষমতা বলা যায়, আমরা বুঝতে পারি না। অনুরূপভাবে আমরা যদি গায়রুল্লাহর প্রভুত্বে অবিশ্বাসী হতাম এবং আমাদের ঈমানী চেতনা তাকে ঘৃণা কর, তহলে আমরা এভাবে ঘরের আরাম আয়েশ মাদ্রাসার চৌহদ্দী এবং হুজরার কোণে স্বস্তির সঙ্গে মশগুল থাকতাম না। আমরা আরকিছু করতে না পারলেও অন্তত এই 'মহাপাপের' সঙ্গে কোন প্রকার সহায়তা করতাম না আর তার সম্পর্কে কোন প্রাত্যয়িক বা বাচনিক আপোস-রফার সমর্থক হতাম না; বরং আমরা সবাই জবানের সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করে এর প্রকাশ্যে বিরোধিতা করতাম। আর এটাও সম্ভব না হলে তাকে অবশ্যই অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতাম। কেননা রসূলে খোদা (স,)-এর বক্তব্য অনুসারে এ হচ্ছে ঈমানের শেষ সীমা। তিনি দুষ্কৃতি ও দুষ্কৃতিপরায়ণ লোকদের সম্পর্কে ঈমানদার লোকদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করে বলেনঃ

مَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ لَيْسَ وَرَاءَ ذَالِكَ مِنَ الْاِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ

(مسلم جلد اول)

> যে ব্যক্তি আপন হাত দ্বারা তাদের সঙ্গে জিহাদ করল, সে মুমিন; আপন জবানের সাহায্যে জিহাদ করল, সেও মুমিন; যে তার হৃদয়ের সাহায্যে জিহাদ করলো, সেও মুমিন; এরপর শর্ষে পরিমাণও ঈমান নেই।

কিন্তু এখানে অবস্থা হচ্ছে এই যে, এত বড় দুষ্কৃতির প্রতি কোন মামুলি ঘৃণা ও অসন্তোষ প্রকাশ তো দূরের কথা, তাকে খারাপ মনে করার অনুভূতি পর্যন্ত লোপ পেয়ে গিয়েছে। এমন কি তার প্রতিষ্ঠার জন্যে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতেও আজ আর কোন অসুবিধা নেই। এই কারণেই তার স্থায়িত্বের জন্যে আজ সর্ববিধ দৈহিক ও মানসিক শক্তি নিয়োজিত করা হচ্ছে। একটা ঘৃণ্য বস্তুর সঙ্গে কি এ ধরনের আচরণ করা উচিত? এ ধরনের প্রকাশ্য দুষ্কৃতির ব্যাপারেও যদি ঈমানের ন্যূনতম দাবির (উপরোল্লিখিত হাদীসে যেরূপ বর্ণিত হয়েছে) প্রকাশ না ঘটে, তবে এমনি ঈমানকে কিরূপে জিন্দা ঈমান বলা যেতে পারে? উপায়হীনতারও তো কোন সীমা থাকা উচিত! তাকে যদি আমাদের সাধারণ আচরণের মতই প্রশস্ত করে দেয়া হয়, তবে দুনিয়ার কোন দুষ্কৃতি এবং কুরআনের কোন আইন লংঘনই তার সীমা বহির্ভূত থাকতে পারে না. একথা

সুনিশ্চিত। এমনি অবস্থায় একজন মুসলমান তার নফসের আনুগত্য ততখানি স্বাধীনভাবে করতে থাকবে, যতখানি স্বাধীনতার সঙ্গে একজন অবিশ্বাসী কাফের করে থাকে। এর ফলে নৈতিক চরিত্র ও খোদাপরস্তির যেসব নিয়ম নীতি ও বিধি-বিধান শিক্ষা দেবার জন্যে কুরআন অবতরণ করা এবং তার ধারককে প্রেরণ করা হয়েছিল, তার সবকিছুই অর্থহীন হয়ে পড়বে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, অক্ষমতার এই ব্যাখ্যা হচ্ছে সম্পূর্ণ মনগড়া। এর সাথে আল্লাহ ও রসূল একেবারেই অপরিচিত।

এই পতনদশা অবধি আমরা কিভাবে পৌঁছেছি, তাও অনুধাবন করা দরকার। এর সূচনাটা হয় এই ভাবেঃ কোন দুষ্কৃতি যখন সমাজে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে, তখন সমাজের সামগ্রিক বিবেক অবশ্যই তার প্রতি ঘৃণা ও অসন্তোষ প্রকাশ করে থাকে। সেই ঘৃণা ও অন্তোষের ভাবধারা সাধারণ ও শক্তিশালী হলে সঙ্গে সঙ্গেই সে দুষ্কৃতি নিস্তেজ হয়ে যায়। নচেত তা শিকড় গাঁড়তে থাকে এবং ধীরে ধীরে পত্র-পল্লবিত হতে শুরু করে। এমতাবস্থায় সমাজের কল্যাণকামী ব্যক্তিরাও যদি আপন সাধ্যানুযায়ী তার শিকড় উপড়ে ফেলার জন্যে চেষ্টা চালাতে না থাকে এবং তার বিরুদ্ধে শুধু রেওয়াজী মত প্রকাশ করাটাকে যথেষ্ট বলে মনে করে, তাহলে ক্রমে ক্রমে তাদের মধ্যে থেকেও ঐ ঘৃণার অনুভূতি লোপ পেয়ে যায়। অতপর খুব অল্পদিনের মধ্যেই সে দুষ্কৃতি আর দুষ্কৃতি থাকে না, ব্যক্তি ও শ্রেণী-নির্বিশেষে কম-বেশী সকলকে সে রঙ্গে রঙ্গিন হতে দেখা যায়। তখন সমাজের পক্ষে তা একটি প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। তার ওপর সুকৃতি, আশীর্বাদ কিংবা অন্তত বৈধতার একটা মার্কা লাগিয়ে দেয়া হয়। এমন কি, তার জন্যে নিজের মৌলিক ন্যায়শাস্ত্রে পর্যন্ত রদবদল করতে কুণ্ঠাবোধ থাকে না। এ একটি সর্বস্বীকৃত মনস্তাত্ত্বিক সত্য; এই পথেই সমাজে হামেশা দুষ্কৃতি বিস্তার লাভ করে থাকে। এই কারণেই মুসলমানদেরকে যেখানে এই মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছেঃ

وَاللّٰهِ لَتَأمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ

খোদার কসম! তোমরা অবশ্যই সুকৃতির নির্দেশ দিতে থাকবে এবং দুষ্কৃতি অবশ্যই রোধ করতে থাকবে।

সেখানে এই সতর্ক বাণীও উচ্চারণ করা হয়েছেঃ

اَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللّٰهُ بِقُلُوْبِ بَعْضِكُمْ عَلٰى بَعْضٍ (ابوداؤد)

নচেত খোদা তোমাদের হৃদয়কে দুষ্ক্রিয়াসক্ত বানিয়ে দেবেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মুসলমানরা এই নির্দেশ ও সতর্কবাণীকে নিজেদের মন-মগজে সযত্নে রক্ষা করেনি। তার ফলে তারা দুষ্কৃতিমগ্ন হবার উল্লিখিত

মনস্তাত্ত্বিক নীতিকে পুরোপুরি আয়ত্তাধীন করে নিয়েছে। তাদের মধ্যে যখন প্রথমে চিন্তার বিভ্রান্তি ও কর্মের বিকৃতি প্রবিষ্ট হবার চেষ্টা করে, তখন তারা ক্রমাগত প্রতিরোধের চেষ্টা করেনি, ফলে ধীরে ধীরে তার দ্বারা আসক্ত হতে থাকে। অতঃপর এমনি অবস্থায় কয়েক শতক অতিক্রান্ত হবার পর তারা বর্তমান অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে। অর্থাৎ মুসলমানদের মন-মগজ, দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তা-পদ্ধতি সবকিছুই পরিবর্তিত হয়ে এক ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। যে জিনিসের প্রতি ঘৃণা হওয়া উচিত ছিল, তার প্রতি আসক্তি বোধ করা হচ্ছে। যে বস্তুকে এড়িয়ে চলা উচিত ছিল, তার সন্ধানে ছোটাছুটি করা হচ্ছে। যে জিনিসকে পদতলে নিষ্পিষ্ট করা উচিত ছিল, তাকে দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরা হচ্ছে। তাদের পয়গম্বর তাদেরকে ঈমানের শেষ সীমা নির্দেশ করে বলেছিলেন যে, যে কোন দুষ্কৃতির প্রতি অন্তর দিয়ে ঘৃণা পোষণ করতে হবে, যে ঘৃণা দুষ্কৃতিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে হামেশা উদ্বেলিত হতে থাকবে–কারণ এর নিচে ঈমানের কোন স্তর নেই। অন্য কথায় নবী করীম (সঃ) কোন দুষ্কৃতিকে পছন্দ করাকেই শুধু ঈমানের পরিপন্থী আখ্যা দেননি, বরং তাকে দেখে নিজের ভিতর ঘৃণার উদ্রেক না হওয়াকেও ঈমানবিহীন মৃত্যুর নিশ্চিত লক্ষণ বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু তাঁরই 'অনুগামী' নামধেয় ব্যক্তিরা যেন কোনরূপ ঘৃণা বা সঙ্কোচ বোধ ছাড়াই মানবীয় প্রভুত্বকে সালাম ঠোকার, তাদের আনুগত্যের জোয়াল নিজেদের কাঁধে চাপিয়ে রাখার, যারা নিজস্ব 'বিচারালয়ে' খোদার 'প্রবেশ'কে বন্ধ করে রেখেছে, তাদের দ্বারা নিজেদের বিষয়াদির মীমাংসা করবার ব্যাপারে প্রায় জিদ ধরে বসেছে। শুধু তাই নয়, তারা নিজেরাও যেন খোদাদ্রোহী ব্যক্তিদের রচিত আইন অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করার মওকা পেলে নিজেদেরও প্রভুত্বের ধ্বজা উড্ডীন করতে, নিজেদের স্বাধীন মর্জি অনুসারে আইন প্রণয়ণ করতে এবং যে কোন জিনিসকে ইচ্ছামত জায়েয কিংবা নাজায়েয করে নিতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু তা সত্ত্বেও না তাদের দ্বীন-ঈমান নষ্ট হবে, না তাদের তওহীদী বিশ্বাস প্রভাবিত হবে, না তাদের বন্দেগীর ওপর কোন দোষারোপ হবে, না তাদের নবী অনুসৃতির দাবি ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হবে, না তাদের প্রতি খোদার কিতাব বর্জনের অভিযোগ চাপানো হবে, না তারা আল্লাহর সঙ্গে প্রতিশ্রুতিভঙ্গের জন্য অপরাধী সাব্যস্ত হবে। এর কারণ? –কারণ এই যে, তারা 'নিরুপায়' অবস্থার মধ্যে রয়েছে।

একে দৃষ্টিবিভ্রম বা আত্মপ্রবঞ্চনা যা খুশী বলা যেতে পারে। তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই একটি মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক রকমের প্রতারণা। এর ভয়াবহতা ও ধ্বংসকারিতা ঠিক তখনি পুরোপুরি আন্দাজ করা যেতে পারে, যখন আমাদের ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক জীবনের ওপর প্রতিফলিত এর সুদূরপ্রসারী ফলাফল কিছুটা বিস্তৃতভাবে পর্যালোচনা করে দেখা হবেঃ (১) গাইরুল্লাহ্‌র

প্রভুত্বের অধীন একজন অনুগত প্রজা হিসেবে বাস করবার মানে কেবল এই নয় যে, আমরা ইসলামের একটি বুনিয়াদী শিক্ষারই বিরুদ্ধাচারণ করছি, বরং এর তাৎপর্য এই যে, এবার আমাদের গোটা জীবন-সচেতন ভাবে হোক আর অচেতন ভাবেই–ইসলামের অভীষ্ট ছাঁচের সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের ছাঁচে ঢালাই হতে থাকবে। এবার আমাদের সমাজের ভিত্তিস্থাপন, আমাদের তমুদ্দুনের উৎকর্ষ সাধন, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রশিক্ষণ এবং অর্থনৈতিক বিষয়াদির সংগঠন এমন ভিত্তির ওপর হবে, যা আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও নিজেদের সামগ্রিক মতবাদ ও নিজস্ব জীবন দর্শন থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে থাকবে। (২) অখোদার বিধি-বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করা বা করানোর অর্থ শুধু এই নয় যে, ব্যস্ একটি গোনাহই শুধু অনুষ্ঠিত হচ্ছে, বরং তার অর্থ হচ্ছে এই যে, আমাদের জিন্দেগীর অসংখ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত বহুতর ইসলামী বিধানকে গোপন রাখা হয়েছে। তার প্রতি শ্রদ্ধাকে অন্তর থেকে বিলুপ্ত হবার সুযোগ দেয়া হয়েছে। অন্য কথায় এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, আমরা আমাদের দ্বীন ও কুরআনকে জড় করে মসজিদ ও হুজরার চার দেয়ালের মধ্যে বন্ধ করে দিয়েছি এবং তার কতিপয় নির্দিষ্ট ধর্মীয় প্রথা ও ইবাদাত অনুষ্ঠান সম্পর্কিত অংশকেই যথেষ্ট মনে করে নিয়েছি।

এটা শুধু আন্দাজ-অনুমানের কথা নয়, বরং এর প্রতিটি কথাই বাস্তব ঘটনা ও নির্ভেজাল সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যারা নিজেদের দীনী অনুভূতিকে এখনো নিস্তেজ করে ফেলেনি, এমন প্রতিটি ব্যক্তিই এসব ঘটনা ও সত্যকে প্রত্যক্ষ করতে পারে। জাতির অগ্রনায়কগণ কুরআনের একটি বিরাট অংশকে রাষ্ট্রশক্তি অর্জিত না হবার[1] বাহানা করে এবং শাসনকর্তাকে তার আসল জিম্মাদার ঘোষণা করে সর্বশেষে 'অক্ষমতার' শরণাপন্ন হয়ে ধোকাবাজীর যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন, তার ফলে কুরআনের বহুতর বিধানের সঙ্গে তাদের বাস্তব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছে এবং দ্বীনের শুধু একটি সঙ্কীর্ণ অংশ পালন করারই তারা উপযোগী রয়ে গিয়েছেন। প্রথম দিকে দ্বীনের ঐ মৌলিক নীতি এবং তার গুরুত্বপুর্ণ দাবিগুলো থেকে এমনকি জবরদস্তিমূলক বিচ্ছিন্নতায় ঈমানী 'সত্ত্বা' অবশ্যই অস্থির ও অশান্ত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু কালাতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে এই অশান্তি ও অস্থিরতা শান্তি ও স্বস্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। আজকে অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, লোকেরা যে কয়টি ইবাদাত অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রথা সাধারণত পালন করে থাকে, তার মধ্যেই দ্বীন ইসলাম সীমিত হয়ে পড়েছে। এর বাইরে আর যা কিছু রয়েছে, তার সঙ্গে দ্বীনের সম্পর্ক–অবচেতন-ভাবেই–নামমাত্র মনে করে নেয়া হয়েছে। বস্তুত লোকদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি যদি

১. এটি উপমহাদেশে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পূর্বেকার কথা। –অনুবাদক

এমনি বিকৃতরূপ না নিত, তাহলে দ্বীনের ঐ অংশগুলো পালন না করা হলেও সেই সঙ্গে তার আদর্শিক গুরুত্বও হ্রাস পাওয়া কি করে সম্ভব ছিল? কিভাবে তাদের হৃদয় থেকে ঐ অংশগুলোর জন্যে অস্থিরতা আকাঙ্ক্ষা ও আক্ষেপের রেশ পর্যন্ত মুছে যাওয়া সম্ভবপর ছিল? আমরা লক্ষ্য করছি যে, কোন মসজিদের একখানা ইটও যদি কেউ খুঁড়ে ফেলে দেয়, তবে এই পতনশীল অবস্থায়ও মুসলমানরা রক্তের প্লাবন বহাতে প্রস্তুত হয়ে যায়। অথচ আল্লাহ্‌র অসংখ্য বিধানের দুর্দশা ও বেইজ্জতির জন্য তাদেরকে কয়েক ফোঁটা অশ্রুপাত করতেও পাওয়া যায় না। এই পার্থক্যের কারণ এছাড়া আর কিছুই নয় যে, প্রথমোক্তটিকে মনে করা হয় দ্বীনের কাজ আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে দুনিয়াদারী। কিন্তু যে কুরআনে ঐ নির্দিষ্ট ইবাদাত-অনুষ্ঠানগুলোর উল্লেখ রয়েছে, এই বিধানগুলোও যেহেতু সেই কুরআনেই বর্তমান রয়েছে এবং কুরআন (ও সুন্নাহ)-এর প্রতিটি বিধানই পালন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এই কারণেই এ বিধানগুলো দ্বীনের সঙ্গে সম্পর্কহীন–একথা মুখ ফুটে বলতে কারোরই সাহস হয় না। তবে এই বিধানগুলো কার্যকরী করার এবং এ ব্যাপারে প্রদত্ত নির্দেশ পালন করবার প্রশ্ন উঠলেই অবচেতনভাবে দ্বীনের সেই সংকীর্ণ ধারণা এবং সুবিধাবাদের গোপন ভাবধারা কখনো এগুলোর আসল জিম্মাদার হতেই অস্বীকৃতি জানিয়ে দেয়। আর কখনো উপায়হীনতার ঢাল এনে হাতে তুলে দেয়।

ফলকথা, জাতির প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে এই যে, ঈমানী চেতনার হ্রাসপ্রাপ্তি, কর্তব্যবোধের অপ্রাচুর্য এবং সুবিধাবাদী নীতির প্রাবল্যের দরুন কুফরী রাষ্ট্র-শক্তি ও বাতিল মতাদর্শের কাছে আত্মসমর্পণ করতে তাকে প্রস্তুত করেছে। অতঃপর এই প্রস্তুতি কুরআনের একটি বিরাট অংশকে আমল ও আনুগত্যের চৌহদ্দী থেকে বহিষ্কার করে দিতে বাধ্য করেছে। পরবর্তীকালে এই বাধ্যতা খোদাপরস্তির খোলস বজায় রাখার এবং নিজের দৃষ্টি থেকে নিজের অপরাধী চেহারাকে লুকিয়ে রাখার জন্যে দ্বীন সম্পর্কিত ধারণাকেই সীমিত ও নিষ্প্রাণ করে ছেড়েছে। এমনি সীমিত করেছে যে, যে বিধানগুলো কার্যত পালন করা হচ্ছে না, দ্বীন ইসলামে সেগুলোর কোন আদর্শিক গুরুত্বও বাকী রাখা হয়নি। আর এমনি নিষ্প্রাণ করেছে যে, জীবনের বৃহত্তম সমস্যাদির বেলায়ও সে আমাদের যথেচ্ছাচারের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করতে পারেনি। তাছাড়া দ্বীনের এই সীমিত ও নিষ্প্রাণ ধারণা জাতির ঐ বিরাট নাফরমানী ও অকর্মণ্যতার অনুভূতি পর্যন্ত লোপ করে দিয়েছে। তবু হাজারো প্রচেষ্টার পর ঐ মতবাদগুলোর ভিতর যে সব ছিদ্র পরিলক্ষিত হচ্ছিল, শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রশক্তি থেকে বঞ্চনা ও অক্ষমতার বাহানা এসে তা সবই ঢেকে ফেলল। ফলে আজ এই সমস্ত জিনিসই একে অপর থেকে শক্তি সঞ্চয় করছে এবং সবাই মিলে প্রবঞ্চনা ও আত্মতুষ্টির এমন জাল তৈরি করেছে, যেখানে

চিন্তা-ভাবনার শক্তি বিকল হয়ে রয়েছে।। এই পরিস্থিতির ফলে মুসলমানদের জন্যে সত্য দৃষ্টির পথ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং তাদের ভিতর লক্ষ্য সন্ধানের কামনাও বিলুপ্ত হতে চলেছে। স্পষ্টত এটি সবচাইতে বড় দুর্ভাগ্য, যে কোন মুসলমান এতে ফেঁসে যেতে পারে। কোন কোন ব্যক্তির মধ্যে যদি ভ্রান্তিবোধ সতেজ থাকে, তবে একদিন না একদিন সে নিজেকে সংশোধন করে নেবে–এই আশা অবশ্যই পোষণ করা যেতে পারে। কিন্তু এই অনুভূতি যদি নিস্তেজ হয়ে যায় এবং তার দৃষ্টিতে ভ্রান্তি ভ্রান্তিই না থাকে, তাহলে তার সংশোধনকামী হবার মত কোন প্রত্যাশাই করা যায় না। এই কারণেই এ জাতি যদি তার সার্বিক ধ্বংস এবং দ্বীন ও দুনিয়ার সর্বত্র জিল্লতি ভোগের সিদ্ধান্ত না করে থাকে, তাহলে অনতিবিলম্বে নিজের নির্দোষিতার ভ্রান্ত ধারণা পরিহার করে দ্বীনের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যে অন্যায় সে করে আসছে, তা সোজা সুজি স্বীকার করে নিয়ে তার প্রতিকারের চেষ্টা করাই উচিত।

মুসলমানদের অদূরদর্শিতা

আল্লাহ্ তায়ালার হেদায়েত প্রদানের ব্যাপারটিও এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। একই জিনিসের দ্বারা কারো সামনে হেদায়েতের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং সে সত্যের সাক্ষাত লাভে সমর্থ হয়। আবার সেই জিনিসটিই অন্যান্যদের বেলায় গোমরাহীর কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং তার ফলে তারা সুপথ থেকে আরো দূরে সরে যায়। এই বিষয়টি আল্লাহ তায়ালার এক ন্যায়ানুগ আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহলে এই যে, যে ব্যক্তি প্রকৃতই সত্য সন্ধানী, তার সামনে সুপথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সত্য বিমুখ, তার সামনে সত্যের প্রভা কখনো দ্বীপ্তিমান হয় না। যেমন করে সূর্যের কিরণ দৃষ্টিমান লোকদের জন্যে গোটা দুনিয়াকে প্রদীপ্ত করে তোলে; কিন্তু পেঁচা ও চামচিকা জন্মগত দৃষ্টিহীনতার কারণে তার থেকে কোন ফায়দাই লাভ করতে পারে না। তাই কুরআন নিজের পরিচয় দান প্রসঙ্গে যেখানে বলেছে যে, সে লোকের জন্যে পথের মশাল স্বরূপ। সেখানে সে এও বলেছে যে, বহু লোকদের জন্যে সে গোমরাহীরও উৎস। يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَّيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا - بقرة তার এই বক্তব্যের ভিতর হেদায়েত প্রদানের উক্ত নীতির প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, কুরআন তাকেই সোজাসুজি সুপথ দেখায়, যে দেখতে ইচ্ছুক আর তখনি দেখায় যখন তার দেখবার সত্যিকার আকাঙ্ক্ষা থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের চোখ বন্ধ কর রাখে, তাকে কখনো জবরদস্তি এ পথে ঠেলে দেয় না; বরং তার বিপরীত এই নিস্পৃহতার প্রতিক্রিয়ায় তার থেকে সে আরো দূরে সরে যায়। কিন্তু তার এই আইন শুধু কাফেরদের বেলায়ই প্রযোজ্য এবং মুমিন তার প্রতি

ঈমান আনার কারণে এর প্রয়োগ সীমা থেকে দূরে অবস্থিত একথা যেন কেউ মনে করে না বসেন। প্রকৃতপক্ষে কাফের ও মুমিন সবার জন্যেই এটি সাধারণ আইন। একজন মুমিন কুরআনের প্রতি ঈমান রাখা সত্ত্বেও জীবনের বিভিন্ন ব্যাপারে ঠিক তখনি পথ-নির্দেশ লাভ করতে পারে, যখন পূর্ণ আন্তরিকতা ও আগ্রহের সাথে সে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। নচেত জীবনের যে ব্যাপারে যখনি সে তার থেকে পথনির্দেশ লাভের আকাঙ্ক্ষা না করবে এবং বিনাশর্তে তার আনুগত্য করার এবং এই উদ্দেশ্যে তার দৃষ্টিভঙ্গি জানবার চেষ্টা না করবে, তখনি সে নিশ্চিতরূপে তাকে গোমরাহীর অন্ধকারে নিক্ষেপ করবে এবং সে তার প্রতি বিশ্বাসী কি অবিশ্বাসী–এ ব্যাপারে এতটুকু ভ্রুক্ষেপও করবে না। এই কারণেই মুমিনকে এই মর্মে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, ঈমান পোষণ ও সুপথ প্রাপ্তির পরও নিজের অন্তদৃষ্টিকে ভ্রান্তি ও গোমরাহী থেকে নিরাপদ মনে করবে না, বরং সর্বদা আল্লাহ্ তায়ালার কাছে এই বলে দোয়া করতে থাকবেঃ

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا (ال عمران)

হে খোদা! আমার সামনে থেকে যেন হেদায়েতের আলোকবর্তিকা নিভে না যায়।

কুরআনের আলোচ্য বিধানগুলোর ব্যাপারে প্রকৃতপক্ষে হেদায়েত সংক্রান্ত এই বিধানই ক্রিয়াশীল রয়েছে। এইগুলো সম্পর্কে যেহেতু সত্য বিষয় জানবার প্রকৃত আগ্রহী বাকী ছিল না, এজন্যেই এর পরিমাণ দাঁড়ায় এই যে, যেখান থেকে লক্ষ্যপথ নির্দেশ করা হচ্ছিল, ঠিক সেখান থেকেই ভ্রষ্টতার উপকরণ সংগ্রহ করে নেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহয় উল্লিখিত বিধানগুলোর বাচনভঙ্গিও লক্ষণীয়। যেমন, হে মুমিনগণ! এক খোদার কর্তৃত্বের সামনে অবনত হও এবং সারা দুনিয়াকে এই পথেই আহবান জানাতে থাক। হে ঈমানদারগণ! কুফ্রীর ধ্বজাবাহীদের সঙ্গে লড়াই করে ফেত্না ও ফাসাদ নির্মূল করে দাও! হে ঈমান পোষণকারীগণ! সুকৃতির নির্দেশ দাও এবং দুষ্কৃতি থেকে বিরত রাখ। হে মুসলমানগণ! চোরের হাত কেটে দাও। হে ঈমানদারগণ! ব্যভিচারীকে চাবুক মার ইত্যাদি। এই বাচনভঙ্গির ভিত্তি এমন এক বিশাল সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, তার সঠিক ধারণাই এই দুনিয়ার জীবনে মুমিনের মর্যাদা নিরূপণের পক্ষে যথেষ্ঠ। আমরা সত্যানুসন্ধানের যথার্থ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কুরআনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই দেখতে পেতাম যে, এই বাচনভঙ্গি এ কথারই সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে এই জাতির মর্যাদা একটি ক্ষমতাসীন দলের (Ruling Party) চাইতে মোটেই কম নয়। তিনি তার মর্যাদাকে বৈরাগ্যবাদের কুঠরী বা পরাধীনতার পদতলে নয়, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের আসনের ওপর নির্দেশ করেছেন।

তার নিম্নে তার মর্যাদাকে কল্পনাই করতে পারেন না, তার চাইতে নিচুস্তরে তাকে কখনো তিনি দেখতে চান না। চিন্তা করবার বিষয়–এই বাচনভঙ্গির পেছনে জাতীয় জীবনের কতবড় উন্নত ধারণা বর্তমান রয়েছে। কুরআনের এই ইঙ্গিতটি মুসলিম হৃদয়কে কিরূপ পবিত্রতা ও উচ্চাভিপ্রায় দ্বারা পরিপূর্ণতা দানকারী বাণীর সন্ধান দিচ্ছে! কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, এই জীবন-উৎসটিকেও আমরা নিজেদের জন্যে ধ্বংসের সমুদ্র বানিয়ে নিয়েছি। আমাদের উচিত ছিলঃ আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের এই বাচনভঙ্গির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি করে নিজেদের হারানো মর্যাদা এবং বিস্মৃত কর্তব্য স্মরণ করা, নিজেদের দোষ-ত্রুটি ও গাফলতির জন্যে অনুতপ্ত হয়ে তার প্রতিকারের জন্যে সচেষ্ট হওয়া এবং সর্বোপরি আমাদের খোদা যে মর্যাদার আসনে আমাদেরকে দেখতে ইচ্ছুক এবং যেখানে উপণীত না হলে তাঁর অসংখ্যা বিধিবিধানের প্রতিপালন ও তাঁর পূর্ণাঙ্গ সন্তুষ্টি বিধান করা অসম্ভব, সেই মর্যাদার পুনরুদ্ধারের জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা-সাধনায় আত্মনিয়োগ করা। কিন্তু, আফসোস, এর কিছুই আমরা করিনি; বরং শাসক ও শাসনকর্তাকে এই বিধানগুলোর জিম্মাদার বলে অভিহিত করে নিজেদের দায়িত্বের বোঝা আমরা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি।

ঠিক এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই নিরুপায় অবস্থা সংক্রান্ত আয়াতটির প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ এর শর্তাবলীর মধ্যে সত্যের সম্ভ্রম রক্ষার যে তাৎপর্য নিহিত ছিল এবং চরম প্রতিকূল অবস্থায়ও ঈমানের মহত্ত্ব বজায় রাখার যে দাবি তাতে বর্তমান ছিল, তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয়নি। অথবা নিক্ষিপ্ত হলেও তা' প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে এবং فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ এর ওপর তাকে এমনিভাবে স্থির নিবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে যে, দ্বীনের আনুগত্যের ব্যাপারে না কুরবানীর প্রশ্ন বাকী রইল আর না নফসের ওপর তার কোন প্রভাব থাকল। নিঃসন্দেহে এ আয়াতে নিরুপায় অবস্থায় হারাম জিনিস ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু এটা আয়াতের একটি দিক মাত্র–এর আরো একটি দিক রয়েছে তার প্রতি লক্ষ্য রাখাও আবশ্যক। আয়াতের এই দ্বিতীয় দিকটির প্রতিনিধিত্ব করছে غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ এই শব্দ ক'টি। এই শব্দ ক'টিতে হারাম জিনিস ব্যবহারের প্রতি যে শর্তাবলী আরোপ করা হয়েছে, তার অর্থ শুধু এই নয় যে, মুসলমান কোন হারাম জিনিস ব্যবহার করতে বাধ্য হলে তা ব্যবহারকালে উক্ত জিনিসটির প্রতি কোন আকর্ষণ বোধ করবে না এবং নিতান্ত আবশ্যকীয় পরিমাণের বেশী ব্যবহার করবে না; বরং তার অন্যতম অর্থ হচ্ছে এই যে, উক্ত পরিস্থিতি থেকে নিষ্ক্রমণ এবং এই হারাম ব্যবহার থেকে মুক্তি লাভের জন্যে তাকে প্রগাঢ় চিন্তা ও অবিশ্রান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। যেমন কোন ব্যক্তির পা কোন গর্তে বা উত্তপ্ত পাথরের ওপর পড়লে তা অতি দ্রুত সে

তুলে নিতে চায়, এ প্রচেষ্টাও হবে ঠিক তেমনি। এই অবস্থা থেকে যতক্ষণ না মুক্তি পাওয়া যাবে, ততক্ষণ মনে করতে হবে যে, মুর্দাদের গলিত মাংস যেন দাঁত দিয়ে চিবানো হচ্ছে কিংবা শূকর-মাংসের টুকরা গলাধঃকরণ করা হচ্ছে অথবা পুঁতিগন্ধময় নোংরা বস্তুতে শরীর ও পোশাক লেপটে গিয়েছে।

বলা বাহুল্য, আয়াতের এ দিকটিও যদি আমাদের সামনে থাকত এবং তার নির্দেশিত ঈমানী সম্ভ্রমের মূল্য আমরা উপলব্ধি করতাম তো আজকে আমাদের দুনিয়ার চেহারা এমনি হত না। আর পরাজিত মানসিকতা, পশ্চাৎমুখী দৃষ্টিভঙ্গি ও ঈমান-ধ্বংসী চিন্তা পদ্ধতি আমাদের শক্তি সামর্থ্যকে এমনি ব্যাধিগ্রস্ত করে দিত না। কোটি কোটি মানুষের এতবড় একটি দল উপায়হীনতার নামে কয়েক শতক ধরে বাতিলের সঙ্গে এরূপ লজ্জাকর আপোস রফার ভূমিকা প্রদর্শন করত না যে, কুরআনের প্রতি আনুগত্যের দাবি রাখা সত্ত্বেও তার গোটা কাফেলা আজ জীবনের অনৈসলামী পথে পূর্ণ আগ্রহ-উদ্দীপনার সঙ্গে এগিয়ে চলছে; কিন্তু তার বিবেক না তাকে দংশন করছে আর না তার ঈমানী সম্ভ্রম কখনো তাকে বাধা দান করছে। বরং এর বিপরীত অবস্থা দাঁড়াত এই যে, বাতিল চিন্তাধারা, ভ্রান্ত মতাদর্শ ও অনৈসলামী জীবন-পদ্ধতির বিরুদ্ধে আমরা সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তুলতাম। আমাদের ঈমানী চেতনা আমাদের জীবনকে অস্থির ও অশান্ত করে দিত। আমাদের ইসলামী অনুভূতি এই নোংরা ময়লাকে যে কোন উপায়ে ধুয়ে পরিষ্কার করতে বাধ্য করত। কিন্তু আফসোসের বিষয় যে, আমাদের নিরুপায়জনিত সুবিধার কথাটা তো স্মরণ আছে, কিন্তু غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ এর শর্তাবলী এবং সে শর্তগুলোর দাবিসমূহ একেবারেই বিস্তৃতির তলে ডুবে গিয়েছে।

আশা করা যায়, এই আলোচনার পর এ ব্যাপারে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকবে না যে, দ্বীন-ইসলামের বর্তমান আংশিক আনুগত্যের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা এবং তাকে নিজের ঈমানী দায়িত্ব পালনের পক্ষে যথেষ্ট মনে করা কিছুতেই ঠিক নয়। এ একটি দুঃখজনক ভ্রান্ত ধারণা, বরং একে মারাত্মক নির্বুদ্ধিতা বলাই সমীচীন। এরূপ ধারণা আসলে নিষ্প্রাণ ঈমানেরই প্রত্যক্ষ প্রমাণ, অথবা দ্বীন সম্পর্কিত বিচক্ষণতা থেকে বঞ্চিত হবার লক্ষণ। এই আত্মপ্রবঞ্চনা এক মারাত্মক ধরনের কুহক। একে সর্বশক্তি দ্বারা ছিন্ন না করা হলে জাতীয় হৃদয়ের যে দুর্বল কম্পনটুকু এখনো মাঝে মাঝে অনুভূত হয়, অদূর ভবিষ্যতে তা-ও বন্ধ হয়ে যাবে।

(২) প্রতিকূল পরিস্থিতির বাহানা

এবার দ্বিতীয় দলটির চিন্তাধারা নেয়া যাক। এ দলটি এই লক্ষ্য অর্জন এবং জীবনের এই একমাত্র কর্তব্য সম্পাদনকে এ জন্যেই এড়িয়ে যাচ্ছে এবং

অন্যদেরকেও এড়িয়ে চলবার পরামর্শ দিচ্ছে যে, বর্তমান পরিস্থিতি এ কাজের জন্যে মোটেই অনুকূল নয়; এমতাবস্থায় এর সাফল্যেরও কোন সম্ভাবনা নেই। পরন্তু তারা এই পরিস্থিতির দাবি হিসেবে বলছে যে, আপাতত একাজের নাম পর্যন্ত মুখে আনা উচিত নয়। তার পরিবর্তে আমাদের শক্তি সামর্থ্যকে এমন কোন ফ্রন্টে কেন্দ্রীভূত করা উচিত, যেখান থেকে পরিস্থিতির গতিধারার ওপর আমরা প্রভাবশীল হতে পারব এবং ফলে ভবিষ্যৎ পরিবেশ এ কাজের জন্য এতটা অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকবে না। এমন কি, এক সময়ে আমরা আমাদের প্রকৃত মনজিলে-মকসুদের দিকে প্রকাশ্যভাবে অভিযান করতে সমর্থ হব।

কতিপয় বিচার্য প্রশ্ন

এ-মতবাদটি পর্যালোচনা করলে স্বভাবতই নিম্নোক্ত প্রশ্ন ক'টি উত্থাপিত হয়ঃ

(১) এ-কর্তব্যটি সম্পাদনের জন্যে প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রাম করার ব্যাপারে পরিস্থিতির প্রতিকূলতা এবং সে-সংগ্রামের কামিয়াবীর সম্ভাবনা ও অসম্ভাবনার বিতর্ক কি উঠতে পারে?

(২) আজকের পরিস্থিতিতে দ্বীন-ইসলামের প্রতিষ্ঠা কি বাস্তবিকই অসম্ভব?

(৩) পরিস্থিতির প্রতিকূলতা হেতু এ-লক্ষ্যস্থলের দিকে প্যাচালো পথে অগ্রসর হবার কোন বাস্তব দৃষ্টান্ত, কোন মানবীয় অভিজ্ঞতা অথবা কোন আদর্শিক ভিত্তি কি বর্তমান আছে?

এ-প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব না-পাওয়া পর্যন্ত এ-মতবাদটির সত্যাসত্যও নির্ণয় করা যেতে পারে না। এ কারণেই আল্লাহ্‌র কিতাব এবং তাঁর পয়গম্বরদের কর্মনীতি ও কর্মধারা থেকে এগুলোর সুস্পষ্ট জবাব পাওয়া দরকার।

আল্লাহর কিতাব থেকে এজন্যে যে, সে-ই তার অনুগামীদের ওপর এ-গুরুভার ন্যস্ত করেছে এবং সে সঙ্গেই সে দাবি জানিয়েছে যে, সে হচ্ছে تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ এ-দাবির সত্যতাকে কোন মুসলমানই অস্বীকার করতে পারে না। এ-কারণেই এটা সম্ভব নয় যে, অন্যান্য সমস্ত ব্যাপারে তো সে আমাদের পথ নির্দেশ দান করেছে, কিন্তু যে-সমস্যাটি সমস্ত সমস্যার চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং যেটি তামাম দ্বীনী কর্তব্যের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়, তাকেই অন্ধকারে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

আল্লাহর রসূলদের কর্মনীতি ও কর্মধারা থেকে এ-জন্যে যে, ঐসব মহাপুরুষ ও তাঁদের অনুগামীদের ছাড়া এ-লক্ষ্যকে আর কেউ গ্রহণ করেছে, এমন কোন মানুষ বা মানবগোষ্ঠীর কথাই দুনিয়া অবহিত নয়।

সম্ভাবনার প্রশ্ন তুলে কর্তব্য পালনে ঔদাসীন্য

প্রথম প্রশ্নের জবাবে আল্লাহর কিতাব বলে যে, মুমিনের পক্ষে তার আমল কর্তব্য এবং তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া সর্বাবস্থায়ই আবশ্যক এবং ফলাফলের প্রতি কোন পরোয়া না করে সে-সংগ্রামে তার নিয়োজিত থাকাই কর্তব্য। অনুরূপভাবে আম্বিয়ায়ে কেরামের কর্মাদর্শও ঠিক একথারই সাক্ষ্য বহন করে। তাই কুরআন বলছে যে, দুনিয়ায় যে নবীই এসেছেন, তাঁর প্রতি লোকদের সামনে এ-দাবি জানাবার নির্দেশ ছিলঃ

أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ (نحل: ٣٦)

লোক সকল! আল্লাহ তা'য়ালার বন্দেগী কর এবং 'তাগুত' বা খোদাদ্রোহী শক্তির আনুগত্য পরিহার কর। (নাহল-৩৬)

إِنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ* (انبياء: ٦٥)

নিঃসন্দেহে, আমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই; অতএব আমার বন্দেগী কর। (আম্বিয়া-২৫)

এ-কয়েকটি শাব্দিক দাবি হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে সেই বিপ্লবী মিশনেরই সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, যাকে বলা হয় اقامت دين বা দ্বীন-ইসলামের প্রতিষ্ঠা। অবশ্য বর্তমানে طاغوت، الله، عبادت শব্দের যে-সঙ্কীর্ণ অর্থ লোকদের মনে বদ্ধমূল রয়েছে, তাতে একথায় কিছুটা অতিশয়োক্তি মনে হবার খুবই সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু কুরআন মজীদ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهِ نُوْحًا..... اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ বলে এ-ধারণার কোনই অবকাশ রাখেনি। কেননা তার এ-বক্তব্য থেকে একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, নূহ (আঃ), মুসা (আঃ), ঈসা (আঃ), মুহাম্মদ (সঃ) নির্বিশেষে সমস্ত নবীর প্রতি আল্লাহর প্রেরিত দ্বীনের দাওয়াত ও প্রতিষ্ঠার কর্তব্যই অর্পণ করা হয়েছিল। এ-কারণেই اُعْبُدُوا اللّٰهَ এর যা অর্থ, তাছাড়া اَقِيْمُوا الدِّيْنَ এর আর কোন সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ অর্থ হতেই পারে না।

এখন প্রশ্ন হল, উক্ত মহাপুরুষগণ তাঁদের এ-কর্তব্য কিভাবে সম্পাদন করেছেন? এর জবাবে কি একথা বলা যেতে পারে যে, উক্ত মহামানবরা যে-মিশন ও উদ্দেশ্য নিয়ে দুনিয়ায় এসেছিলেন, তার প্রকাশ ও প্রচারণায় কি প্রয়াস-প্রচেষ্টায় তাঁরা একটি লহমাও দেরি করেছিলেন? কিংবা পরিস্থিতির আনুকূল্য পর্যালোচনা করেছিলেন? অথবা সম্ভাবনা ও অসম্ভাবনার বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং যখন এ-পর্যালোচনা ও বিতর্ক থেকে সাফল্যের উজ্জ্বল সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হয়েছিল, কেবল তখনই তাঁরা নিজ নিজ কিশতিতে পাল

তুলেছিলেন? এ-ব্যাপারে সুবিধাবাদী বিচার-বুদ্ধির রায় অন্য কিছু হতে পারে, কিন্তু কুরআনের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, আদতে এর কোন কিছুই ঘটেনি। বরং এর বিপরীত প্রত্যেক নবীই তাঁর এ-কর্তব্য এমনি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেছেন যে, এ-অভিযানের সাফল্য সম্পর্কে না তিনি খোদার কাছ থেকে কখনো গ্যারান্টি দাবি করেছেন, আর না ফলাফল চিন্তায় একটি মুহূর্ত ব্যয় করেছন। এর সম্ভাবনা ও অসম্ভাবনা সম্পর্কে না তাঁর মনে কোন প্রশ্নের উদ্রেক হয়েছে, আর না পরিস্থিতির কোন প্রতিকূলতা এক দিনের তরেও এ-আওয়াজকে তাঁর বুকের মধ্যে দাবিয়ে রাখতে পেরেছে, বরং আবির্ভাবের সূচনা থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি নিজের এ-কর্তব্য অবিশ্রান্তভাবে পালন করে গিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কারো কারো সত্যের দাওয়াত কামিয়াব হয়েছিল এবং দুনিয়া থেকে বিদায়ের পূর্বে তাঁরা সৎ-কর্মশীল লোকদের একটি সুসংঘবদ্ধ দল গঠন করে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন; আবার অনেকেরই আওয়াজ শেষ পর্যন্ত অনুভূতিহীন লোকদের পাষাণ-হৃদয়ে প্রতিহত হয়ে ফিরে এসেছে। নূহ (আঃ) তাঁর জীবনের প্রায় এক হাজার বছর ধরে–দিবা-রাত্রি এ-কর্তব্য পালনেই ব্যয় করেছেন। কিন্তু এ-সুদীর্ঘ ও ধৈর্যশীল প্রচেষ্টার ফল বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই গালাগাল ও প্রস্তর বৃষ্টিরূপে প্রকাশ পেত, এ সবের দ্বারাই তাঁর দেশবাসী তাঁকে দিবা-রাত্রি 'অভিনন্দন' জানাত। আর তিনি যখন নিজের কর্তব্য সমাপন করে দুনিয়া থেকে বিদায় হন, তখন তাঁর দাওয়াত গ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয় মাত্র কয়েকজন লোক। ইব্রাহীম (আঃ) বৃদ্ধ-বয়স পর্যন্ত লোকদেরকে খোদার দাসত্বের দিকে আহবান জানাতে থাকেন। এবং আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে অবিরাম প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। এ-প্রচেষ্টা ও আদর্শ প্রচারে তাঁকে যে-সব বিপদ-মুসিবত অতিক্রম করতে হয়েছে, তার কোন নজির আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু এই সমগ্র প্রয়াস-প্রচেষ্টা ও অবিশ্রান্ত আত্মত্যাগের প্রকাশ ফল মাত্র এ-টুকু লক্ষ্য করা গিয়েছিল যে, তাঁর নিজস্ব পরিবার-পরিজন ও কিছু নিকটতম আত্মীয়-স্বজন ছাড়া খুব কম লোকই তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিল। হযরত লুত (আঃ) শোয়াইব (আঃ), হুদ (আঃ), সালেহ (আঃ) ঈসা (আঃ) প্রমুখ আম্বিয়ায়ে কেরামের ইতিহাসও কম-বেশী এ-রকমই ছিল। পরন্তু এ-মহামানবদের দলে হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর মত নির্যাতিত পুরুষরাও ছিলেন। তাঁদের প্রচার-তবলীগ ও সুপথ নির্দেশনার ফলাফল এই দাঁড়িয়েছিল যে, তাঁরা কোন সত্যের অনুগামী তো পানই নি বরং তাঁদের কারো শিরচ্ছেদ করা হয়েছে, আর কাউকে করাত দ্বারা চিরে ফেলা হয়েছে।

وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ (ال عمران: ٢١)

আরো নিকটবর্তী ইতিহাস দেখুন। শেষ নবী (সঃ)-এর কর্মধারা এ-সত্যের সব চাইতে স্পষ্ট ও বিস্তৃত প্রমাণ বহন করে। সবাই জানেন যে, তাঁর নবীসুলভ দায়িত্ব অন্য সব নবীর চাইতে বেশী ছিল। কেননা তাঁকে যে-দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য দেয়া হয়েছিল, তা ছিল অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ। পরন্তু কোন বিশেষ দেশ বা জাতির পরিবর্তে এ-দ্বীনের লক্ষ্য ছিল গোটা মানব জগত। আর এ-মানব জগতের প্রতিটি কেন্দ্রই ছিল খোদাদ্রোহী শক্তির ঝাণ্ডা উঁচানো এবং কুফর ও শেরকের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি নবুয়াতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হওয়া মাত্রই খোদার তরফ থেকে নির্দেশ এলঃ

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ (حجر: ٩٤)

যে-শিক্ষা প্রচারের নির্দেশ তোমায় দেয়া হয়েছে, লোকদের কাছে তা স্পষ্টত পৌছিয়ে দাও এবং মুশরেকদের ব্যাপারে মোটেই ভ্রূক্ষেপ করো না।

এই নির্দেশ পালনে তিনি কোন ওজর-আপত্তি তুলেননি, বরং কোনরূপ দ্বিরুক্তি ছাড়াই তিনি লোকদের সামনে নিজের দাওয়াত পেশ করলেন এবং তাকে স্বাভাবিক গতিতে সম্প্রসারিত করে চললেন। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই এ-আওয়াজ ঘর-বাড়ী, অলি-গলি, মহল্লা-মজলিস ও নিকটতম পরিবেশ অতিক্রম করে পাহাড়ের চূড়ার চাইতেও বুলন্দ হয়ে উঠল। শ্রোতৃবর্গ এ-আওয়াজের যেরূপ জবাব দিল, মক্কা ও তায়েফের অলি-গলি তা কোনদিন ভুলতে পারবে না। কিন্তু খোদার এ-কর্তব্য সচেতন বান্দাটি এসব বিষয়ে বিন্দুমাত্রও পরোয়া করলেন না। তিনি শুধু লক্ষ্য রাখলেনঃ যে-সত্য প্রচারের দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে, তা যেন নির্ভুলভাবে পালিত হয়। অথবা যে সত্যের ওপর পথভ্রষ্ট মানবতার মুক্তি ও কল্যাণ নির্ভরশীল, তার প্রতি যেন তারা কর্ণপাত করে। তাঁর সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা এ-একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষায় এসে একীভূত হতে লাগল যে, তাঁর কথা যেন লোকদের মনে কোন প্রকারে দৃঢ়মূল হয়ে যায় এবং যে-দ্বীনকে আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে নাযিল করেছেন, তাঁর বান্দারা যেন তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে দেয়। কিন্তু আল্লাহ বারবার প্রীতির সঙ্গে তাঁকে ধমক দিতে লাগলেন এবং এ-সত্যকে অন্তর্নিবিষ্ট করিয়ে দিলেন যে, তোমার কাজ হচ্ছে শুধু সত্যের বাণীকে পৌছিযে দেয়া এবং সবিস্তারে তাকে বর্ণনা করা। অতঃপর একটি লোকও যদি তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে তো সেজন্য কোনই পরোয়া করো না। (فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ) 'পরিণাম ফল সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেপরোয়া হয়েই তুমি তোমার দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতে থাক। হয়তো নিজ চোখেই তুমি এ-দাওয়াতকে কামিয়াব এবং এর

দুশমনদেরকে ধ্বংস ও বরবাদ হতে দেখে যেতে পার–আবার এরূপ না হবারও সম্ভাবনা রয়েছে।

وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ* (يونس: ٤٦)

হে নবী! অবিশ্বাসীদেরকে আমরা যে শাস্তির ধমক দিচ্ছি, হয়ত তার কিছু অংশ আমরা তোমায় দেখিয়ে দেব (এবং তোমার চোখের সামনেই এরা নিজেদের মন্দ পরিণতি কতকটা ভোগ করবে) অথবা (তার পূর্বেই) তোমাকে মৃত্যু দান করব। কারণ আমাদের কাছেই তো তাদের ফিরে আসতে হবে। পরন্তু তাদের সমস্ত কৃতকর্মই রয়েছে খোদার দৃষ্টিসীমার মধ্যে।

এই হচ্ছে নবীদের ইতিহাসের কতিপয় প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত অধ্যায়। কুরআনে হাকীমের এই অধ্যায়গুলো বিবৃত হয়েছে জ্ঞান–বুদ্ধি সম্পন্ন লোকদের পথ-নির্দেশ ও শিক্ষা গ্রহণের জন্যে। এ-কাহিনীগুলোতে সত্যানুবর্তনের যে-নীতিটি সবচাইতে বেশী উজ্জ্বল এবং সত্যের যে-নির্দেশটি সর্বাধিক প্রকট বলে মনে হয়, তা হল এই যে, আল্লাহর দ্বীনের প্রতিষ্ঠার জন্যে কোন সময় বিচারের প্রয়োজন নেই। এক্ষেত্রে পরিস্থিতির আনুকূল্য বিচারের না কোন অবকাশ আছে আর না কামিয়াবির সম্ভাবনা খুঁজবার কারও অধিকার আছ। যে জিনিসটি আমাদের জীবনের পরম লক্ষ্য বলে আখ্যা পেয়েছে, তা যে-কোন দিক থেকে এমনি গুরুত্বপুর্ণ যে, যতক্ষণ জীবন থাকবে, ততক্ষণই তার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। যে-কর্তব্য বিপদাপদের আশংকায় স্থবির হয়ে থাকবে, এবং সম্ভাবনা ও অসম্ভাবনার বিতর্কে হাবুডুবু খাবে, তাকে প্রকৃতপক্ষে কর্তব্য বলেই মানা হয়নি। বস্তুত সত্যের দাওয়াত ও দ্বীনের প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করার পূর্বে সম্ভাবনার পরীক্ষা গ্রহণ যদি যথার্থ হত, তাহলে একথা নিশ্চিতরূপেই বলা যায় যে, নবীদের এক বিরাট অংশ তাঁদের মিশনের নাম পর্যন্ত মুখে উচ্চারণ করতেন না–তার জন্যে বাস্তব চেষ্টা-সাধনা করা তো দূরের কথা! কারণ, নবীদেরকে দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার মিশন দিয়ে সাধারণত তখনি দুনিয়ায় পাঠানো হত, যখন একাজের পক্ষে পরিস্থিতির প্রতিকূলতার চরমে গিয়ে পৌঁছতো–যখন সত্যের কালেমার বৃদ্ধি ও প্রচার-প্রতিষ্ঠা দৃশ্যত অসম্ভব হয়েই দাঁড়াত। কিন্তু পরিস্থিতির এই তীব্র প্রতিকূলতা এবং দৃশ্যত কামিয়াবির এ ক্ষীণ সম্ভাবনা সত্ত্বেও–যার সঙ্গে এ-যুগের প্রতিকূলতা ও অসুবিধার কোন তুলনাই আমরা করতে পারি না–তাঁরা নির্ভয়ে সমুদ্রের বুকে নৌকার পাল তুলে দিয়েছেন। তাঁরা এতটুকু চিন্তা করেননি যে, উপকূল কোথায় এবং কোন দিকে? আবহাওয়া শান্ত কি দুর্যোগপূর্ণ? বাতাসের

গতি অনুকূল কি প্রতিকূল? নৌকার মাঝির বাহুতে কতটুকু শক্তি আছে? সমুদ্র অতিক্রম্য কি দূরতিক্রম্য? চলার পথ পরিস্কার, কি পানির ভিতরে বাধার পাহাড় রয়েছে? এ ধরনের কোন একটি প্রশ্নও তাঁদের মনে জাগ্রত হয়নি।

এরপর আর কাদের আদর্শ এ ব্যাপারে আমাদের পথ-নির্দেশ করবার অধিকার রাখে? কার সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে আমরা বিপদাপদ ও প্রতিকূলতার অজুহাত তুলে নিজেদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও জীবন-লক্ষ্য থেকে সাময়িকভাবে হলেও 'তওবা' করতে পারি? আম্বিয়ায়ে কেরামের জীবনাদর্শ তো উপরেই পেশ করা হলো। সে আদর্শ এ ধরনের কোন সুবিধা দিতেই প্রস্তুত নয়। অবশ্য আম্বিয়ায়ে কেরামের কাহিনীকে যদি আমরা কার্যত (খোদা না করুন) আরব মুশরিকদের ন্যায় أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. এর মর্যাদা দিই এবং তাকে এমন প্রাচীন উপাখ্যান বলে গণ্য করি, আমাদের চিন্তা ও কর্মের গতি নির্ধারণে যার কোন প্রভাব নেই–তাহলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু পরিস্থিতি যদি তেমনি না হয় এবং আমাদের নির্বুদ্ধিতা এখনও আমাদেরকে نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ. পর্যন্ত না পৌঁছিয়ে থাকে, বরং আমরা যদি কুরআনের শিক্ষানুযায়ী এ-কাহিনীগুলোকে সৎপথের আলোকস্তম্ভ এবং দূরদৃষ্টির উৎস বলে বিশ্বাস করি–তাহলে এর প্রতিটি পৃষ্ঠা থেকে আমরা এই পথ নির্দেশই লাভ করব যে, যে জিনিসটি আমাদের জীবনের কর্তব্য বলে নির্ধারিত হয়েছে, তার জন্যে চেষ্টা-সংগ্রাম থেকে আমরা কোনক্রমেই বিরত থাকতে পারি না।

প্রতিকূল পরিস্থিতির যথার্থ দাবি

বলা হবে যে, পরিস্থিতির একটা নিজস্ব গুরুত্ব রয়েছে এবং মানুষের চিন্তা ও কর্মের ওপর তা অবশ্যই প্রভাবশীল হয়ে থাকে; কাজেই সত্যের দাওয়াতের ব্যাপারে তা কোন ভ্রূক্ষেপেরই যোগ্য নয়, বিচার-বুদ্ধি এটা কী করে মেনে নিতে পারে? নিঃসন্দেহে এ একটি সঠিক ও যুক্তিসঙ্গত কথা এবং এর যথার্থতাকে অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু সত্যের দাওয়াত ও তার সংগ্রামের ওপর পরিস্থিতির আদৌ কোন প্রভাব পড়ে না–একথা তো উপরে কখনো কোথাও বলা হয়নি! সেখানে তো শুধু এটুকুই বলা হয়েছে যে, পরিস্থিতির প্রতিকূলতা এ-সংগ্রামকে মূলতবী বা নাকচ করতে পারে না। তাহলে প্রশ্ন হল, পরিস্থিতি এ-সংগ্রামের ওপর কিভাবে প্রভাবশীল হয়? এর জবাব এই যে, পরিস্থিতি যতই কঠোর ও তীব্রতর হয়, এ-সংগ্রামকে ততই আবশ্যক করে তোলে। একে ইতিহাস ও বিচারবুদ্ধি উভয়েরই জবাব বলা যেতে পারে।

(১) ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে, প্রত্যেক নবীকে সাধারণত এমন সময়ে এ-কাজের জন্যে অভিষিক্ত করা হয়েছে, যখন দুনিয়া থেকে সত্যের আলো

একেবারেই তিরোহিত হয়ে গিয়েছিল–কুফর ও নাস্তিকতার নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে সত্যের দাওয়াতের পক্ষে কামিয়াবির সম্ভাবনা যখন দূর-দারাজ পর্যন্তও লক্ষ্যগোচর হচ্ছিল না। এর থেকে এ-কথাই প্রমাণিত হয় যে, এ-সংগ্রাম এমনি পরিবেশের সঙ্গেই বেশী পরিচিত। আর আল্লাহ তায়ালারও অভিপ্রায় হচ্ছে এই যে, এ-ধরণের তিমিরাচ্ছন্ন পরিবেশেই সত্যের প্রদীপ জ্বালাতে হবে এবং তাঁর বান্দার পক্ষে তাঁর দ্বীনের জন্যে যা কিছু করা সম্ভব, তাতে মোটেই দ্বিরুক্তি না করা উচিত। সম্ভবত এর কারণ এই যে, তাঁর রহমত ও অনুগ্রহের কাছে এই গাঢ় অন্ধকার আরও গাঢ়তর হওয়া মোটেই পসন্দনীয় নয়।

(২) বিচারবুদ্ধিও ঠিক এ-কথাই বলে। সে বলে যে, মানব জাতির জন্যে আল্লাহর দ্বীন যখন সৎপথের আলোকবর্তিকা স্বরূপ, তখন যেখানকার মানুষ যত বেশী গোমরাহী ও অন্ধকারের খপ্পরে পড়বে, সেখানে এ-আলোকবর্তিকার প্রয়োজনও তত বেশী হবে। সত্যের দাওয়াতের জন্যে কঠোর ও তীব্রতর প্রতিকূলতার অর্থ হচ্ছে এই যে, সত্যের প্রতি উপেক্ষা ও নির্ভীকতা সীমা অতিক্রম করে গিয়েছে এবং লোকেরা অন্ধত্বের প্রতি অনুরক্ত হতে শুরু করেছে। কাজেই এ-প্রতিকূল পরিস্থিতির যথার্থ দাবি হবে এই যে, যারা মানবতাকে সত্যের আলো প্রদর্শনের কাজে অভিষিক্ত, তাঁরা মৌনতা ও নিষ্ক্রিয়তাকে নিজেদের প্রতি হারাম করে নেবেন এবং অন্ধের ন্যায় ধ্বংসের পথে ধাবমান লোকদেরকে উচ্চ থেকে উচ্চৈঃস্বরে নিজেদের পয়গাম শোনাবেন। ভিন্নতর পরিস্থিতিতে তাদের পক্ষে কিছুটা অনায়াসগম্যতার অবকাশ থাকলেও অন্তত এ-ধরনের অস্বাভাবিক সত্যবিমুখ পরিস্থিতিতে তেমনি অবকাশ আদৌ থাকতে পারে না। যদি মহামারী শুরু হবার পরও স্বাস্থ্যরক্ষা সংক্রান্ত কোন বিভাগের নিদ্রাভঙ্গ না হয়, তাহলে তার কর্তব্য-জ্ঞানকে আর কে জাগাতে পারে?

বুদ্ধিবৃত্তি ও ইতিহাসের এ-সর্বসম্মত জবাবের পর একথা মানতেই হবে, যে-যুগে মানুষ সত্যের প্রতি যত বেশী বিমুখ হবে, নাস্তিকতা ও বস্তুতান্ত্রিকতার যত বেশী প্রতিপত্তি হবে, খোদাদ্রোহী শক্তির কর্তৃত্ব যত বেশী ব্যাপক, প্রশস্ত ও দৃঢ়মূল হবে–সত্যের ঝাণ্ডাবাহীদের পক্ষে আল্লাহর দ্বীনের প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব তত বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। কাজেই বর্তমান দুনিয়া সত্যের প্রতি যারপরনাই বীতশ্রদ্ধ ও বিদ্রোহী হয়ে পড়ছে বলে যে অনুমান করা হচ্ছে, তাকে যদি যথার্থ বলে মেনে নিই তো এ-পরিস্থিতি দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পক্ষে আদৌ কোন শৈথিল্যের কারণ হতে পারে না। বরং এ-অভিযানকে মামুলি অবস্থার চাইতেও বেশী আবেগ, তৎপরতা ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পরিচালিত করারই এ দাবি জানায়। নাসির

আর একটি দিক থেকে দেখলে বিষয়টির গুরুত্ব আরো বেশী মনে হবে। অর্থাৎ দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সম্ভাবনা ও অসম্ভাবনার বিতর্ক থেকে উর্ধ্বে এবং যে-কোন সময় যে-কোন পরিবেশ ও যে-কোন পরিস্থিতিতে তা অব্যাহত রাখতে হবে–বিষয়টি কেবল এর মধ্যেই সীমিত নয়। বরং এর পরিধি এতখানি প্রসারিত যে, পরিস্থিতি যদি এ-সংগ্রামের ব্যর্থতারও নিশ্চয়তা দেয়–এমন কি খোদ বিধিলিপিতে এ-ব্যর্থতা নির্ধারিত রয়েছে বলে কেউ স্বচক্ষে দেখতেও পায়, তবু তার পক্ষে এতে লিপ্ত থাকা ভিন্ন গত্যন্তর নেই। কারণ এটা দুনিয়ার সাধারণ আন্দোলনগুলোর মত কোন আন্দোলন নয় যে, এর কামিয়াবির লক্ষণ এবং সম্ভাবনা পরিদৃষ্ট না হলে এর থেকে হাত গুটিয়ে বসে থাকলেও কোন ক্ষতি নেই। এটি মুসলমানদের মাথার ওপর চাপিয়ে দেয়া দায়িত্ব নয় যে, ইচ্ছা হলে গ্রহণ করলাম, নতুবা প্রত্যাখ্যান করলাম–আর গ্রহণ করলেও যখন ইচ্ছা আপন কর্মসূচী (Programe) থেকে বাদ দিয়ে নিলাম। বরং এক ব্যক্তির মুসলমান হবার অর্থই হল এই যে, দ্বীনের প্রতিষ্ঠার জন্যে সে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছে। আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ এবং সত্যের সঙ্গে প্রীতি স্থাপনের দাবিই হচ্ছে এই যে, আল্লাহ যে জিনিসগুলো ভালবাসেন এবং যে বিষয়গুলো সত্যাশ্রিত, মানুষ তাকে নিজে যেমন গ্রহণ করবে, তেমনি তার চারপাশে তাকে জীবন্ত ও ক্রিয়াশীল করে তোলার জন্যেও প্রাণপণ চেষ্টা করবে। এমনিভাবে খোদার অপছন্দনীয় এবং সত্যের বিরোধী, এমন প্রতিটি জিনিসকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে তাকে অস্থিরচিত্ত ও ব্যতিব্যস্ত বলে দেখা যাবে। তাই ইতোপূর্বে নবী করীম (স)-এর বক্তব্য থেকেও এ সত্যকে সুস্পষ্ট করে তোলা হয়েছে যে, আগুন ও পানির মধ্যে যেমন মিলন সম্ভব নয়, তেমনি ঈমান ও দুষ্কৃতির মধ্যেও ঐক্য সম্ভব নয়। কাজেই দুষ্কৃতির বিনাশ ও সুকৃতি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম হচ্ছে দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামেরই নামান্তর মাত্র। এটা ইসলাম থেকে স্বতন্ত্র কিংবা তার চাইতে বাড়তি কোন জিনিস নয়, বরং এ হচ্ছে তার মূল আত্মা এবং তার হৃদয়ের স্পন্দন। কোন জীবন্ত প্রাণীর হৃদয়ে স্পন্দন না থাকাটা যেমন কল্পনা করা যায় না, তেমনি কোন মুমিনের দিল-দিমাগ সত্য প্রতিষ্ঠার উদ্দীপনা থেকে মুক্ত হবে এবং বাস্তব সংগ্রাম থেকে তার হাত-পা বিরত থাকবে, এটাও কল্পনা করা যায় না। কারণ এমনি উদ্দীপনা থেকে মুক্ত এবং এই সংগ্রাম থেকে বিরত থাকাটা কোন মামুলি ব্যাপার নয়। প্রকৃতপক্ষে এর অর্থ হচ্ছে নিজের জীবন লক্ষ্য থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া; আর একথা সুস্পষ্ট যে, এরপর মুসলমানের অস্তিত্বই একেবারে অর্থহীন হয়ে যায়। তাই আহলে কিতাবদের সম্পর্কে–যারা নিজেদের জীবন লক্ষ্য বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল–কুরআন স্পষ্টতর ভাষায় বলে দিয়েছে যে, তোমরা তওরাত ও ইঞ্জিলকে প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত কোন সত্যের ওপরই

প্রতিষ্ঠিত হবেনা এবং তোমাদের জাতীয় অস্তিত্ব ও নেহাত অর্থহীন ছাড়া আর কিছুই হবে না।

(لَسْتُمْ عَلٰى شَىْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ)

এই কারণেই বর্তমান যুগে দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠাকে অসম্ভব বলা আর এ যুগে মুসলমান হওয়া অসম্ভব বলা একই কথা। অনুরূপভাবে যুগধর্মের প্রতিকূলতার অজুহাতে দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বিরত থাকার মানে হচ্ছে ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়াটাকেও ভ্রান্ত মনে না করা।

সম্ভ্রমের শিক্ষা

পরন্তু যে জিনিসটি জীবনের আসল কর্তব্য বলে আখ্যা পায় তা সম্ভাবনা ও অসম্ভাবনার প্রশ্ন থেকেও ঊর্ধ্বে চলে যায়। এটা শুধু ইসলাম ও মুসলমানের সঙ্গে সম্পৃক্ত কোন ব্যাপার নয়, বরং এ একটি সাধারণ ও সার্বজনীন সত্য। তাই নবীগণ এবং তাঁদের সাচ্চা অনুসারীগণ যেমন এই দাবিটিকে পূর্ণকরে দেখিয়েছেন, তেমনি কাফের ও নাস্তিকদের কাছেও এটি একটি অনস্বীকার্য দাবি হিসেবে গুরুত্ব লাভ করেছে। তারাও 'লক্ষ্য' বলতে এটাই বুঝেছেঃ যা কখনো দৃষ্টিপথ থেকে অন্তর্ণিহিত হয় না, জীবনের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করার জন্যে কখনো পরিস্থিতির অনুমতি গ্রহণের তোয়াক্কা করে না, যা পরিবেশের আনুকূল্য কামনা করলেও কখনো ভয় করে না এবং যার জন্যে সংগ্রাম করতে গিয়ে জীবন উৎসর্গ করতে না পারলে সে জীবনটাই হয় বৃথা—তা-ই হচ্ছে জীবন লক্ষ্য। তাদের ইতিহাসে এ সত্যের ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে।

দৃষ্টান্ত হিসেবে কার্লমার্ক্সের অনুগামীদের কথাই ধরা যাক। মর্ক্সের কাতিপয় নিজস্ব মতবাদ ছিল। সেগুলোর প্রতি তারা ঈমান আনল এবং সে মতবাদগুলোর প্রতিষ্ঠাকেই তারা মানবীয় সমস্যাবলীর নির্ভুল সমাধান মনে করল। এই কারণেই সে কাজটিকে তারা নিজেদের জীবন-লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করলো। তার জন্যে পূর্ণ নিষ্ঠা, দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সংগ্রাম শুরু করে দিল। এ সংগ্রাম সবচাইতে বেশী শক্তিমত্তা নিয়ে এমন একটি দেশে শুরু হল, যেখানে তখনকার দিনের সবচাইতে বড় অত্যাচারী সরকার ক্ষমতাসীন ছিল—সেখানে 'জার' বংশের একনায়কত্ব ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে নিঃশ্বাস ফেলাও ছিল দৃশ্যত অসম্ভব। কিন্তু কম্যুনিস্ট নীতি অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনকে যারা নিজেদের জীবন-লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেছিল, তারা এই সংগ্রামের আড়ালে প্রচ্ছন্ন বাধাবিপত্তি, প্রতিকূলতা ও

বিপদাপদের প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করল না। তাদের এই তৎপরতার খবর জারের কানে পৌঁছলে অত্যাচার ও নির্যাতনের সর্ববিধ অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে সে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অসংখ্য লোককে সে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছিয়ে দিল। যারা বেঁচে রইল, তাদেরকে সাইবেরিয়ার তুষারময় জাহান্নামে নিক্ষেপ করল। মোটকথা, জুলুম-পীড়ন ও দুঃখ-কষ্টের এমন কোন সম্ভাব্য রূপ নেই যা এই কম্যুনিস্ট 'মুমিনদের' অতিক্রম করতে হয়নি। কয়েক বছর যাত ক্রমাগত এমনি সংঘাত অব্যাহত রইল। কিন্তু কোন বৃহত্তম প্রতিকূলতা বা বিপদাপদও তাদের সঙ্কল্পকে টলাতে পারেনি। কম্যুনিজমের প্রতি গভীর অনুরাগ বিপদের ঝড়-ঝঞ্ঝার সাথেও তাদেরকে অবিরাম লড়াই করতে এবং লক্ষ্যস্থলের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

জারের শাসন কর্তত্ব উচ্ছেদ করে নিজেদের কম্যুনিস্ট শাসন প্রবর্তনে কামিয়াব হবার পর এই কম্যুনিস্টদের মধ্যেই মতানৈক্য দেখা দিল। লেনিনের মৃত্যুর পর রাজনীতির চাবিকাঠি স্টালিনের করায়ত্ত হল। সে কম্যুনিস্ট শাসনকে ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে গুটিয়ে জাতীয় কম্যুনিজমের পর্যায়ে নিয়ে আসতে শুরু করল। তার এই পলিসি ছিল প্রকৃতপক্ষে কুমনিস্ট নীতি থেকে বিচ্যুতির পলিসি এবং মার্কসবাদের সঙ্গে খোলাখুলি বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর। লেনিনের অন্যতম সহকর্মী ট্রটস্কী এই নীতির ঘোর বিরোধীতা করল এবং কম্যুনিজমের মূল প্রাণবস্তু ও খাঁটি মার্কসবাদ প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ করল। স্টালিন শুধু তার এই দাবি মানতেই অস্বীকৃতি জানাল না, বরং এই অপরাধে তাকে রাষ্ট্রযন্ত্র থেকেই তাড়িয়ে দিল। গুপ্ত পুলিশ তার ও তার সমর্থকদের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করল এবং তার জবান বন্ধ করে দেয়া হল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যে নীতির প্রতি সে ঈমান পোষণ করত এবং যার প্রতিষ্ঠার মধ্যে দুনিয়ার কল্যাণ মনে করত, তার প্রচার থেকে সে বিরত রইল না। অবশেষে তাকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হল। সে আমেরিকায় গিয়ে উপনীত হল এবং সেখান থেকেই নিজের মিশন প্রচার ও আপন লক্ষ্য অর্জন করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু তার শত্রুর চর সেখানে গিয়েও পৌঁছল এবং একদিন তারা ষড়যন্ত্র করে তার সামনে মৃত্যুর পেয়ালা তুলে ধরল। মার্কসবাদের এই 'একনিষ্ঠ মুমিন' সে পেয়ালাকে নিতান্ত ধৈর্য ও স্থৈর্যের সঙ্গে গ্রহণ করল। এইভাবে নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের জন্যে সে আত্মত্যাগ করল।

এতো কিছুটা পুরনো দিনের কথা। আরো নিকট কালের ইতিহাস দেখুন। যে জাপান ও জার্মান জাতি আজকে আহতাবস্থায় পড়ে রয়েছে, তাদের ইতিহাস শুনুন। তাদের নেতৃবৃন্দ তাদের সামনে একটি লক্ষ্য পেশ করেন। তার প্রতি তারা ঈমান আনল এবং তা অর্জন করার জন্যে কর্মতৎপর হয়ে উঠল। প্রতিদ্বন্দ্বী

জাতিগুলো তাদের প্রতিরোধ করতে চাইল। সে প্রতিরোধকে তারা তরবারির জোরে অপসারিত করার প্রতিজ্ঞা করল। ফলে যুদ্ধের ময়দান সরগম হয়ে উঠল। উভয় জাতিই নিজ নিজ ক্ষেত্রে বন্যার বেগে এগোতে লাগল। মাত্র কয়েক হপ্তার মধ্যেই তারা হাজার হাজার বর্গমাইল এলাকায় কর্তৃত্ব বিস্তার করে ফেলল। কিন্তু ভাগ্যলিপি হঠাৎ বদলে গেল এবং অগ্রগতির ন্যায় সমান বেগেই আবার তারা পিছু হটতে বাধ্য হল। অতঃপর ধ্বংস ও বিপর্যয় শোচনীয়ভাবে তাদের উপর বর্ষিত হতে লাগল। কিন্তু আপন লক্ষ্যের প্রতি তাদের এমনি গভীর আসক্তি ছিল যে, তাদের যুবকরা মত্যুর ভয়াল গ্রাস দেখেও তার ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়ত। তারা উড়োজাহাজের সাহায্যে লাফ মারত। এবং বোমা নিয়ে সোজা শত্রুর যুদ্ধ জাহাজের চিমনির মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়ত। বোমা ভর্তি উড়োজাহাজ নিয়ে তাদের জাহাজের ওপর গিয়ে পড়ত। এই এম্নি করেই দুনিয়ার জঙ্গী অভিযানগুলোতে 'আত্মহত্যাকারী উড়োজাহাজ' 'কাফন পরিহিত বিমান' ইত্যাকার পরিভাষাগুলো যুক্ত হয়েছে। পরন্তু প্রকৃতি যখন তাদের এই কামনাকে চূড়ান্ত রকমে ব্যর্থ করে দিল, তখন এই বিশ্বাসের সঙ্গে তারা আত্মহত্যা করতে লাগল যে, মৃত্যুর পর দেবতা হয়ে তারা স্বজাতির খেদমত ও আপন লক্ষ্যের খাতিরে যুদ্ধ করবে। তাদের স্ত্রীরা এই মনোভাব নিয়ে তাদের সদ্যজাত সন্তানদের প্রতিপালন করতে লাগল যে, বড় হয়ে তারা শত্রুদের কাছ থেকে নিজেদের জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বিলুপ্তির প্রতিশোধ গ্রহণ করবে।

এ হচ্ছে এমন লোকদের মতাদর্শ ও কৃতিত্ব, যাদের কোন ভবিষ্যৎ নেই। মৃত্যুর পর যারা নিজেদের এই আত্মত্যাগের কোনই প্রতিফল পাবে না। যাদের সামনে রয়েছে শুধু এই দুনিয়া পাবার লক্ষ্য। এসব কাহিনী ও ঘটনাবলীর মধ্যে আমাদের জন্যে কি কোন শিক্ষণীয় বিষয় এবং কোন আত্মসম্ভ্রমের বাণী নেই? এই কয়েক দিনের পার্থিব লক্ষ্যের ভিতর যতখানি গভীরতা আছে, খোদার সন্তুষ্টি ও পরকালীন মুক্তির ভিতর কি ততটুকু গভীরতাও নেই? শয়তানী ঈমানের মধ্যে যতটা উত্তাপ পরিলক্ষিত হচ্ছে, খোদায়ী ঈমানে কি ততটুকু উত্তাপও সৃষ্টি হতে পারে না? বাতিলের অনুগামীরা তার সাক্ষ্যদানের বেলায় যতখানি সাহসিকতা প্রদর্শন করে থাকে, সত্যের সাক্ষ্যদানে কি ততটুকু সাহসিকতাও দেখানো উচিত নয়? কুফরের ধ্বজাবাহীরা তাদের জীবনের কর্তব্যকে যতটা গুরুত্ব প্রদান করছে, ইসলামের ধারকরা কি ততটুকু গুরুত্বদানেও প্রস্তুত নয়? আম্বিয়ায়ে কেরামের ঘটনাবলীকে বাহানার উপকরণ বানিয়ে নবীসুলভ উদ্দীপনা, তবলিগ, আত্মার গায়েবী সাহায্য ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে পাশ কাটানো যেতে পারে; কিন্তু কুফর ও ভ্রষ্টতার ধ্বজাবাহীদের মধ্যকার এই আত্মোৎসর্গীদের পেছনে কোন্ গায়েবী সাহায্যটা খুঁজে পাওয়া যাবে? আক্ষেপের বিষয় এই যে, সম্ভাবনা ও অসম্ভাবনার

প্রশ্ন তোলার সময় বাতিলপন্থীদের ক্রিয়াকাণ্ড ও নৈতিকতার প্রতিও লোকেরা একবার দৃষ্টিক্ষেপ করে দেখে না এবং তাদের কাছ থেকে জীবন-লক্ষ্যের হক আদায় করতে শেখেনা। আর এ দৃশ্যটাও কত শিক্ষণীয় এবং পরিতাপজনক! যাদের দৃষ্টি শুধু এই মরজগতেই সীমাবদ্ধ, তারা তো কর্তব্য পালনের ব্যাপারে পরিণাম চিন্তা থেকে এতখানি মুক্ত; কিন্তু যাদের দাবি হচ্ছে এই যে, আমাদের নামায, আমাদের কুরবানী, আমাদের জীবন, আমাদের মৃত্যু সবকিছু আল্লাহর জন্যেই নির্ধারিত–ব্যর্থতার আশঙ্কা তালাশে তারাই ব্যতিব্যস্ত। যে সত্যের চাপ একটি অন্ধ বস্তুবাদীও হাতড়িয়ে জেনে নিচ্ছে, তা ঈমানের আলোকসম্পন্ন দৃষ্টিতে সামান্যও ধরা পড়ছে না।

আবেগ প্রবণতার অমূলক বিদ্রূপ

এই আলোচনা থেকে একথা একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কর্তব্য পালনের ব্যাপারে সম্ভাবনার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না এবং ঈমানী সম্ভ্রম-এর ধারণা পর্যন্ত বরদাশত করতে পারে না। তাছাড়া ঈমানী সম্ভ্রম দূরের কথা, কোন আত্মমর্যদা সম্পন্ন ও সম্ভ্রমশীল কাফেরও এমনি কাজ করতে পারে না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আজকের সুবিধাবাদী ও আরামপ্রিয় লোকদের মগজে এ সত্যটি খুব কম ঢুকবে বলেই আমাদের আশঙ্কা হয়। এমন কি, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার দাবিদারগণ যদি খাস বুজুর্গিয়ানা চালে বলে উঠেন যে, এসব হচ্ছে আবেগপ্রবণ কথা, কর্মজগতের সঙ্গে এর কোন সংশ্রব নেই, তবে তা আদৌ কোন অপ্রত্যাশিত ব্যাপার হবে না। 'বুদ্ধিমান ব্যক্তি'দের এই মন্তব্য যদি গ্রহণ করার মত কোন সুযোগ থাকত তো অতি আনন্দের সাথেই গ্রহণ করা হত। কারণ দায়িত্বের এমন গুরুভার বহন এবং এমনি বিপদ-সঙ্কুল পথে পা বাড়াতে খামাখা কারো আগ্রহ থাকতে পারে না। কিন্তু মুশকিল এই যে, এই অভিমতটি গ্রহণ করলে আমাদের সমস্যার কোনই সমাধান হয় না, বরং তা আরো জটিল রূপ ধারণ করে। কারণ, তাহলে সেই বিচার বুদ্ধিই–যার দোহাই পাড়া হচ্ছে–ডেকে জিজ্ঞেস করবে যে, যে ধর্ম (দ্বীন) বারংবার ও খোলাখুলি এমনি আবেগ প্রবণ কর্মনীতি গ্রহণের উপদেশ দেয়, সে ধর্মই বা গ্রহণ করা হবে কেন?

কেউ যদি কোন ধর্মের সত্যতা স্বীকার করে এবং তার আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দেয়, তাহলে তার পক্ষে এটা অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, তার ধর্ম দাবি করলে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তেও সে কোন বাছবিচার করবে না। কিন্তু যদি সে দ্বীনের দাবি-দাওয়া শুনে পাশ কাটিয়ে যায় এবং তাকে আবেগপ্রবণ–অন্যকথায় অনুসরণের অযোগ্য ও অযৌক্তিক বলে বিচেনা করে, তবে তার স্পষ্ট অর্থ এই যে, সে দ্বীনের প্রতিই তার ঈমান নেই, তার ঈমান

রয়েছে শুধু বিচার বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির ওপর। কাজেই ঈমানদারির দাবি এই যে, দ্বীনের নামে কোন নীতি ও সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে তার নিজের মর্যাদাই নিরূপণ করা উচিত।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা কি শুধুই আবেগপ্রবণ ব্যাপার? নিছক আবেগ প্রবণতাই কি এদাবির ভিত্তি? তাছাড়া আমাদের বাস্তব জীবনে আবেগ প্রবণতার কি আদৌ কোন গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাই নেই? প্রথম প্রশ্নের জবাবে এখানে আর কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। কারণ ইতোপূর্বে যা কিছু বলা হয়েছে, তাতে এ ধারণার প্রতিবাদের উপযোগী অনেক বিষয়ই রয়েছে। দ্বিতীয় প্রশ্নটি সম্পর্কে একটু তলিয়ে চিন্তা করলে এর জবাবও সহজেই বোধগম্য হবে। দুনিয়ার বড় বড় আন্দোলন কিভাবে দানা বেঁধে উঠে, একবার তা পর্যালোচনা করে দেখুন। শুধু কি মতাদর্শের জোরেই ওঠে, না আবেগপ্রবণতার সাহায্যে ও প্রয়োজন হয়? এই পর্যালোচনার ফলে আমরা নিশ্চিতরূপে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছবো যে, যে কোন বড় কাজের সাফল্য বুদ্ধিবৃত্তি ও আবেগপ্রবণতা এ দু'য়ের ওপরই নির্ভরশীল। এতে যেমন বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচক্ষণতার শান্ত দর্শনের প্রতি উপেক্ষা দেখানো যায় না, তেমনি ভাবপ্রবণতার উষ্ণ তরঙ্গের প্রতি নিস্পৃহতা প্রদর্শনও সম্ভবপর নয়। অবশ্য উভয়ের প্রয়োগক্ষেত্র নিশ্চিতরূপেই আলাদা। কাজেই যেকাজটি বুদ্ধিবৃত্তির করণীয়, তা ভাবপ্রবণতার হাতে তুলে দেয়া হলে তার ফল নিশ্চিতরূপেই ব্যর্থতার আকারে প্রকাশ পাবে।

কথাটা একটু খোলাসা করে বললে দাঁড়ায় এই যে, কোন লক্ষ্য শুধু বুদ্ধিবৃত্তিই নির্ধারণ করে থাকে। মানুষের কি কাজ করা উচিত আর কি উচিত নয়, এটা পুরোপুরি বিশ্লেষণ করে বলা বুদ্ধিবৃত্তিরই কাজ। পরন্তু এই করণীয় কাজগুলোর মধ্যে কোনটি ভাল আর কোনটি প্রয়োজনীয়, যেগুলো প্রয়োজনীয় তার ক্রম-পরম্পরা কি, তার মধ্যে কোন মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ আর কোন্টি অমৌলিক–এগুলো নিরূপণ করাও বুদ্ধিবৃত্তির কাজ। এ ব্যাপারে যখন সে নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, তখন তার নির্দেশ অনুসারেই বিভিন্ন কাজকে নিজের প্রোগ্রামের মধ্যে স্থান দেয়া প্রতিটি মানুষের পক্ষে অপরিহার্য কর্তব্য। তেমনিভাবে বুদ্ধিবৃত্তি যে জিনিসটিকে জরুরী ও মৌলিক গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করেছে, নিজর জন্যে ঠিক সেটিকেই জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ বলে ভাবতে হবে এবং এ ব্যাপারে ভাবপ্রবণতাকে সামান্য নাক গলাতেও অনুমতি দেয়া যাবেনা। নচেত এমন ব্যক্তিকে সোজাসুজি ভাবপ্রবণ ও আহাম্মক বলেই আখ্যা দেয়া হবে।

কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি যখন নিজেই কর্তব্য সম্পাদন করে এবং গভীর চিন্তা ভাবনার পর একটি জিনিসকে লক্ষ্যবস্তু বলে ঘোষণা করে, তখনকার পরিস্থিতিতে

ভাবপ্রবণতার আগমন ও প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায় কারণ এরপর বাস্তব পদক্ষেপকে ঐ লক্ষ্যস্থলের দিকে ঈপ্সিত গতিতে এগিয়ে নেয়া বুদ্ধিবৃত্তির পক্ষে মোটেই সম্ভবপর নয়। এ কাজ সে ভাবপ্রবণতার সহায়তা পেলেই সম্পাদন করতে পারে। বরং সত্য কথা এই যে, বাস্তব গুরুত্বের দিক থেকে এখানে ভাবপ্রবণতা বুদ্ধিবৃত্তির চাইতেও বেশী অগ্রাধিকার লাভ করে। বিষয়টি এ পর্যন্ত পৌঁছানোর পর প্রকৃতপক্ষে ভাবপ্রবণতাই মানব হৃদয়ে কাজের উদ্দীপনা ও চলার গতিবেগ সৃষ্টি করে। এমনি উদ্দীপনা ও গতিবেগ ছাড়া লক্ষ্যস্থলে উপনীত হওয়াই অসম্ভব। কাজেই ভাবপ্রবণতা যদি কর্মোপযোগী না হয় তো মানুষের কর্ম শক্তিই নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকবে। এমতাবস্থায় লক্ষ্যবস্তুর বড় বড় আকর্ষণ শক্তিও তাকে ধাক্কা মেরে জাগিয়ে তুলতে পারবে না। অন্যকথায় বলা যায়, বুদ্ধি শুধু যাত্রাপথ নির্ধারণ করে এবং ইঞ্জিন ও বগি তৈরি করে। কিন্তু সে ইঞ্জিনকে গতিমান করা এবং লক্ষ্যস্থল অবধি তাকে চালিত করার জন্যে প্রয়োজনীয় স্টীম এই ভাবপ্রবণতাই তৈরি করে। মানব-জীবনের পুনর্গঠনে এবং গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তু অর্জন করার ব্যাপারে ভাবপ্রবণতা এই গুরুত্ব জবরদস্তি অর্জন করেনি, বরং এ হচ্ছে তার এক স্বাভাবিক অধিকার। বুদ্ধিবৃত্তি এই অধিকার মেনে নিতে কখনো অস্বীকৃতি জানায়নি। কাজেই লক্ষ্য নির্ধারণে ভাবপ্রবণতার আশ্রয় না নেয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক, তেমনি লক্ষ্য অর্জনে ভাবপ্রবণতাকে যতদূর সম্ভব বেশী প্রয়োগ করাই হচ্ছে যুক্তি সম্মত–ভাবপ্রবণতা নয়।

বুদ্ধিবৃত্তি ও ভাবপ্রবণতার এই দু'টি আলাদা প্রয়োগ ক্ষেত্রকে সামনে রাখুন। অতঃপর ন্যায়পরতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন যে, বুদ্ধিবৃত্তি এখন পূর্ণ নিশ্চিন্ততার সাথে ইসলামকে আল্লাহর মনোনীত এবং অবশ্য-পালনীয় দ্বীন বলে মেনে নিয়েছে, তখন তার দাবিসমূহ পূরণ করার ব্যাপারে ভাবপ্রবণতার সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করা কি শুধু ভাবপ্রবণতা, না বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক? এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, একে নিছক বুদ্ধিমত্তাই বলা হবে। কাজেই ইসলামের প্রতি ঈমান পোষণ এবং দ্বীন ইসলামের প্রতিষ্ঠাকে নিজের জীবনের কর্তব্য বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও তার জন্যে সক্রিয় হতে টালবাহানা করা বুদ্ধিমত্তা নয়, বরং বুদ্ধি বিক্রয়ের শামিল। অন্যকথায়, এ হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচক্ষণতার নামে বুদ্ধিবৃত্তিরই অপমানের নামান্তর।

ভ্রান্ত নীতির কারণ

আলেচনার এই দিকগুলো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠারপর অনেকের মনে স্বভাবতই এক বিরাট এক প্রশ্ন উদিত হতে পারে। তাহলো এই যে, বিষয়টি যখন এতই সুস্পষ্ট, তখন লোকেরা কেন পরিস্থিতির আনুকূল্য ও প্রতিকূলতার বিতর্কে লিপ্ত হয়? যে

সম্ভাবনা ও অসম্ভাবনার প্রশ্নের ফলে তারা জীবনের পরম কর্তব্যচ্যুত হয়ে পড়েছে, তা কোত্থেকে এসে তাদের মনে স্থান পেল? এর প্রকৃত রহস্য তো আল্লাহই ভাল জানেন। তবে মানবীয় বিচার-বুদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে এই ভ্রান্ত নীতিকে দু'টি মৌলিক বিষয় না বুঝবার ফল বলেই মনে হয়।

প্রথম এই যে, দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠা জীবনের কর্তব্য হওয়া এবং সে কর্তব্য থেকে অব্যহতি পাবার প্রকৃত তাৎপর্য কি?

দ্বিতীয় এই যে, এই কর্তব্যের খাতিরে চালিত সংগ্রামে কামিয়াবির প্রকৃত অর্থ কি?

এ কারণেই এই দু'টি বিষয়কে উত্তমরূপে বুঝে নেয়া হলে এবং মনমানসকে কুরআনের পেশকৃত ছাঁচে ঢালাই করে নিলে যেমন পরিস্থিতির প্রতিকূলতার কোন প্রশ্ন বাকি থাকবে না।, তেমনি সম্ভাবনা ও অসম্ভাবনার তর্কও উঠবে না।

মুমিনের আসল দায়িত্ব

যখন বলা হয় যে, দ্বীন-ইসলামের প্রতিষ্ঠা ঈমানদার ব্যক্তির প্রতি ফরয, তখন তার অর্থ সম্ভবত এই গ্রহণ করা হয় যে, ইসলামী জীবন-পদ্ধতিকে দুনিয়ায় কার্যত প্রতিষ্ঠিত ও প্রবর্তিত করাকেই আমাদের প্রতি ফরয বলা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এটা স্পষ্ট-ভ্রান্তিবোধ ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের প্রতি যে জিনিস ফরয করা হয়েছে এবং আল্লাহর দরবারে আমাদের কাছে যার জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তা দ্বীন-ইসলামকে কার্যত প্রতিষ্ঠিত করা নয়, বরং তা হচ্ছে তার প্রতিষ্ঠার জন্যে নিজের সমগ্র শক্তি দিয়ে সংগ্রাম করা। এই কাজটি যে ব্যক্তি করতে পেরেছে, নিজের কর্তব্যটি (ফরয) সে পুরোপুরিই সম্পাদন করে নিয়েছে। তার কথা যদি একটি লোকও না মেনে থাকে এবং এক অণু পরিমাণ স্থানেও সে সত্য দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পেরে থাকে, তবু এতে কোন ব্যত্যয় ঘটবে না। বস্তুত আল্লাহ মানুষের প্রতি ততটা বোঝাই চাপিয়েছেন, যতটা সে বহন করতে সক্ষম। (لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا) - তিনি কারো প্রতি এমন কোন দায়িত্বই অর্পণ করেননি, যা তার স্বাভাবিক যোগ্যতা, প্রতিভা ও শক্তি-সামর্থের চাইতে বেশী। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি আমাদের কাছে 'তাকওয়া' অবলম্বনের দাবি জানিয়েছেন। কিন্তু তাঁর এই দাবি আমাদের প্রকৃত শক্তির চাইতে এতটুকু বেশী নয়। বরং এ দাবি হচ্ছে আমাদের জন্মগত সামর্থ পর্যন্ত। তাই তিনি বলেছেনঃ

اِتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (تغابن: ١٦)

আল্লাহ তা'আলার তাকওয়া অবলম্বন কর, যতটা তোমরা করতে পার।

কিংবা দ্বীনের শত্রুদের মুকাবিলা করা এবং তাদের শক্তিকে নির্মূল করণার্থে তৈরী থাকার জন্যে মুসলমানদের প্রতি ফরয করা হয়েছে। কিন্তু এর জন্যে তাদের কাছে এ দাবি করা হয়নি যে, যে কোন-প্রকারে শত্রুদের সমর-শক্তির তুল্য শক্তি তাদের অবশ্যই অর্জন করতে হবে। বরং শুধু এটুকু বলা হয়েছে এবং এইটুকুই তাদের প্রতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যেঃ

اَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ .... الخ (انفال)

শত্রুর মুকাবিলা করার জন্যে ততটা শক্তিই সঞ্চয় করে রাখ, যতটা করতে পার।

এমনিভাবে নবী করীম (স)-এর কাছে লোকেরা যখন আনুগত্যের 'বাইয়াত' করত, তখন তিনি তাদের বাইয়াতের ভাষায় নিজের পক্ষ থেকে 'সামর্থানুযায়ী' শর্তটি বাড়িয়ে দিতেন। তাই হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর বলেনঃ

كُنَّا نُبَايِعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُوْلُ لَنَا فِيْمَا اسْتَطَعْتُ (مسلم جلد دوم)

আমরা যখন নবী করীম (স)-এর কাছে আনুগত্যের বাইয়াত করতাম তো তিনি বলতেন যে, এ-ও বল যতটা আমার সামর্থে কুলোবে।

ফলকথা, দ্বীন-ইসলামের একটি সর্বসম্মত নীতি যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বিধান পালনের যে দাবি জানিয়েছেন, তা মানুষের প্রকৃত শক্তিরই সীমা পর্যন্ত–তার চাইতে বেশী মোটেই নয়। কাজেই দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও এ নীতির প্রতি লক্ষ্য থাকবে না, এর কোনই কারণ নেই। লক্ষ্য অবশ্যই থাকবে এবং এ কাজে পরিস্থিতির প্রতিকূলতা, পরিবেশের অসুবিধা এবং উপায়-উপকরণের স্বল্পতা যতটুকু বাধার সৃষ্টি করবে, আল্লাহ তায়ালার তরফ থেকে ততটুকু আনুকূল্য আমরা অবশ্যই পাব। অনুরূপভাবে, বিভিন্ন ব্যক্তির বেলায় ঐ বাধাগুলোর ধরনে যে পার্থক্য হবে, তর প্রতিও পুরোপুরি লক্ষ্য রাখা হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার বিচারালয়ে কেবল ততটুকু জবাবদিহি করতে হবে, যতটুকু তার সংগ্রাম করার শক্তি রয়েছে। এক ব্যক্তি যদি কাজের ভাল উপকরণ এবং পরিবেশের আনুকূল্য থাকা সত্ত্বেও জীবনভর দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার কোন প্রচেষ্টাই না চালায়, তবে কর্তব্য পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন হেতু সে অবশ্যই অপরাধী বলে সাব্যস্ত হবে–কর্তব্যকর্মে এই অমনোযোগিতা সত্ত্বেও বাহ্যিক দিক থেকে সে যতই এগিয়ে যাক না কেন। পক্ষান্তরে এক ব্যক্তি তার তামাম সম্ভাব্য

প্রচেষ্টা নিয়োজিত করল, কিন্তু উপকরণাদির স্বল্পতা ও পরিস্থিতির প্রতিকূলতার কারণে শেষ পর্যন্ত সে কিছুই করতে পারল না–শুধু মঞ্জিলে মকসুদের দিকে দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ করে আপন জায়গায়ই দাঁড়িয়ে রইল। এমতাবস্থায় সে যেখান থেকে যতটুকু চেষ্টা করেছে, তাতেই সে সর্বতোভাবে নিজের কর্তব্য পালন করে গিয়েছে, এতে তিল মাত্র সন্দেহ নেই। এ ব্যাপারে আল্লাহর দরবারে তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই তোলা হবে না। এ কারণেই মুমিনের দায়িত্ব হচ্ছে এই যে, তার যতটুকু শক্তি রয়েছে এবং যেরূপ পরিস্থিতিতে সে বাস করছে, তার পরিপ্রেক্ষিতেই তাকে আপন প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। অতঃপর যে পরিমাণে পরিস্থিতিতে পরিবর্তন ঘটতে থাকবে এবং তার শক্তি সামর্থে পার্থক্য সূচিত হতে থাকবে, তার সংগ্রামের পরিধিও সেই অনুপাতে সঙ্কীর্ণ বা প্রশস্ত করতে হবে।

এই বিষয়টিকে একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বোঝা যেতে পারে। আমাদের প্রতি নামায ফরয করা হয়েছে। এর মধ্যে কিয়াম, রুকু, সিজদা ইত্যাদি কতিপয় জিনিস পালন করা আবশ্যক। এক ব্যক্তি যদি কিয়াম করতে সমর্থ হওয়া সত্ত্বেও বসে বসে নামায পড়ে তো তার নামাযই হয় না। এমন কি, কোন যথার্থ অক্ষমতার কারণে যদি সে বসে বসে নামাজ পড়ে অরে দু'রাকয়াত পড়ার পরই অক্ষমতা দূর হয়ে যায় এবং সে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম হয় তো বাকী রাকায়াতগুলো দাঁড়িয়ে পড়া এবং অক্ষমতা দূর হবার চেতনা আসামাত্রই উঠে দাঁড়ানো তার পক্ষে বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ব্যাপারটিও ঠিক এমনি। যে ব্যক্তির যখন যতটা শক্তি থাকবে, তখন ততটা সংগ্রাম করাই তার পক্ষে আবশ্যক। এর চাইতে বেশী করা না তার দায়িত্ব, আর না এর চাইতে কমের মধ্যে তার মঙ্গল রয়েছে। দুনিয়ায় পুরোপুরিভাবে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রবর্তিত করা হচ্ছে একটি চূড়ান্ত লক্ষ্য (Goal)। এই লক্ষ্য অবধি পৌছবার জন্যে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালানো মুসলমানদের মর্যাদাগত দায়িত্ব আর সে পর্যন্ত পৌছবার জন্যে প্রতিটি মুসলমানের অবশ্যই আন্তরিক কামনা থাকা উচিত। কিন্তু যে কোন উপায়ে সেখানে পৌছানো তার প্রতি বাধ্যতামূলক করা হয়নি। তার প্রতি শুধু বাধ্যতামূলক করা হয়েছেঃ ঐ লক্ষ্যের দিকে সে যতটা এগোতে পারে, ততটাই সে এগোবার চেষ্টা করতে থাকবে।

প্রকৃত ব্যর্থতার অসম্ভাবনা

দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠা যে অবশ্য কর্তব্য এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে এই-ই। আর এই কর্তব্যের খাতিরে কৃত সংগ্রামে কামিয়াবির প্রকৃত অর্থ কি, এর থেকে এ প্রশ্নেরও মীমাংসা হয়ে যায়। এ কথা সুস্পষ্ট যে, নিজের সামর্থানুযায়ী চেষ্টা

করাই যখন আমাদের দায়িত্ব, তখন এ পথে ব্যর্থতার সম্ভাবনা বলে আর কী বাকী থাকে? এ তো হচ্ছে এমন পথ, যা নিজেই পথ আবার নিজেই মনযিল। দুনিয়ার অন্যান্য আন্দোলন ও অভিযানের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তাতে পুরোপুরি চেষ্টা সত্ত্বেও সাফল্য ও ব্যর্থতা উভয়েরই সম্ভাবনা থেকে যায়। কিন্তু দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম হচ্ছে এমন একটি সংগ্রাম, যাতে পুরোপুরি চেষ্টা চালানো হলে ব্যর্থতার কোন সম্ভাবনাই বাকী থাকবে না। কারণ, মুমিন তার শক্তি-সামর্থকে এই কাজে নিয়োজিত করবে এবং তর শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত নিয়োজিত রাখবে তার কাছে তাঁর প্রভুর দাবি এর চাইতে মোটেই বেশী নয়। তার কাছ থেকে হিসাবও এইটুকুরই গ্রহণ করা হবে। তাতে যদি তার আচরণ এ রকম ছিল বলে প্রমাণিত হয় তো খোদার সন্তুষ্টি তাকে পরিবেষ্টন করে নিবে এবং আখেরাতের কল্যাণ লাভে সে ধন্য হবে। কাজেই সে যখন দুনিয়ায় এই প্রচেষ্টার হক আদায় করল, তখন স্পষ্টত সে নিজের জীবন-লক্ষ্য এবং ঈমনের বুনিয়াদী দাবিরই পূরণ করল। সুতরাং নিজের জীবন-লক্ষ্য এবং ঈমানের বুনিয়াদী দাবি পূরণ ছাড়া আর কোন জিনিসটি রয়েছে, যার ব্যাখ্যার জন্যে সাফল্য ও কৃতকার্যতা এই শব্দ দু'টিকে সংরক্ষিত রাখা উচিত?

তবে হ্যাঁ, এ পথে একটি ব্যর্থতা অবশ্যই রয়েছে; আর তা হল নিজের শক্তি সামর্থকে এতে ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হওয়া, নিজের যোগ্যতা অনুসারে সত্য কালেমার সমুন্নতির জন্যে চেষ্টা না করা। এছাড়া এতে আর কোন ব্যর্থতার আশঙ্কা নেই। মুমিন তার সামর্থকে চেষ্টা-সাধনার পথে নিয়োজিত করার পর যে পরিণতির সম্মুখীন হয়ে থাকে, তা সাফল্যের পরিণতি। তার চেষ্টা-সাধনা, নৈরাশ্য ও অকৃতকার্যতা নামক কোন বস্তুর সঙ্গে পরিচিত নয়।

সাফল্যের ইসলামী ধারণা

এ ব্যাপারে যে জিনিসটি মুসলমানদের দৃষ্টিশক্তির আবরণে পরিণত হয়েছে, তা হল দ্রব্যাদির মূল্য নিরূপণের বস্তুতান্ত্রিক নীতি। এইটিই আজ চারিদিকে লোকদের মন-মানসকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে; অথচ একেই কুরআন দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করতে চায়। আজ মুসলমান পর্যন্ত কোন জিনিসের গ্রহণ-বর্জনের বেলায় এই দুনিয়ায় পরিদৃশ্যমান ফলাফল এবং এই জিন্দেগীর নগদ লাভ-ক্ষতিকেই সামনে রাখতে শুরু করছে। এই কারণে এমন প্রচেষ্টাকে তারা নিষ্ফল ও বৃথা বলে মনে করে, যার কোন নগদ ও বস্তুগত ফায়দা প্রকাশ না পাবে। অথচ কুরআন তাকে গ্রহণ ও বর্জনের ভিত্তি এবং সাফল্যের অর্থ অন্য কিছু শিখিয়েছে। তার দৃষ্টিতে মুসলমানদের পরিচয়ই হচ্ছে এই যে, সে আখেরাতের স্বার্থকে দুনিয়ার স্বার্থের ওপর অগ্রাধিকার দান করে এবং নিজের সমস্ত পুঁজিকে

সত্য-প্রতিষ্ঠার পথে নিয়োজিত করার ভিতরেই তার সাফল্য নিহিত বলে মনে করে। এরপর সে প্রথম পদক্ষেপেই সব কিছু খুইয়ে বসুক, আর সারা পৃথিবীতে সত্য দ্বীনের ঝাণ্ডা সমুন্নত করুক–সর্বাবস্থায়ই তার সাফল্য।

প্রয়োজন হলে এ ব্যাপারে কুরআনের স্পষ্ট সাক্ষ্যও পেশ করা যেতে পারে।

মুনাফিকদের এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, রোমের দিগন্তে যে যুদ্ধের ঘনঘটা পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা এই মুষ্টিমেয় মুসলমানকে–যারা তামাম দুনিয়াকে দুশমন বানিয়ে রেখেছিল–পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলবে এবং তাদেরকে একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ করে ছাড়বে। এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে হুকুম দিলেনঃ

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ (توبة)

(ঐ মুনাফিকদেরকে) বলে দাও যে, তোমরা আমাদের জন্যে যে জিনিসটির প্রতীক্ষা করছ, তা আমাদের দু'টি কল্যাণেরই একটি কল্যাণ ছাড়া কিছু নয়।

এই আয়াতে যা কিছু বলা হয়েছে তা গভীরভাবে লক্ষ্যণীয়। এটি স্পষ্টত ঘোষণা করছে যে, মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করা কিংবা পরাজয় ও জীবনপাত করা–উভয়টাই হচ্ছে কল্যাণ ও কামিয়াবির নিদর্শন। আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে তাদের বিজয় ও পরাজয় উভয়টিই হচ্ছে মঙ্গলের (حسنى) পরিচয়বহ। মোটকথা, একজন মর্দে মুমিন যখন আল্লাহর পথে জিহাদ করার মানসে ঘর থেকে বেরোয়, তখন যে কোন প্রকারের সাফল্যের পদক নিয়েই সে ফিরে আসে। নিজের তরবারির বলে শত্রুদলকে পরাভূত করা এবং সত্যের আওয়াজকে সমুন্নত করা নিঃসন্দেহে এক বিরাট সাফল্য। কিন্তু তাই বলে দ্বিতীয় অবস্থাটিকে ব্যর্থতা বলা চলে না। বরং সে যদি তার সমস্ত সঙ্গী-সাথী নিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণও হারায়, তবু একজন মুমিনের প্রকৃত লক্ষ্যানুযায়ী এটিও তার তুল্যমানেরই সাফল্য, বরং প্রচুর ঈর্ষা করার মত সাফল্য। এমনি সাফল্যের মুখে দুনিয়ার সমস্ত সাফল্যই ম্লান হয়ে যায়। এর চাইতে বড় সাফল্যের কথা কল্পনাই করা যায় না।

এ একটি ছোট দৃষ্টান্ত। এটি শুধু মুমিনের ঈমানী জিন্দেগীর একটি বিশেষ দিকের সঙ্গেই সম্পৃক্ত। এই ক্ষুদ্র জিনিসের দিকে আসা যাক। এই শাখাটিকেই মূল কাণ্ড বানিয়ে মুমিনের গোটা ঈমানী জিন্দেগী তথা দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ওপর প্রসারিত করে দেয়া যাক। তা হলেই এ সত্য জানা যাবে যে, হযরত ইয়াহইয়া (আ)-কে এই সংগ্রামের অপরাধে শূলে চড়ানো এবং তিনি এক বিঘত পরিমাণ ভূমিতেও সত্য দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে না পারা সত্ত্বেও আল্লাহর দৃষ্টিতে তিনি ঠিক তেমনি সফলকাম ও কৃতকার্য হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন, যেমন করে মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ (স) এক বিশাল ভূখণ্ডে আল্লাহর দ্বীনকে কার্যত

প্রতিষ্ঠা করে বিদায় নিয়েছিলেন। কিন্তু এই স্পষ্ট রহস্যটিকেও বোঝা ও গ্রহণ করার জন্যে মুমিনসুলভ হৃদয়ই আবশ্যক। সুবিধাবাদী মনোবৃত্তির মধ্যে এই ধরণের 'ভাবপ্রবণ' কথা কোথায় ঠাঁই পাবে?

কার্যত দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার উজ্জ্বল সম্ভাবনা

কিন্তু কামিয়াবির সাধারণ অর্থ অনুসারেও এ কথাপূর্ণ দৃঢ়তার সাথে বলা চলে যে, আজকের দুনিয়ায় এ সংগ্রামের ব্যর্থতার তুলনায় সাফল্যের সম্ভাবনা বেশী। যদি মুসলিম জাতির এক দশমাংশ কি এক-বিংশতিতম অংশও এই মহান কর্তব্য পালনে মন-প্রাণ নিয়োজিত করে এবং এর প্রকৃতির দাবিসম্মত পথ তথা কুরআন, সুন্নাহ ও নবীদের আদর্শানুমোদিত ধারায় নিয়োজিত হয়, তাহলে এই প্রচেষ্টার সাফল্য অন্ধ রজনীর পর দ্বীপ্তিমান সূর্যের উদয়ের মতই সুনিশ্চিত। এব্যাপারে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো এবং এদের দাবিগুলো সম্পর্কে একটু তলিয়ে চিন্তা করলেই আলোচ্য দাবির যথার্থতা খুব সহজেই প্রতিভাত হবে।

১। দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার ভারপ্রাপ্ত ও দায়িত্বশীল লোকদের বিশেষ প্রকৃতি।

২। মানব-প্রকৃতির আসল পছন্দ।

৩। মানুষের বর্তমান চিন্তা, কর্ম ও সামাজিক ক্রমবিকাশ এবং সে বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার মানসিক অস্থিরতা।

সাধারণ লোকেরা কামিয়াবির সম্ভাবনা অনুমান করতে গিয়ে প্রথম পদক্ষেপেই একটি সত্যকে ভুলে বসে। তাহলে এই যে, এ কাজটি কোন নীতিহীন, স্বার্থপর, সঙ্কীর্ণমনা ও নীচদৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের ওপর ন্যস্ত হয়নি, বরং এটি ন্যস্ত করা হয়েছে এমন লোকদের উপর যারা ঈমান পোষণের দাবিদার। অর্থাৎ কুরআনের বক্তব্য অনুযায়ী যারা এক খোদার প্রতি ঈমান পোষণ করে এবং তিনি ছাড়া আর কাউকে উপাসনা ও সন্তুষ্টি লাভের অধিকারী, সত্যিকার আনুগত্য লাভের উপযোগী এবং শক্তি ও ক্ষমতার মালিক মনে না করে; যারা মুহাম্মদ (স)-কে নিজেদের দিশারী বলে মনে করে এবং জীবনের কোন একটি দিকেও তিনি ছাড়া আর কাউকে অনুসরণযোগ্য বলে স্বীকার না করে; যারা আখেরাতকে দুনিয়ার চাইতে হামেশা অগ্রাধিকার দান করে এবং নামায, রোয, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদতগুলো যথারীতি পালন করে; যারা সত্যের সাক্ষী, সততার মুজাহিদ, সুকৃতির প্রচারক, ন্যায়নীতির ঝাণ্ডাবাহী, বাতিলের বিরোধী এবং দৃষ্কৃতির শত্রু; যারা মিথ্যার প্রতি ঘৃণা পোষণ করে এবং যুলুম ও অত্যাচারকে পরিহার করে চলে; যাদের পরিচয় হল এই যে, তারা দুষ্কৃতির দ্বারা এবং অসভ্যতাকে শালীনতা দ্বারা বিদূরিত করে; যাদের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তারা অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে

থাকে; যাদের আচরণ হল এই যে, তারা পরম দুশমনের সঙ্গেও–এমনকি তার হাতে যতই নির্যাতন ভোগ করুক না কেন–কখনো বাড়াবাড়ি ও অন্যায়াচরণ করে না, যারা সর্বাবস্থায় সুবিচার ও ন্যায়পরতার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং গোটা দুনিয়া হাতছাড়া হয়ে গেলেও কখনো নীতিচ্যুত হয় না; যারা অন্যের ইজ্জতকে নিজেদের ইজ্জত বলে বিবেচনা করে এবং অন্যের জান-মালকে কা'বার ন্যায় পবিত্র ও সম্মানার্থ বলে জ্ঞান করে; যারা অন্যের জন্য ঠিক তাই পছন্দ করে, যা নিজের জন্যে পছন্দ করে; যারা এতীম, বিধবা, অক্ষম ও পঙ্গু লোকদের জন্যে শান্তি ও নিরাপত্তার আশ্রয়স্থল; ফলকথা, যাদের জীবন, মৃত্যু, শত্রুতা, ভালবাসা সবকিছুই আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত।

বর্তমানে দুনিয়ায় 'মুমিন'দের কোন দল যদি বর্তমান থাকে, তাহলে তার মানে হচ্ছে এই যে, তার ভিতরে এই গুণরাজিও কোন না কোন পরিমাণে অবশ্যই বিদ্যমান রয়েছে। এই কারণেই যখন দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা পর্যালোচনা করা হয়, তখন এই দলটি এবং তার উল্লিখিত গুণরাজিকে সামনে রেখেই করা উচিত। এই বিষয়টিকে উপেক্ষা করা হলে কখনই নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভবপর নয়। আর এটিকে সামনে রাখা হলে 'অসম্ভব' কথাটি উচ্চারিত হবারও কোন কারণ নেই। চিন্তা করার বিষয়, একটি দল এমনি ঈমানী ও নৈতিক সাজসরঞ্জামে সুসজ্জিত থাকা সত্ত্বেও সে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করতেই পারবে না–তার সম্পর্কে এমনি বিরূপ ধারণা ও নৈরাশ্য কিভাবে পোষণ করা যায়? বিশেষ করে, তার সংখ্যাশক্তিও যখন অস্বাভাবিক রকম বেশী এবং দুনিয়ার অন্য কোন দলের সদস্য সংখ্যা তার অর্ধেক কি এক তৃতীয়াংশও নয়? একথা সত্য যে, যে লোকগুলো নিয়ে এই বিরাট দলটি গঠিত, তার বৃহত্তর অংশ উল্লিখিত গুণরাজি থেকে দূরে সরে গিয়েছে; কিন্তু এই দলটিতে উক্ত গুণবিশিষ্ট লোক একেবারেই অনুপস্থিত, একথা মোটেই সত্য নয়। এখানে আজ এমন লোক একেবারে বিরল নয় অবশ্য সংখ্যার দিক দিয়ে তারা অপ্রতুল। কিন্তু এই ভস্মাবশিষ্ট স্ফুলিঙ্গগুলোই যদি কখনো দুনিয়ায় প্রজ্জ্বলিত হবার সুযোগ পায় তাহলে এই অন্ধকার দুনিয়াকে একদিন তারা আলো-ঝলমল করে তুলবেই।

এবার মানব-প্রকৃতির কথায় আসা যাক। মানুষ তার আসল প্রকৃতির দিক থেকেই কল্যাণকামী। একটি নগণ্য সংখ্যাকে বাদ দিলে সাধারণ মানবগোষ্ঠী সুকৃতির আকর্ষণে আকৃষ্ট হতে পুরোপুরি সমর্থ। খালেছ বাতিল পন্থী ও দুষ্কৃতিকামী লোক–যারা নিজেদের প্রকৃতিকে বিকৃত করার ফলেই এই অবস্থায় এসে পৌঁছে যায়–দুনিয়ায় খুব কমই থাকে। অবশ্য এই মুষ্টিমেয় 'শয়তানই' যখন মানব-জীবনের সামগ্রীক মেশিনারী দখল করে বসে এবং জাতিসমূহের নেতৃত্বের চাবিকাঠি তাদের হাতে চলে যায়, তখন সাধারণ লোকেরা শুধু তাদের

পেছনে চলার কারণেই দুষ্কৃতির মামলায় জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কল্যাণ-কামনার স্বাভাবিক স্পৃহা তাদের ভিতর থেকে একেবারে বিলীন হয়ে যায় না। এই কারণেই আদর্শ এবং বাস্তব উভয় দিক দিয়েই যদি সত্যের আলোক উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত করে তোলা যায়, তাহলে তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক তো কার্যতই তার প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়বে। অন্যান্য লোকদের মধ্যে এতটা সৎসাহস না হলেও অন্তরে তার প্রতি অবশ্য ই সুদৃষ্টিতে তাকাতে শুরু করবে। আর সাধারণ মানুষ তার প্রকৃতির পক্ষে কাম্য জিনিসকে সঠিক আকৃতিতে দেখার পরও তাকে বর্জন করবে এবং তার প্রকৃতির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়, এমন জিনিসকে যথারীতি আঁকড়ে ধরেই থাকবে—এর কোনই হেতু নেই।

এ ব্যাপারে সর্বশেষ লক্ষ্যণীয় এবং অপরিহার্য বিষয় হচ্ছে যুগের বিবর্তনশীল ভাবধারা এবং মানুষের মানসিক অস্থিরতা। অতীত যুগগুলোতে যেমন মানুষের চিন্তাধারাই পরিপক্কতা লাভ করেনি, তেমনি মানুষের গোত্রীয় এবং ধর্মীয় বিদ্বেষ সীমাতিক্রম করে গিয়েছিল এবং হৃদয়ের দরজাকে তারা বাইরের আওয়াজের জন্যে দৃঢ়ভাবে বন্ধ করে রেখেছিল। তাছাড়া প্রচার ও তবলিগের উপায়-উকরণও ছিল নিতান্তই সীমিত। এই সকল কারণে সত্য দ্বীন প্রচারে বাহ্যিক ফলাফল প্রায়ই ব্যর্থতার রূপে প্রকাশ পেত। কিন্তু আজ অবস্থার সম্পূর্ণ পরির্তন ঘটেছে। মানুষ অমূলক বিশ্বাসের অন্ধ অনুসৃতি এবং কুসংস্কার চর্চা থেকে ক্রমশ উর্ধ্বে উঠছে এবং দিন দিন সত্যপ্রতির দিকে এগিয়ে আসছে। যে সব রীতি-নীতি ও মতাদর্শ মানব জীবনের মৌলিক সমস্যাবলীর সন্তোষজনক সমাধান পেশ করতে সমর্থ নয়। বুদ্ধিবৃত্তি ও যুক্তিবাদ সেগুলোকে ছেঁটে দূরে নিক্ষেপ করছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা মানব জাতির বেশুমার ক্ষতিসাধন করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে সে মানব-মনে এমন একটি অবস্থারও সৃষ্টি করে গিয়েছে, যার দ্বারা জীবন-সমস্যার সঠিক, ও সুষম ও সন্তোষজনক সমাধান পেশ করার উপযোগী কোন ধর্ম (দ্বীন) বিরাট ফায়দা হাসিল করতে পারে। এই সভ্যতা মানবীয় মস্তিষ্কের আবরণরূপ কুসংস্কারগুলোর অনেক ভিত্তি-ভূমিকেই ধ্বসিয়ে দিয়েছে এই কুসংস্কারগুলো ধ্বসে-পড়ার ফলে এইগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং নিছক ভাবপ্রবণ বিদ্বেষের চৌহদ্দির মধ্যে বেঁচে থাকবার উপযোগী ধর্মমতগুলোর সুউচ্চ চূড়াও ভূমিসাৎ হয়ে পড়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই সভ্যতার জন্মটা ছিল এক বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লবের ফলস্বরূপ। প্রথমত, বিপ্লবের প্রকৃতিই হচ্ছে চাঞ্চল্যকর! দ্বিতীয়ত, এই বিপ্লবের অবস্থা ছিল এই যে, একে সঠিক পথে চালিত কর্‌বার কোন প্রচেষ্টাও চালানো হয়নি; বরং এর পথকে উল্টো রোধ করা হয়েছে অত্যন্ত নিকৃষ্ট এবং নির্বুদ্ধিতাজনক পন্থায়। এই কারণেই সে নিজস্ব আবেগের টানে কুসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সত্যকেও ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে এবং অন্যান্য ধর্মের ন্যায় খোদ

ইসলামের প্রতিও চ্যালেঞ্জ দিয়ে বসেছে–যা নিজস্ব স্বাভাবিকতা ও যৌক্তিকতার কারণে তার দিশারী হতে পারত। কিন্তু এই ভারসাম্যহীনতার প্রচুর তিক্ত ফল আজ তার ঝাণ্ডাবাহীদের সামনে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই কারণে তারাও ভারসাম্যের দিকে ফিরে আসতে উৎসুক। মোটকথা, এই বিপ্লব লোকদের মন-মানসে যে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করেছে, তা জাহেলী ধর্মীয় বিদ্বেষের বাধনকে অনেকাংশে শিথিল করে দিয়েছে এবং এমন বেশুমার লোক তৈরি করে দিয়েছে, যারা কোন বিষয়কে নির্ভুল বলে উপলব্ধি করার পর তাকে স্বীকার করে নিতে গতানুতিক ধর্মবিশ্বাসের বাধাকে গ্রাহ্য করে না। পরন্তু চিন্তার এই স্বাধীনতা এবং মানসক নির্মলতা ছাড়াও সমকালীন তামদ্দুনিক, অর্থনৈতকি ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ইসলামের জন্যে বহুলাংশে ক্ষেত্র প্রস্তুতকরে দিয়েছে। দুনিয়ার রাজনৈতিক চাবি কাঠি যে দিন থেকে ফাসেক, ফাজের ও খোদাদ্রোহী লোকদের করায়ত্ত হয়েছে এবং তারা খোদায়ী নির্দেশকে অগ্রাহ্য করে জীবন-ব্যবস্থাকে নিজেদের মনগড়া নীতিতে চালাতে শুরু করেছে, সেদিন থেকেই মানুষ ক্রমাগত আপন কৃতকর্মের মন্দফল ভোগ করে আসছে। এর মানে হচ্ছে এই যে, মানুষের মনগড়া তামাম জীবন-ব্যবস্থাই একে একে ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়েছে। শুধু ব্যর্থতাই নয়, তাদের সৃষ্ট জটিলতা এবং তাদের আনীত ধ্বংসযজ্ঞে দুনিয়ার মানবতা আজ চিৎকার করে উঠছে এবং তাদের এই বিপুল ক্ষয়ক্ষতিকে পূরণ করতে পারে, এমন একটি জীবন-ব্যবস্থা তারা ব্যাকুলতার সঙ্গে তালাশ করে ফিরছে।

পরিস্থিতির এই তিনটি উজ্জ্বল দিককেই সামনে রাখুন এবং তারপর ফয়সালা করুনঃ দ্বীন-ইসলামের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর, কি অসম্ভব? বর্তমান পরিস্থিতিটা কি ভয়-ভীতি এবং নৈরাশ্যজনক? যদি তা না হয় তো তারা পূর্ণ নির্ভরতা ও উদ্দীপনার সাথে কেন এগিয়ে আসে না, যারা এই প্রত্যয় পোষণ করে যে, পূর্ণ সত্য শুধু ইসলামের কাছেই রয়েছে এবং জীবন-সমস্যার সুষ্ঠু ও সন্তোষজনক সমাধানও তার কাছে ছাড়া আর কোথাও নেই? সেই সঙ্গে এ ব্যাপারেও যাদের সন্দেহ নেই যে, মানুষ স্বভাবতই কল্যাণকামী এবং খোদার সেরা সৃষ্টি–সে জন্মগত অপরাধী কিংবা দুষ্কৃতির পূজারী নয়। অবশ্য যাদের এই 'প্রত্যয়' গতানুগতিক বিশ্বাসের সীমা অতিক্রম করতে পারেনি, তাদের কাছে থেকে এমনি কোন পদক্ষেপের আশা করাই বৃথা। কারণ এ ধরনের ঈমানদাররা ইসলামের গুণগান ও কল্যাণকারিতা যত গর্ব ও আনন্দের সঙ্গেই প্রচার করুন এবং তার নামে যত প্রশংসা-কীর্তনই করুন না কেন, তাদের এই প্রশস্তিবাদের শিকড় হৃদয়ের গভীর তলদেশে বদ্ধমূল হয় না বলে আমল ও আচরণের বাস্তব ফলও তারা দেখতে পান না। এ ধরনের লোকেরা খোদার দ্বীন সম্পর্কে নিরাশ

হয়ে থাকলে তাদের নিরাশ হওয়াই উচিত। খোদ দ্বীন-ইসলামও তাদের সম্পর্কে নিরাশ। কিন্তু যারা সত্যদ্বীনের ঐ সৌন্দর্য ও যোগ্যতার প্রতি নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচক্ষণতাসহ ঈমান পোষণ করেন, তাদের পক্ষে নিরাশ হবার কোনই কারণ নেই। তারা জানেন–আর না জানলে তাদের জানা উচিত যে, দুনিয়ার সাধারণ অবস্থা এবং মানবীয় অভিজ্ঞতা আজ ইসলামেরই অনুকূল। তাই আজকে শুধু প্রয়োজন হচ্ছে তাদের গোটা চিন্তা ও কর্মশক্তিকে এই কাজে নিয়োজিত ও কেন্দ্রীভূত করা। কারণ দুনিয়াটা হচ্ছে কার্যকারণের দুনিয়া। এখানে যে কাজই সম্পাদিত হয়, তার নির্দিষ্ট ধারায়ই সম্পাদিত হয়। এমন কি, কারো নিজস্ব থালার খাবারও তার মুখে যেতে পারে না, যতক্ষণ না তার জন্যে তার হাত ক্রিয়াশীল হবে। এই কারণেই পরিস্থিতি কোন লক্ষ্য বা আদর্শের পক্ষে যতই অনুকূল হোক না কেন যতক্ষণ না তার জন্যে প্রয়োজনীয় উপায় অবলম্বন ও চেষ্ট-সাধনা করা হবে, ততক্ষণ তা সাফল্যের মঞ্জিলে আদৌ পৌঁছতে পারে না। দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। কাজেই এতসব উজ্জ্বল সম্ভাবনা যথাযথ চেষ্টা ও উপায় তখন অবলম্বিত হবে, কেবল তখনি এতে কামিয়াবি লাভ করা যাবে।

এই উপায় ও প্রচেষ্টা কি? একে দু'টি শব্দে ইসলামের 'আদর্শিক' ও 'বাস্তব-সাক্ষ্য' নামে অভিহিত করা যেতে পারে।

আদর্শিক সাক্ষ্য হচ্ছে এই যে, ইসলামকে বিশ শতকের উপযোগী ভাষায় পরিচিত করাতে হবে। আজকের মন-মানসকে আকৃষ্ট করার উপযোগী যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ্য করে তাকে দুনিয়ার সামনে পেশ করতে হবে। জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে যে সব বিধি-বিধান সে দিয়েছে, সেগুলোকে সমকালীন ভাষায় বিন্যস্ত করে লোকদের সমনে সুস্পষ্ট করে তুলতে হবে। এইভাবে মানবীয় সমস্যাবলীর নির্ভুল সমাধান এবং বিশ্বসমাজের সঠিক পথ-নির্দেশ যে কেবল এই বিধানগুলোর মধ্যেই নিহিত রয়েছে, এ কথা লোকদের জানিয়ে দিতে হবে।

বাস্তব সাক্ষ্য হচ্ছে এই যে, কাজের মাধ্যমে ইসলামের প্রতি প্রত্যয়ের প্রমাণ পেশ করতে হবে। কঠিন থেকে কঠিনতর অবস্থায়ও তার সরল পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া চলবে না। আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে নিজের সম্পর্ককে দৃঢ়তর করে তুলতে হবে। এবাদত-বন্দেগীতে এমন ভাবধারা সৃষ্টি করতে হবে, যাতে করে হৃদয়ের প্রাণ-চেতনা এবং চরিত্রে নির্মলতা প্রকাশ পায়। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উভয় প্রকার লেন-দেন ও কাজ-কারবারে ইসলামের নৈতিক বিধান পুরোপুরি মেনে চলতে হবে। জাতীয়, দেশীয়, বংশীয়, গোত্রীয়, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থের

প্রতি চোখ বন্ধ করে শুধুমাত্র ইসলামের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। জুলুম-পীড়নের জবাবে ন্যায়বিচার ও মার্জনা, দুষ্কৃতির জবাবে সুকৃতি, মিথ্যার জবাবে সত্যপ্রীতি এবং নীতিহীনতার জবাবে নীতিনিষ্ঠার দৃষ্টান্ত পেশ করতে হবে। এভাবে এই চেষ্টা-সাধনা যে শুধু মানবতার কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধানকারী জীবন-আদর্শের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যেই নিয়োজিত একথা প্রমাণ করতে হবে। পরন্তু এই প্রচেষ্টা ব্যাপদেশে প্রয়োজনানুযায়ী নিজের আরাম-আয়েশকে বিদায় জানাতে, নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করতে এবং জীবন ও ধনের কুরবানী দিতে অন্তত ততটুকু সাহসিকতা দেখাতে হবে, যতটুকু কম্যুনিজমের প্রতিষ্ঠায় লেনিন, স্টালিন ও তাদের সমর্থকবৃন্দ, নাৎসীবাদের সাহায্য ও সমুন্নতিতে হিটলার ও তার সহকর্মী নাজীগণ এবং মেকাডোর সন্তুষ্টি বিধানে জাপানীরা ইতোপূর্বে প্রদর্শন করেছে।

আদর্শিক ও বাস্তব সাক্ষ্যদানের এই মহান দায়িত্ব যদি পালন করা হয়–যা অবশ্যই পালন করা যেতে পারে–তা হলে সত্যের যাদুকরী আকর্ষণ-শক্তির দাবি এই যে, এ সংগ্রাম একদিন কমিয়াব হবেই। সেদিন লোকদের হৃদয়ের গ্রন্থি খুলে যাবে, তাদের অন্তর তার প্রতি আকৃষ্ট হবে, তাদের দৃষ্টি তার সামনে শ্রদ্ধায় অবনত হবে এবং দুনিয়া আবার يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا এর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করবে, বস্তুত খোদার সুন্নাতই এ দাবির সাক্ষ্য বহন করে।

আমরা জানি, আজ খোদার দুনিয়ায় মিথ্যা ও বাতিলের প্রভাব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আমরা এ-ও জানি, বাতিল তার চিরস্থায়ী ক্ষমতার ইজারাদারি নিয়ে আসেনি এ দুনিয়ার বৈধ কর্তৃত্বশালীও সে নয়। কারণ খোদার দুনিয়া সৃষ্টিই হয়েছে আসল সত্যের (হকের) বাসভূমিরূপে–বাতিলের জন্যে নয়। কিন্তু সত্যের ঝাণ্ডাবাহীদের গাফলতী ও দায়িত্ববোধহীনতার কারণ যখন এই গৃহ ছেড়ে চলে যায়, তখন মিথ্যার দেবতা একে খালি পেয়ে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে বসে। কারণ এ ঘরের নির্মাতা এর জন্যে এ নিয়মই বানিয়েছে যে, এ কখনো অনাবাদী পড়ে থাকবে না। এই কারণেই এর আসল হকদাররা আবাদ না রাখলে জবর দখল কারির জন্যেই এ নিজের দরজা খুলে দেয়। কিন্তু স্পষ্টত এ একটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতি। একে নেহাত অনন্যোপায় হয়েই এ মেনে নিয়ে থাকে। তাই যখনি এর আসল অধিবাসী নিজের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, তখন খোদার সুদৃঢ় হস্ত ঐ জবরদখলকারিকে একেবারে বিতাড়িত করে ছাড়ে। এ একটি নীতিগত সত্য। এর ভিত্তি কোন খোশ-খেয়ালের ওপর নয় রবং কুরআনের হাকীমের স্পষ্ট ভাষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কুরআন বলেছেঃ

جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا (بنی اسرا ءیل: ٨)

সত্য এসেছে এবং মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। নিঃসন্দেহে মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হবারই জিনিস।

এর থেকে জানা গেল যে, মিথ্যার জীবন হচ্ছে শুধু সত্যের অনুপস্থিত থাকা পর্যন্ত। যখন সত্য আসবে–আসবে না, বরং তার আনয়নকারীরা তাকে নিয়ে আসবে–তখন বাতিল স্বভাবতই জায়গা ছেড়ে দিবে। কাজেই যথাযথ প্রচেষ্টার পরও সত্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় বলে ধারণা পোষণ করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অপবাদ চাপানোরই নামান্তর। যে খোদা মিথ্যার খাতিরে কৃত কুরবানীকেও–যা তাঁর কাছে একেবারেই অপ্রিয়–সফলকাম করে দেন, তিনি সত্যের খাতিরে কৃত কুরবানীকে–যা তাঁর কাছে একান্তই প্রিয়–বৃথা যেতে দেবেন বলে কেউ মনে করেন? অথচ তিনি বারবার এই ওয়াদা করেছেনঃ

وَلَيَنصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنصُرُهٗ (حج : ٤٠)

যারা আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্য করে, তিনি অবশ্যই তাদের সাহায্য করেন।

مَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا (طلاق: ٤)

যে ব্যক্তি খোদাভীতির নীতি অবলম্বন করে, খোদা তার কাজকে সহজ করে দেন।

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهٗ مَخْرَجًا-وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ (طلاق: ٢-٣)

যে কেউ খোদাভীতির পথ অবলম্বন করে, তিনি তাকে পথের সন্ধান বলে দেন এবং তিনি তাকে এমন জায়গা থেকে রেজেক দান করেন, যেখান থেকে তার রেজেক পাবার কল্পনা পর্যন্ত করা হয় না। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা রাখে, তিনিই তার জন্যে যথেষ্ট।

আর এ জন্যেই এই চেষ্টা-সংগ্রামের ফলাফল সম্পর্কে আমাদেরকে তিনি আশ্বাস দিয়েছেনঃ

اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُوْنَ* (مائدة: ٥٦)

জেনে রাখ, আল্লাহর দলই হবে জয়যুক্ত।

পরন্তু একথাও তিনি জানিয়ে রেখেছেন–এবং কোনরূপ ইশারা-ইঙ্গিত নয়, বরং স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন–যে, এ দলটি যখন শত্রুর মুখোমুখি হয়, তখন আল্লাহর গায়েবী সাহায্য তাদের পেছনে থাকে। এমন কি, আসমানের ফেরেশতারা পর্যন্ত তাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করবার জন্যে অবতীর্ণ হয়। আর নিজেদের চাইতে দশগুণ শত্রুর মুকাবিলায়ও তারা জয়যুক্ত হয়ে থাকে। বদর, ওহোদ, খন্দক ও হোনাইনের যুদ্ধে এই ওয়াদাই সত্যে পরিণত হয়েছিল। কাজেই ঐসব যুদ্ধে যে ফেরেশতারা এসেছিলেন, তারা যে কোন জায়গায়ই আসতে পারে–এ প্রত্যয় পোষণ করা উচিত। খোদ কুরআনই বলেছে যে, খোদার বান্দাহ এবং সত্যের মুজাহিদরা যখন ইচ্ছা তাদের ডাকতে পারে। তাই বদর যুদ্ধের ঘটনাবলীর প্রতি আলোকপাত প্রসঙ্গে যেখানে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের অবতরণের বিষয় উল্লেখ করে তাঁর অসাধারণ সাহায্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, সেখানে এই সাহায্য হয়তো সাময়িক ব্যাপার এবং কেবল এই উপলক্ষের জন্যেই এটি নির্দিষ্ট–এই ভুল ধারণারও নিরসন করেছেন। তিনি বলেনঃ

وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ (انفال: ١٠)

এই সাহায্য খাস আল্লাহর তরফ থেকেই এসে থাকে।

এ কথার তাৎপর্য এই যে, বিজয় ও সাহায্য আল্লাহর হাতেই নিবদ্ধ। এটা আজ যেভাবে আছে, কালও ঠিক তেমনি থাকবে। কাজেই ঈমানদার লোকেরা সর্বদাই এই সাহায্য ও সহায়তা অর্জন করতে পারে। তারা যদি 'আল্লাহর সাহায্যকারী' (انصار الله) হবার হক আদায় করে, তা হলে আল্লাহ ও তাদের 'মাওলা' ও 'সাহায্যকারী' হতে বিলম্ব করবেন না।

স্মরণ রাখা দরকার, যে আল্লা সম্পর্কে মুমিনদের এই প্রত্যয় রয়েছে যে, তিনি কখনো মিথ্যা ওয়াদা করেন না এবং যে ওয়াদাই তিনি করেন, তা অবশ্যই তিনি পূর্ণ করেন–এই সব ওয়াদা ও ঘোষণা হচ্ছে সেই আল্লাহর। এই প্রত্যয় থেকে কেউ বঞ্চিত হলে সে মুমিনই নয়–নিজেকে মুমিন দাবি করলে সে মিথ্যাবাদী। এমন কি, যারা দ্বীন-ইসলামের পথে বিপদাপদ দেখে বলত যে, 'আল্লাহ আমাদের কাছে বিজয় ও প্রতিপত্তির ওয়াদা করে আসলে ধোকাবাজি করছেন مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اِلَّا غُرُوْرًا* (احزاب) এদেরকে তাদেরই 'উত্তরসূরী' বললে মোটেই ভুল বলা হবে না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছেঃ এই সব যুক্তি-প্রমাণ ও দৃষ্টান্তের পরও কি দ্বীন-ইসলামের প্রতিষ্ঠাকে অসম্ভব বলা হবে? এরূপ বলা কি অন্তর্দৃষ্টির দৈন্য কিংবা দায়িত্ব পালন

থেকে কাপুরুষসুলভ পলায়নেরই প্রমাণ নয়? কামিয়াবির এত উজ্জ্বল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ দ্বীন-ইসলামের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে নিরাশই থাকে, তাহলে একথা সুনিশ্চিত যে, সে না মুমিনের ভূমিকা পালন করছে, আর না মুমিনসুলভ মানসিকতার পরিচয় দিচ্ছে। সে ভুলে যাচ্ছে যে, নৈরাশ্য ঈমানের নয়, বরং কুফরিরই অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই ধরনের লোকেরা আসলে নিজেদের মনোবৃত্তির যৌক্তিকতা প্রমাণ করার জন্য পরিস্থিতির তথাকথিত প্রতিকূলতাকে বাহানা হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। নচেত কোন পরিস্থিতিতে আল্লাহর দ্বীনের প্রতিষ্ঠা ও প্রবর্তন সম্ভবপর নয়, একথা তাদের বলা উচিত। একথা সুস্পষ্ট যে, সত্য-দ্বীন কায়েম করার প্রচেষ্টা যেখানে এবং যখনই প্রয়োজন হবে, সেখানে এবং সে মুহূর্তে কোন না কোন বাতিল দ্বীন অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত ও প্রবর্তিত থাকবে। কাজেই একথা জানা দরকার যে, সত্য জীবন পদ্ধতির জন্যে নিজের রাজ্য নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ত্যাগ করে চলে যায়, বাতিল পদ্ধতিগুলোর মধ্যে এমন কোন 'সম্ভ্রান্ত' পদ্ধতিটি রয়েছে, যাতে করে তার আগমনের জন্যে প্রতিক্ষা করা যেতে পারে। আর যখন সে এসে সত্য জীবন পদ্ধতির অভিষেকের জন্যে রাজদরবার সুসজ্জিত করে দেবে, তখন আমরা তার "অনুগত' খাদেমরা যেন ধূমধাম ও জাঁকজমকের সঙ্গে তাকে নিয়ে গিয়ে সিংহাসনের ওপর বসিয়ে দিতে পারি। দুনিয়ার গোটা ইতিহাসে এ ধরনের কোন সত্যসন্ধ বাতিল পদ্ধতি কি কখনো পাওয়া গিয়েছে? সত্য দ্বীনের প্রতিষ্ঠার জন্যে যখনি প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে, তখনকার পরিস্থিতি কি এ কাজের জন্যে বাস্তবিকই অনুকূল ছিল? এবং ভবিষ্যতেও কি আমরা এমনি শুভ পরিস্থিতির উদ্ভব হবার আশা পোষণ করতে পারি? ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত রয়েছে, তা তো আল্লাহই ভাল জানেন। কিন্তু অতীতের পরিস্থিতি ও ঘটনাবলীর দর্পণে বাস্তবের রূপরেখা আমরা নিজেরাও পর্যবেক্ষণ করতে পারি। সে সব পরিস্থিতি ও ঘটনাবলী গভীর দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করুন এবং তারপর বলুনঃ হযরত আদম (আ) থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত ইসলামী ইতিহাসের এই সুদীর্ঘ ধারায় দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্যে যত প্রচেষ্টাই চালান হয়েছে তার প্রতটি যুগই কি এ-কাজের জন্যে আজকের চাইতে বেশী অনুকূল ছিল? এর প্রমাণ হিসেবে কি হযরত নূহ (আ)-এর সাড়ে নয়শ' বছরের ইতিহাস পেশ করা যেতে পারে–যখন তাঁর প্রতি শুধু গালি-গালাজ আর ইট-পাটকেল ছাড়া আর কিছুই বর্ষিত হত না? অথবা কি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যুগের দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে–যখন তাঁর দেশে নমরুদের 'খোদায়ী' (Sovereign power) প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিল? অথবা কি হযরত ঈসা (আ)-এর যুগেক এ ধারণার সাক্ষী বলা যেতে পারে–যখন রোমান সাম্রাজ্যের শয়তানী প্রভুত্ব চারদিকে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং মাত্র

কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁকে ফাঁসির হুকুম শুনতে হয়েছিল? অথবা কি শেষ নবী মুহাম্মাদ (স)-এর যুগকে এ দৃষ্টিভঙ্গির স্বপক্ষে পেশ করা যেতে পারে–যখন খোদ তওহীদের কেন্দ্রস্থলটি ৩৬০টি মূর্তির আস্তানা এবং জাহেলিয়াতের রাজধানীতে পরিণত হয়েছিল আর উৎপীড়ন, নির্যাতন, পাথর নিক্ষেপ, সামাজিক বয়কট, হত্যার পরিকল্পনা ইত্যাদির দ্বারা সত্যের দাওয়াতের জবাব দেয়া হচ্ছিল?..... যদি নবীদের আন্দোলনকে কোন অজুহাত তুলে নিজেদের জন্যে অতুলনীয় আখ্যা দেয়া হয়, তাহলে বেশ কিছুটা নীচের দিকেই আসুন। দেখুন মুজাদ্দিদে আলফে-সানির আন্দোলনের যুগ–তখন 'মুসলমান' বাদশাহকে কিভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে দেখা যাচ্ছে। সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী এবং শাহ ইসমাঈল শহীদের যুগের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন–ইসলাম ঝাণ্ডাবাহীদের বুকের উপর ইংরেজ ও শিখ সম্প্রদায় কিভাবে চেপে রয়েছে! কিভাবে দাড়ির ওপর পর্যন্ত ট্যাক্স ধার্য করে নির্যাতনের পরাকাষ্ঠা দেখানো হচ্ছে। এই যুগগুলোর মধ্যে কোন যুগটিকে সত্যের দাওয়াতের দিক থেকে বর্তমান যুগের চাইতে বেশী অনুকূল বলা যেতে পারে? এটা কি সত্য নয় যে, এর প্রতিটি যুগই দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার পক্ষে আজকের চাইতে অনেক বেশী বিপদসঙ্কুল, নৈরাশ্যজনক ও প্রতিকূল ছিল? বস্তুত প্রতিকূলতার দিক বিবেচনা করলে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, সৃষ্টির আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত এই আন্দোলনের পক্ষে অনুকূল একটি শতক–এমন কি একটি ক্ষুদ্রতম যুগ পর্যন্ত কখনো আসেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই যে, এই ধরনের কঠিন এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও কত প্রচেষ্টাই না কামিয়াব হয়েছে। এতদসত্ত্বেও দুনিয়ার সমস্ত ব্যর্থতাকে শুধু এই যুগের জন্যেই কেন নির্ধারিত মনে করা হচ্ছে এবং সমস্ত নৈরাশ্যকে কেন নিজেদের জন্যেই নির্দিষ্ট করে নেয়া হচ্ছে–এটা মোটেই বোধগম্য নয়।

অধিকতর পরিহাসের ব্যাপার এই যে, 'অসম্ভাবনা'র এই ফতোয়াটি কোন বাস্তব অভিজ্ঞতার সমর্থন ছাড়াই জারি করা হচ্ছে। কিন্তু এ কাজের জন্যে যখন সরাসরি কোন প্রচেষ্টাই আমরা চালাইনি, তখন কোন যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে এই 'অসম্ভব' 'অসম্ভব' বলে চিৎকার করা হচ্ছে? আমরা যদি চিন্তা ও কর্মের সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করে এবং নবীদের অনুসৃত পন্থা অনুসারে এই প্রচেষ্টা চালাতাম আর তারপরও লক্ষ্যস্থলের নিশানা পর্যন্ত দেখা না যেত, তাহলে অন্ততঃ এই অভিজ্ঞতাকে অসম্ভাবনার দাবির স্বপক্ষে দলিল হিসেবে পেশ করা চলত। কিন্তু এ এক অদ্ভুত পরিহাস যে, নদীতে আদৌ অবতরণ না করে, কেবল দূরে দাঁড়িয়ে থেকেই তার গভীরতাকে অতলস্পর্শ বলে দাবি করা হচ্ছে। বিশ্বাস করুন, যে মানসিকতা আজকের পরিস্থিতিকেও প্রতিকূল আখ্যা দিচ্ছে এবং এর

বর্তমানে কামিয়াবিকে অসম্ভব বলে অভিহিত করছে–তা কিয়ামত পর্যন্ত কোন সম্ভাবনার মুখ দেখতে শুধু ব্যর্থকামই হবে। তার জন্যে এহেন সংগ্রাম করার মত কোন যুগ আসতেই পারে না। যে বাতিলেল ভয়ে আজ সে কম্পমান, তাই চিরকাল কায়েম থাকবে–শুধু তার আকৃতিতে পরিবর্তন ঘটবে; কিন্তু সত্য দ্বীনের প্রতিষ্ঠার মোকাবিলায় সে বাতিলই থাকবে। সে কখন নিজের যুগে এবং কখন নিজের চেহারায় সত্যকে জীবনের দিশারী ভাববার মত উদার হতে পারে না। কিংবা নির্বিকার চিত্তে তাকে নিজের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সুযোগ দিতে পারে না। বরং সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে যখনি সংগ্রাম করা হবে, সমকালীন বাতিল শক্তি তার সমগ্র শক্তি দিয়ে সামনে এগিয়ে আসবে এবং সম্ভাব্য সকল ফেতনা-ফাসাদ, বিপদাপদ, বাধা-বিপত্তি ও দুঃখ-কষ্ট সত্যপন্থীদেরকে নানাভাবে স্বাগত জানাবার জন্যে তৈরী হয়ে থাকবে। একথা মোটেই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, এ পথ চিরকালই বিষাক্ত, কন্টক আর অগ্নিস্ফূলিঙ্গের ভিতর দিয়ে রচিত হয়ে এসেছে। আর আজ কিংবা ভবিষ্যতে যখনি এ পথ রচিত হবে, তখন এই কন্টক আর অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ভিতর দিয়েই রচিত হবে। যে সম্ভাবনা ও আনুকূল্য আজ সন্ধান করা হচ্ছে, এ পথে পথিকেরা তা কখনই পায়নি আর পেতেও পারে না। কুরআন এ সত্যটিকে এত সুস্পষ্ট ভাষায় বিবৃত করেছে যে, এ ব্যাপারে কোন ভুল ধারণা বা খোশ-খেয়ালের আদৌ অবকাশ নেই। সে বারংবার এ কথা বলেছে যে, ঈমানকে নানারূপ অগ্নি-পরীক্ষা দ্বারা যাচাই-পরখ করা হয়ে থাকে এবং সে আগুনে দগ্ধ করার পর নিজেকে নিখাদ প্রমাণ না করা পর্যন্ত তা আল্লাহর দরবারে মঞ্জুর করা হয় না। এমন কি পরিস্থিতিকে দৃশ্যত অনুকূল এবং নিরাপদ মনে হলেও প্রকৃতি তাতে প্রতিকূল এবং বিপদ-সঙ্কুল করে দিয়ে থাকে–যাতে করে ঈমানী দাবির সত্যতা যাচাই করা যেতে পারে। এই সত্যকে সামনে রাখার পর পরিস্থিতি নিতান্ত প্রতিকূল এবং পরিবেশও অত্যন্ত বিপদ-সংকুল বিধায় দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করা ঠিক নয়–এহেন যুক্তিকে কে মানতে পারে। কুরআনে হাকীমের দৃষ্টিতে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদের মাধ্যমে ঈমানী দাবির পরীক্ষা গ্রহণ অত্যাবশ্যক। কিন্তু তার প্রতি বিশ্বাসীদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, এই পরীক্ষায় তারা কৃতকার্য হয়ে নিজেদের মুমিন হওয়ার প্রমাণ পেশ করার পরিবর্তে উল্টো তাকেই নিজেদের দায়িত্ব পালন থেকে অব্যাহতি লাভের বৈধতার দলিল বানিয়ে নিতে যাচ্ছে। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই যে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কামানের গোলা বর্ষণ ও বোমা বিস্ফোরণের ভয়ঙ্কর আওয়াজ আসছে বলে কোন সৈনিক সেদিকে মুখ ফিরাতেও নারাজ; কিন্তু তা সত্ত্বেও সে মনে করছে যে, তাকে দেশ ও জাতির অনুগত এক কর্তব্য-সচেতন সৈনিক বলা এবং বীরত্বের পদক পাবার উপযুক্ত বলে স্বীকার করা উচিত। অথচ ঐ সম্মানের যোগ্যতা কেবল এই যুদ্ধক্ষেত্র থেকেই অর্জন করা যেতে পারে।

জাতীয় স্বার্থের মূর্তি

এই ব্যাপারে জাতীয় স্বার্থের দোহাইও নেহাত কম বিস্ময়কর নয়। কারণ এ 'দলিল'টির অর্থ এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, যে মুসলমানকে সর্বাবস্থায় ন্যায়পরতার ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার এবং আল্লাহর জন্যে সত্যের সাক্ষ্যদাতা হবার–সে সাক্ষ্যদানে নিজের ব্যক্তিসত্তার, পিতা-মাতার এবং আপন-জনের বিরুদ্ধেই লড়াই করতে হোক না কেন (كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ) –শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং যার সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তার জান ও মালকে জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। (اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى ... الخ) –আজ সেই মুসলমানকেই যেন উপদেশ দেয়া হচ্ছে যে, ন্যায়পরতার পথে চলতে এবং সত্যের সাক্ষ্যদানে যদি তোমার, তোমার পরিবারের বা তোমার জাতির ক্ষতি সাধিত হয়, তাহলে তেমন ন্যায়পরতাকে দেয়ালের ওপর ছুঁড়ে মার আর তেমন সত্যের সাক্ষ্যের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ কর। যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানে তোমার জান ও মালেল ওপর কোন হামলা আসে তো এমন খোদাপরস্তিকে দূর থেকেই সালাম কর! একটু চিন্তা করে দেখুন, জাতীয় স্বার্থের প্রেমে নিজের জীবনের উদ্দেশ্যকেই বর্জন করাটা কি কোন মামুলি খেয়াল মাত্র অথবা এটি এক স্থায়ী মৌলিক আদর্শ–যার ভিত্তির ওপর গড়ে উঠা ইমারত কুরআন বা ইসলামের পরিকল্পিত ইমারত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন? এই মতাদর্শ অবলম্বন- কারী নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দিতে চাইলে দিন; কিন্তু তাকে স্বীকার করতেই হবে যে, সে এমন এক 'মুসলমান', যার দৃষ্টিতে দ্বীন-ইসলাম বা তার প্রতিষ্ঠা নয়, বরং তার আর্থিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ আদায়ই হচ্ছে মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। সে এমন কোন পথ অবলম্বনই করতে পারে না, যে পথের দিকে ইসলাম তীব্রভাবে আহবান জানালেও তাতে তার নিজের কিংবা স্বজাতির কোন পার্থিব স্বার্থ বিপন্ন বলে মনে হবে। কারণ, সে দ্বীনকে দুনিয়ার ওপর, পরকালকে ইহকালের ওপর, খোদার সন্তুষ্টিকে জাতীয় স্বার্থের ওপর–অর্থাৎ জীবন-লক্ষ্যকে জীবনের ওপর কোরবান করে দেয়াকেই বিজ্ঞজনোচিত মনে করে। এহেন মানসিকতাকে কি মুমিন সুলভ মানসিকতা বলে ভাবা যেতে পারে? কুরআন তার অনুগামীদেরকে যে চিন্তাপদ্ধতি শিক্ষা দেয়, এ কি সেই চিন্তাপদ্ধতি? একজন মুমিন ও অনুগামীর মানসিকতা ও চিন্তাপদ্ধতি যদি এমনি হতে পারে, তাহলে আর কোন মানসিকতা ও চিন্তাপদ্ধতিকে আমরা কুফর ও বস্তুবাদের বিশিষ্ট পদ্ধতি বলতে পারি? আমাদের কি এখনো স্মরণ নেই যে, আল্লাহ কার বুকের ভিতর দু'টি অন্তঃকরণ সৃষ্টি করেননি? (مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ (احزاب আর প্রত্যেকের বুকের ভিতর অন্তঃকরণ যখন একটিই, তখন তার মধ্যে যুগপৎ দুই প্রেমিক এবং

দুই 'মাবুদের' আসন কোত্থেকে আসতে পারে? তার মধ্যে শুধু একজনের প্রেমই আসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষমঃ হয় খোদার, নতুবা জাতি বা জাতীয় স্বার্থের। কাজেই হযরত মসীহ (আ)-এর ভাষায় এ জিনিসটিকে খুব ভালোমত বুঝে নেয়া উচিতঃ 'কোন ব্যক্তি যুগপৎ দুই মালিকের খেদমত করতে পারে না কারণ হয় সে একজনের প্রতি শত্রুতা এবং দ্বিতীয়জনের প্রতি ভালবাসা পোষণ করবে, কিংবা এ কজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে এবং অপরজনকে অপদার্থ ভাববে। তোমরা খোদা এবং দৌলত উভয়েরই খেদমত করতে পার না। (মথি, ৬ষ্ঠ অধ্যায়)

ফলকথা, এই মতবাদের সঙ্গে কখনো খোদাপরস্তির সংযোগ হতে পারে না। এ সত্যটি দিবালোকের চাইতেও বেশী উজ্জ্বল। কাজেই জাতীয় স্বার্থের যেরূপ দোহাই পাড়া হচ্ছে, তা এক মারাত্মক ধরনের মূর্তি—একে ভেঙ্গে চুরমার না করলে ইসলামের স্বার্থ কিছুতেই পূর্ণ হতে পারে না।

বস্তুত নবুয়্যতের যুগেও অনেক মুনাফেকের কপটতা ছিল এই স্বার্থপূজারী মানসিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তারা ঈমানের একনিষ্ঠতার দাবির জবাবে বলতঃ

تَخْشٰى اَنْ تُصِيْبَنَا دَائِرَةٌ (مائدة)

আমাদের ওপর কোন বিপদ এসে পড়বে বলে ভয় হয়।

অর্থাৎ আমরা এখলাছের সঙ্গে, পুরোপুরি একনিষ্ঠ হয়ে ইসলামী মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত হলে আমাদেরকে বিপদ-আপদে ঘিরে ফেলবে—গোটা পরিবেশ আমাদের দুশমন হয়ে যাবে। এইভাবে ইসলামের কারণেই আমরা সারা দুনিয়ার চোখে শত্রু বলে গণ্য হব।

অনুরূপভাবে অনেক দুর্বলচিত্ত কাফেরও বলত যে, মুহাম্মদ! তোমার প্রচারিত শিক্ষার সত্যতা আমরা অস্বীকার করিনা; কিন্তু আমাদের এই অসুবিধার প্রতিকার কিঃ

اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا (قصص: ٥٧)

আমরা তোমাদের সঙ্গে খোদায়ী বিধানের অনুগামী হলে (মাতৃ) ভূমির (কোল) থেকে যে আমাদের ছিনিয়ে নেয়া হবে!

সত্য দ্বীনের অনুসৃতির বেলায় এই দু'টি দল যে চিন্তাপদ্ধতি ও যুক্তিধারার আশ্রয় গ্রহণ করেছিল, আজকের জাতীয় স্বার্থের দোহাই কি সে কথাই নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে না? কুরআন পুরোপুরি সত্য, পয়গম্বর সত্যবাদী ও সত্যনিষ্ঠা, ইসলামের সঠিক আনুগত্যই হচ্ছে কল্যাণ ও সৌভাগ্যের একমাত্র পথ—কিন্তু কুরআনের দাবি, রসূলের পথনির্দেশ ও ইসলামের শিক্ষানুযায়ী কাজ

করলেই আমরা বরবাদ হয়ে যাব! আমাদের শুধু আশঙ্কাই নয়, বরং দৃঢ় বিশ্বাস যে, যুগের সমস্ত দূর্যোগ আমাদের ওপর আপতিত হবে। প্রতিটি অণু-পরমাণু পর্যন্ত আমাদের বিরুদ্ধতায় সুদৃঢ় হয়ে দাঁড়াবে। আমরা আর্থিক দিক দিয়ে গোলাম আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অস্পৃর্শ বনে যাব। কিন্তু আফসোস, এটাকি জাতীয় স্বার্থ রক্ষা, না খোদার গযব ডেকে আনা–এ ব্যাপারে এতটুকু চিন্তা করে দেখা হচ্ছে না।

যথার্থ স্বার্থ রক্ষার চূড়ান্ত নিশ্চয়তা

উপরে যা কিছু বলা হয়েছে, তাতে জাতীয় স্বার্থহানির আশঙ্কাকে একটি যথার্থ আশঙ্কা হিসেবেই ধরে নেয়া হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থাটা কি এই ধারণার পরিপোষক? জাতি যদি দ্বীন-ইসলামের প্রতি অনুগত থাকে, তবে কি তাকে দুনিয়া বর্জন করতেই হবে? কুরআন মজীদ বলছেঃ না, তা মোটেই নয়। বরং প্রকৃত অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব যদি যথাযথ পালন করা হয়, তবে তার দ্বারা শুধু আখেরাতেরই মঙ্গল হবে না, বরং এ দুনিয়াও তার ফলে আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠবে। দুনিয়ার প্রগতিশীল ও উচ্চাভিলাসী জাতিগুলোর যেসব জিনিসের অন্বেষণ ও আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে থাকে, তার কোন একটি জিনিস থেকেও সে বঞ্চিত হবে না। তাই কুরআন সেই সব ইপ্সিত ও আকাঙ্ক্ষিত জিনিসগুলোর মধ্য থেকে এক একটি জিনিসের নামোল্লেখ করে 'প্রত্যয়শীল' মুমিনদের জন্যে তা অবধারিত বলে সুসংবাদ দিচ্ছে। উদাহরণত বলা যায়, সম্মানজনক শান্তি ও নিশ্চিন্ততার জীবন হচ্ছে সত্যিকার জাতীয় স্বার্থের মধ্যে একটি গুরুত্বপুর্ণ স্বার্থ। কুরআন এ সম্পর্কে বলেছেঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ (انعام: ٨٣)

যারা ঈমান এনেছে এবং (তারা) নিজেদের ঈমানকে শের্কের দ্বারা আচ্ছন্ন করেনি, তাদের জন্যেই রয়েছে শান্তি ও নিরাপত্তা।

এমনিভাবে আর্থিক উন্নতি সম্পর্কে কুরআন মহামহিম আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এরশাদ করছেঃ

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ (اعراف: ٩٦)

বস্তিবাসীরা যদি ঈামন পোষণ করত এবং তাকওয়ার পথ অনুসরণ করত, তবে আমরা তাদের জন্যে আসমান ও জমিন থেকে বরকতের দরজা খুলে দিতাম।

وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ (مائدة)

এই আহলে-কিতাবরা যদি তওরাত, ইঞ্জিল এবং তাদের প্রভুর তরফ থেকে অবতীর্ণ বিধানকে কায়েম করত, তাহলে নিজেদের (মাথার) ওপর এবং পায়ের তলা উভয় দিক থেকেই রেজেক পেত।

রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও সমুন্নতি সম্ভবত জাতীয় স্বার্থের মধ্যে সবচাইতে গুরুত্ব-পূর্ণ। এ সম্পর্কে কুরআন আল্লাহ তায়ালার তরফ থেকে এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেঃ

اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُوْنَ* (انبياء: ١٠٥)

নিঃসন্দেহে, আমার সৎ বান্দারাই পৃথিবীর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব পেয়ে থাকে।

اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ* (ال عمران: ١٣٩)

তোমরাই জয়যুক্ত হবে, যদি তোমরা ঈমানদার হও।

এমনিভাবে পৃথক-পৃথক নিশ্চয়তা বিধান ছাড়াও এক জায়গায় সে ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ নিশ্চয়তার বাণীও শুনিয়েছেঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا (نور: ٥٥)

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং (তদনুযায়ী) সৎকাজ করেছে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তাদেরকে তিনি পৃথিবীর কর্তৃত্ব দান করবেন—যেভাবে তোমাদের পূর্বেকার লোকদেরকে তিনি দান করেছিলেন। আর যে দ্বীনকে তিনি তাদের জন্যে মনোনীত করেছেন তার শিকড়কে গভীর তলদেশে বদ্ধমূল করে দিবেন এবং তাদের ভয়-ভীতিকে শান্তি ও নিরাপত্তা দ্বারা বদলে দিবেন।

এবার এই কথাটিকেই নেতিবাচকরূপে দেখুনঃ

لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ (مائدة: ١٠٥)

তোমরা যখন সোজা পথে চলবে, তখন বিপথগামী লোকেরা তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না।

কুরআন মজীদের এই সকল প্রতিশ্রুতি এবং তার এই নিশ্চয়তাগুলো সবার সামনে রয়েছে। ইসলামী জীবন ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার (اقامت دين) কথা শোনামাত্রই জাতীয় স্বার্থের তথাকথিত সংরক্ষকদের ওপর যে সর্বনাশের ভয়টা চেপে বসে, এর আলোকে তার রহস্যটাও প্রকট হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় এ ধরনের প্রচেষ্টা মুসলিম স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিবে–এখনো কি এই ঈমান-ধ্বংসী খামখেয়ালীকে কোন গুরুত্ব দেয়া যেতে পারে? অথবা তার বিপরীত এই বিশ্বাস করাটা জরুরী হয়ে পড়ে যে, ঈমান ও সৎকাজের সাহসিকতাপূর্ণ কর্মনীতি অবলম্বন করে কার্যত এই কর্তব্য যদি সুষ্ঠুভাবে পালন করা হয় তো জাতীয় স্বার্থ–যাকে যথার্থই জাতীয় স্বার্থ বলা চলে–হিসেবে বিবেচিত প্রতিটি জিনিসই আমরা নির্ঘাত পেয়ে যাব?

কিন্তু কোন হতভাগ্যের যদি ঈমানের প্রভাবশক্তি সম্পর্কেই সন্দেহ থাকে এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতিশ্রুতির ওপর কোন বিশ্বাসই না থাকে আর এতদসত্ত্বেও সে নিজেকে মুসলিম জাতির ব্যাপারে কথা বলার অধিকারী মনে করে, তবে সে নিতান্তই জবরদস্তি করছে বলতে হবে। একথা নিঃসন্দেহ যে, এহেন লোকদেরকে কোন বৃহত্তম দলিল-প্রমাণও ভীতি ও নৈরাশ্যের পক্ষ থেকে উদ্ধার করতে পারে না। এদের দৃষ্টিতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার (اقامت دين) সংগ্রাম তো এই প্রচেষ্টার ফলে সম্মান, সৌভাগ্য, শান্তি ও সমৃদ্ধি লাভ করতে হলে অনেক কষ্ট-ক্লেশ ও কুরবানী স্বীকার করতে হবে। এ জন্যে প্রথম দিকে জাতিকে কিছুটা হারাতেও হবে, সন্দেহ নেই। কিন্তু স্পষ্টত এমনি কষ্ট-ক্লেশ শুধু এই লক্ষ্য-পথেই আসে না বরং এ ধরনের প্রতিটি বৃহৎ লক্ষ্যের জন্যেই এমনি কুরবানী ও কষ্ট-ক্লেশ স্বীকার করতে হয়। আর যাকে কিছু পেতে হয়, তাকে পূর্বে কিছুটা হারাতেও হয়। একজন কৃষক যদি বীজ বোনার কালে প্রয়োজনমত তার টাকার থলেটিও শূন্য করে থাকে, তবেই সে ফসল তোলার কালে তা পূর্ণ করার আশা করতে পারে। এই কারণেই জাতির স্বার্থের ফসল যদি তুলতে হয় তো তার পূর্বে বীজ বোনার খরচপত্র এবং অন্যান্য জরুরী কষ্ট-ক্লেশ বরণ করতে হবে। এইটুকু পর্যন্ত স্বার্থহানি (?) হবার শুধু আশঙ্কাই নয়, বরং নিশ্চিত সম্ভাবনা। কিন্তু কয়েকটি পয়সার বিনিময়ে টাকার তোড়া লাভ করাটা কি কোন অলাভজনক কাজ? আর একে কি স্বার্থহানি বলে অভিহিত করা যাবে? না উৎকৃষ্টতর স্বার্থলাভ এবং তার সর্বোত্তম নিরাপত্তা ব্যবস্থা বলা যাবে?

পেঁচালো পথ

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, প্রতিকূল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই লক্ষ্যে পৌছুনোর জন্যে কি আমরা সরাসরি প্রচেষ্টার পরিবর্তে কোন পেঁচালো পথ অবলম্বন করতে

পারি? এর জবাব কিছুতেই ইতিবাচক হতে পারে না। বিচারবুদ্ধি একে সমর্থন করে না, সত্যপ্রকৃতি একে স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়, আর আজ পর্যন্তকার ইতিহাস থেকেও এর কোন প্রমাণ মেলে না। বস্তুত এই লক্ষ্যকে যথার্থভাবে নিজের জীবন-লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণাকারী কোন ব্যক্তি বা দল এমনি নীতি অবলম্বন করেছে, এমন একটি নজির কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই আন্দোলন সুসভ্য ও অসভ্য, আজাদ ও গোলাম, বিত্তবান ও বিত্তহীন–এককথায় সব রকম জাতির মধ্যেই চলে আসছে। আর সব রকম পরিস্থিতির মধ্যেই নবীগণ দুনিয়ায় এসেছেন। কিন্তু এখানে আসার পর সবার মুখ থেকেই প্রথম যে আওয়াজটি বেরিয়েছে, তা ছিল এইঃ

أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ (نحل: ٣٦)

(হে মানুষ!) খোদার দাসত্ব স্বীকার কর এবং খোদাদ্রোহী শক্তি (তাগূত) থেকে দূরে থাক।

ইতিহাসের পাতা তন্নতন্ন করে খুঁজলেও খোদার কোন নবীকে এই সরল নীতি বর্জন করে কোন পেঁচালো নীতি অবলম্বন করতে দেখা যাবে না। তাঁরা এরূপ কর্মনীতি কেন গ্রহণ করেছিলেন, এ প্রশ্নটা আপাততঃ ছেড়ে দিন! প্রথমে এই সত্যটি খুব ভালোমত যাচাই করে নেয়া দরকার যে, এ রকম ঘটনা আদপেই ঘটেছিল কিনা! যদি এ-রকমই ঘটে থাকে যেমন কথিত আছে–তাহলে নবীদের আদর্শকে যারা নিজেদের চরম লক্ষ্যবস্তু বলে স্বীকার করেন, তাদের পক্ষে এই কর্মনীতি পরিত্যাগ করা কোন শরয়ী দলিলের ভিত্তিতে জায়েজ হতে পারে? যদি কালগত পার্থক্য কোন গুরুত্বপুর্ণ জিনিস হয়ে থাকে, তবে একথা কি দাবি করা যেতে পারে যে, সমস্ত নবীর জীবন-কাল একই ধরনের ছিল? যার ফলে তাঁদের সবার কর্মনীতিতেই এক পূর্ণাঙ্গ সাদৃশ্য ও সাধর্ম লক্ষ্য করা যায়? আর এই বিশ শতকের যুগধর্মটা এমন এক যুগধর্ম, যা আজ পর্যন্তকার গোটা মানবেতিহাসে যুগধর্ম থেকে অকস্মাৎ ভিন্ন হয়ে গিয়েছে? নিঃসন্দেহে, কোন বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকই এরূপ দাবি করতে পারে না। সবাই জানেন যে, দুনিয়ার এমন কতগুলো মৌলিক সত্য রয়েছে, যা কখনো পরিবর্তিত হয় না। এই সত্যগুলো সকল যুগেই সমানভাবে ক্রিয়াশীল রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। কেবল বাহ্য অবস্থা এবং সাময়িক লক্ষ্যণাদিই প্রত্যেক যুগের পৃথক-পৃথক হয়ে থাকে এবং আগামীতেও হতে থাকবে। এই সকল বাহ্য বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য করা হলে আজকের যুগটা যেমন হিজরী প্রথম শতক থেকে ভিন্ন, তেমনি প্রথম শতক ঈসায়ী যুগ থেকে এবং ঈসায়ী যুগ মুসার যুগ থেকে অবশ্যই ভিন্ন ছিল। এহেন কালগত পার্থক্য সত্ত্বেও যদি সমস্ত নবী সমানভাবে হামেশা সরাসরি আন্দোলনেরই নীতি অবলম্বন

করে থাকেন, তবে আমাদের ও পরবর্তী যুগের মধ্যকার এই পার্থক্য সত্ত্বেও এই নীতি গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। কারণ এই কাজের জন্যে অন্য কোন নীতি কখনো অবলম্বিতই হয়নি। পরন্তু সমস্ত নবী কর্তৃক এই কর্মনীতি গ্রহণ এ সত্যেরই সাক্ষ বহন করে যে, এ আন্দোলনের প্রকৃতিই সরাসরি পদক্ষেপ করার দাবি জানায়। এই দলিলটি আমাদেরকে যদি এর মধ্যে নবীদের ইতিহাস থেকে এই সাক্ষ্যটিকে শামিল করে দেয়া যায় যে, অনেক নবী পেঁচালো নীতি অবলম্বনের সর্বোত্তম সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও পূর্ব সততা ও নিশ্চিন্ততার সাথে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। খোদ নবী শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সামনে কোরাইশদের যে-প্রস্তাবের (offer) কথা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, তা এই কর্মনীতির পক্ষে কিরূপ সূবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছিল ভেবে দেখুন। কোরাইশরা বলেছিলঃ আমরা আপনাকে আমাদের বাদশাহ রূপে বরণ করছি। এ জন্যে আপনি আপনার 'তওহীদী দাওয়াত' থেকে বিরত হোন, এ দাবিও আমরা করছি না। আপনার কাছে আমাদের শুধু এইটুকু নিবেদন, যে, আপনি আমাদের মূর্তিগুলোর নিন্দাবাদ ও তুচ্ছজ্ঞান এবং আমাদের পৈত্রিক ধর্মের ক্রুটি নির্দেশ করবেন না।–আজকের রাজনীতিক ও রাষ্ট্রনায়কদের দৃষ্টিতে এই প্রস্তাব ছিল নিঃসন্দেহে এক অপ্রত্যাশিত নেয়ামত। আর একে প্রত্যাখ্যান করার বিষয়ে কিছু চিন্তা করাও স্পষ্ট হারামের চাইতে কম ছিল না। এরা যদি পরামর্শ দেবার সুযোগ পেতেন তো এই পরামর্শই দিতেন যে, আপনি অবিলম্বে এই প্রস্তাব গ্রহণ করুন। এতে করে একদিকে আপনি এবং আপনার অনুবর্তীদের ওপর আপতিত দুঃখ-ক্লেশ ও বিপদাপদের সমাপ্তি ঘটবে, অপরদিকে হেজাজ-সিংহাসন দখল করার পর আপনি আপনার বিজ্ঞজনোচিত প্রভাব-প্রতিপত্তিকে কজে লাগিয়ে 'বিচক্ষণতার' সঙ্গে দ্বীন-ইসলামের শিকড়ও বদ্ধমূল করতে পারবেন। এমন কি, ধীরে ধীরে গোটা আরবের ওপর তার কর্তৃত্ব বিস্তার লাভ করবে। কিন্তু আপনারা জানেন, বিশ্বনবী এই 'সুবর্ণ' সুযোগের মুকাবিলায় কী কর্মনীতি অবলম্বন করেছিলেন। এবং এই প্রস্তাবের কী জবাব দিয়েছিলেন। তা ছিল এইঃ

ما جئت بما جئتم به اطلب اموالكم ولا اشرف ولا املك عليكم فبلغتكم سالات ربى ونصحت لكم فان تقبلوا فى ما جئتكم به فهو حظكم فى الدنيا و الاخرة تردوه على اصبر لامر الله حتى يحكم الله بينى وبينكم (ابن هشام ١)

আমি তোমাদের কাছে যে পয়গাম নিয়ে এসেছি, তার সাহায্যে তোমাদের ধন-মাল অর্জন করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিংবা পদ-মর্যাদার অধিকারী হওয়া

বা তোমাদের বাদশাহী লাভ করাও আমার লক্ষ্য নয়। বরং আমি তোমাদের কাছে আপন প্রভুর পয়গাম পৌঁছিয়ে দিয়েছি এবং তোমাদের প্রতি শুভাকাঙ্খার হক আদায় করেছি। এবার তোমরা যদি আমার দাওয়াত গ্রহণ কর তো দুনিয়া ও আখেরাত সর্বত্র তা তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর প্রমাণিত হবে। আর যদি তা প্রত্যাখ্যান কর তো আল্লাহ আমার এবং তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেয়া পর্যন্ত আমি পূর্ণ দৃঢ়তার সঙ্গে আপন মনে কাজে নিয়োজিত থাকব।

এটা কোন ভাবাবেগের স্রোতে ভেসে চলা বিপ্লবী যুবকের উক্তি ছিল না, বরং এ ছিল বিচারবুদ্ধি ও কর্মকুশলতার এমন শিক্ষাদাতার উক্তি, যার অন্তর ও মুখের ওপর খোদায়ী নিয়ন্ত্রণ আরোপিত রয়েছে বলে আমরা বিশ্বাস করি এবং যিনি ভাবাবেগের আতিশয্যে কখনো কোন কথা বলেননি। এই কারণেই একজন মুমিন এরূপ কল্পনাকে কাছেও ঘেঁষতে দিতে পারে যে, হযরত (স) এই প্রস্তাবের তাৎপর্য বুঝতে পারেননি এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্যে সংগ্রামের পথ অপেক্ষা বেশী উপযোগী ও কার্যকরী একটি কর্মপন্থা হাতে পেয়ে স্বেচ্ছায় তাকে পরিহার করেছেন। কিংবা আজকের তথাকথিত রাজনীতিকদের ন্যায় তাঁর মধ্যে পরিবেশ ও যুগের দাবি উপলব্ধি করা এবং তার পরিণতিতে উক্ত কর্মনীতি অবলম্বন করার মত যোগ্যতাই (নাউজুবিল্লাহ) ছিল না–এমন ধারণা করাও কোন মুসলমানের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই তিনি যদি সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও সত্যের দাওয়াত ও ইসলামী জীবনধারা প্রতিষ্ঠার (اقامت دين) সরাসরি পন্থা পরিহার না করে থাকেন তো এই উদ্দেশ্যে পেঁছালো পন্থা অবলম্বন করা অন্য কোন 'বিচারবুদ্ধি ও কর্মকুশলতা' অনুযায়ী হয়তো বা সঙ্গত হতে পারে, কিন্তু নবীর বিচারবুদ্ধি ও কর্মকুশলতা অনুযাযী আদৌ বৈধ হতে পারে না–এটা এ কথারই চূড়ান্ত প্রমাণ।

নিছক বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে দৃষ্টিপাত করলেও এই চিন্তা-পদ্ধতি ও মতবাদের মধ্যে বাহানা সন্ধান, খোশ-কল্পনা ও আত্ম-প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাবে না। পেঁচালো পন্থা অবলম্বনের মানে তো হচ্ছে এই যে, একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সত্যকে মিথ্যার বেশে পেশ করা হবে এবং সে মিথ্যার মধ্যে মুসলমানরা পরিবেষ্টিত, তার থেকে বেরিয়ে সত্যের পানে ছুটবার পরিবর্তে অপর এক মিথ্যার ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াবে। কারণ সে যদি বর্তমান মিথ্যা ব্যবস্থাকে চুরমার করে অপর কোন সত্য বিবর্জিত ব্যবস্থা কায়েম করার চেষ্টা করে, তবে তা অবশ্যই মিথ্যা হবে। তার বর্ণ-গন্ধ অবশ্য নতুন হবে, কিন্তু তার মূল প্রকৃতি হবে বর্তমান মিথ্যারই অনুরূপ। কেউ কেউ বলে থাকেন যে, আমরা পরিবেশের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তাকে তুলনামূলকভাবে বেশী অনুকুল বানিয়ে নেব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাস্তব দুনিয়ায় এহেন খামখেয়ালীর কোনই মূল্য নেই।

কারণ মিথ্যা যে মূর্তিই ধারণ করুক না কেন, তা সত্যের পক্ষে কখনো অনুকূল হতে পারে না। তাতে যদি সত্যের কিছু জোড়াতালি লাগিয়েও নেন, তবুও তা আপনার মূল লক্ষ্যের জন্যে নির্ভেজাল মিথ্যার চাইতে কিছুমাত্র কম ক্ষতিকর হবে না। বেশী দূরে যাবার দরকার নেই—এই ভারতবর্ষে (অবিভক্ত) অনেক 'ইসলামী রাজ্যই কায়েম রয়েছে।' আপনারা ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় যেসব বিষয় শামিল করতে চান, এই সকল রাষ্ট্রে কম বেশী তার প্রায় সবই বর্তমান রয়েছে, কিন্তু সেখানে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার নামোচ্চারণই করে দেখুন না। জীবন আপনার অতিষ্ঠ না হয়ে কিছুতেই পারবেনা। আপনারা এই সংগ্রামে বিদেশী শাসনকেই শুধু অন্তরায় বলে মনে করেন এবং এই কারণেই তা অপসারিত হবার অপেক্ষায় আছেন। কিন্তু সম্ভবতঃ আপনারা ভুলে গিয়েছেন যে, হযরত ঈসা (আ)-এর মিশন সম্পর্কে রোমান শাসকরা নীরব ছিল; কিন্তু তাঁর নিজ জাতি—কিংবা বলা যায়, তখনকার 'মুসলমানরাই' সামনে এগিয়ে তার টুঁটি চেপে ধরে। তারপর নিজেদের সাম্প্রতিক ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করুনঃ শায়খ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর ইসলামী আন্দোলনকে সংশ্লিষ্ট 'ইসলামী' রাষ্ট্রগুলো কিরূপ 'সাদর' সম্বর্ধনা জানিয়েছিল? শায়খ জামালুদ্দিন আফগানীর আন্দোলন মোটামুটি ইসলামী আন্দোলনই ছিল, কিন্তু আজকের এই 'ইসলামী' রাষ্ট্রগুলোই তাকে থাকবার জায়গা পর্যন্ত দিতে অস্বীকার করেছিল। আজো যদি কারো হিম্মত থাকে তো ঐ সকল দেশের এই আওয়াজ তুলে পরিস্থিতিটা যাচাই করে দেখতে পারেন।[১]

প্রকৃতপক্ষে এ হচ্ছে টাল-বাহানার কথা। অন্য কথায়, যে মানসিকতার কারণে লোকেরা কুরআনী দাওয়াতের জবাবে পরিস্থিতির 'প্রতিকূলতা'য় ভীতিবিহ্বল হয়ে নবী করীম (স)-এর কাছে বিকল্প পন্থা দাবি করত, এ হচ্ছে তারই ফল। এমনি মানসিকতসম্পন্ন লোকেরাই নবী করীম (স)-এর কাছে দাবি করতঃ ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ অর্থাৎ এর পরিবর্তে অপর কোন কুরআন নিয়ে আসুন। কিংবা এর ভিতরেই কিছু সংশোধন করে দিন—যাতে আমাদের কামনা-বাসনা ও যুগধর্মের সাথে তা সুসমঞ্জস্য হতে পারে। এই ধরনের চিন্তা যারা করেন, তারা সম্ভবত এই সত্যটির প্রতি দৃষ্টিপাতই করেন না যে, দুনিয়ার প্রতিকূলতা আজ যেমন আছে, কালও তেমনি থকবে। আর যেসব

১. এই কথাটি যখন লেখা হয়, তখনো 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'র ভিত্তি ভূমির ওপর খোদাদাদ রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্ম হয়নি। কিন্তু জন্ম হবার পর তার খোদাবিমুখ শাসকরা তথাকার ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে এবং ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যা' তারা করতে পারেনি, তা' সবার সামনে রয়েছ। এমনিভাবে মিসরের সামরিক সরকার তথাকার ইসলামপন্থীদের সঙ্গে যে পাশবিক আচরণ করেছে, তা' এই অপ্রিয় সত্যের সবচাইতে উজ্জ্বল ও শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্ত।

অজুহাত ও অসুবিধা আজকে তাদের পথরোধ করে দাঁড়াচ্ছে, আগামীতেও তা কিছুমাত্র হ্রাস পাবে না। এই কারণেই এ কর্মনীতির ফল শুধু এই দাঁড়াবে যে, পেঁচালো পন্থা অবলম্বনের কার্যকারণগুলো যেমন দূরীভূত হবে না, তেমনি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে সরাসরি সংগ্রাম করার সুযোগও কখনো আসবে না।[১]

১. এ কথাটি যখন লেখা হয়েছিল, তখন এটিও নিছক একটি অনুমান মাত্রই ছিল। কিন্তু দেশ ভাগের পর থেকে আজ পর্যন্তকার ইতিহাস একেও একটি বাস্তব সত্য প্রমাণ করেছে। আজাদীর পূর্বে আমাদের বিশ্ব বিশ্রুত ধর্মগুরু ও রাষ্ট্রনীতিকরা অত্যন্ত মুরুব্বীয়ানার ঢঙে বলতেন যে, বর্তমানে এখানে ইংরেজরা আসন গেঁড়ে বসে আছে; প্রথমে তাদেরকে বিতাড়িত কর, তারপরে আজাদ পরিবেশে বসে একাগ্রতার সঙ্গে এ কাজ করা যাবে। কিন্তু আজকে আজাদীর উন্মুক্ত পরিবেশে বসেও সেই সব 'পবিত্র জবান' এমনি স্তব্ধ হয়ে আছে যে, বর্তমান তো দূরের কথা, দূরভবিষ্যত সম্পর্কেও কোন সান্ত্বনার বাণী শোনা তাঁদের সাহস হচ্ছে না। ইতিহাসের কী নির্মম পরিহাস।

সম্পূর্ণ ও চিরস্থায়ী নৈরাশ্য

বিস্ময়কর নির্লজ্জতা

তৃতীয় দলের কথা, তার চিন্তা-পদ্ধতি এবং তার যুক্তি-প্রমাণ প্রায় তা-ই, যা পূর্ববর্তী আলোচনায় দ্বিতীয় দলের জবানীতে বলা হয়েছে। এই কারণেই তার পুনরুল্লেখ করা এবং তার ভ্রান্তি তুলে ধরবার কোন প্রয়োজন নেই। অবশ্য একটা দিক থেকে এরা দ্বিতীয় দল থেকে নিশ্চিতভাবেই ভিন্ন; আর তা হলো এই যে, লক্ষ্য-বিস্মৃতি ও কর্তব্যচ্যুতির যে ব্যধি সেখানে রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও যুগোপযোগী কর্মনীতির আবরণে ঢেকে দেয়া হয়েছিল এখানে তা স্পষ্টবাদিতা ও দুঃসাহসিকতার সঙ্গে প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে। এই কারণে এদের ভিতর ও বাইরে সাদৃশ্য ও অনুরূপকে স্বীকার করতেই হবে। অবশ্য এই স্পষ্টবাদিতা ও দুঃসাহসিকতার পেছনে যে ঈমানী নির্লজ্জতার ধারণা ক্রিয়াশীল রয়েছে, তা' অন্তরে খুবই আঘাত হানে। মনে হয়, এই লোকগুলো যেন আপন দেহ থেকেই লজ্জাবরণ খুলে ফেলে দিয়েছে। এদের কয়জনে এই লজ্জা সজ্ঞানে ও সচেতনভাবে বিসর্জন দিয়েছে, আর কয়জনে দিয়েছে অবহেলায় ও অচেতনভাবে তা খোদাই ভাল জানেন। একদিকে ইসলামী জীবন–ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার এই গুরুত্বের প্রতি–যা ছাড়া মুসলমানের কোন মর্যাদাই বাকী থাকে না–লক্ষ্য করুন, অন্যদিকে এই ভদ্রলোকদের কথা শুনুনঃ এ লক্ষ্যটা তো নিঃসন্দেহে মহৎ কিন্তু খোদ পয়গম্বর থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরা যখন এ মিশনকে ত্রিশ বছরের বেশী চালাতে পারেননি, তখন আমাদের মত দুর্বল লোকদের পক্ষে এ কাজ মোটেই সম্ভবপর নয়। এর জন্যে আমাদের মত দুর্বলচিত্ত লোকদের পক্ষে শক্তির পরীক্ষা দেয়া ভাগ্যের সাথে লড়াই করার শামিল। আজ তেরশ' বছর আগেকার যুগ ফিরে আসতে পারে না।

এই উক্তিগুলোর বাহ্যদিকটা নিঃসন্দেহে বিনয়পূর্ণ; কিন্তু একটু গভীরে নেমে দেখলে একে আর বিনয়সূচক নয়, বরং বিদ্রোহাত্মক ঘোষণা বলে মনে হবে। ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এবং বাতিল ও দুষ্কৃতির সাথে আপোস-রফার নীতি অবলম্বন করে যখন মানুষ ইসলামের প্রকৃত অনুবর্তীদের চরণতলেও স্থান পেতে পারে না এবং আল্লাহর রসূল এমন ব্যক্তিকে সর্বশেষ বিন্দু থেকেও বঞ্চিত ঘোষণা করেছেন, তখন বড় রকমের কমজোরী আর নেরাশ্যও এ কর্তব্য পালন থেকে, বিচ্ছিন্ন থাকার অধিকার কিভবে দিতে

পারে–এটা সত্যি ভেবে দেখবার বিষয়। এইরূপ বিচ্ছিন্নতা যদি বাস্তবিকই কোথাও থেকে থাকে, তবে স্বীকার করতেই হবে যে, সেখানে কোন দুর্বলতম ঈমানের সন্ধান করাও নিষ্ফল ব্যাপার। ইসলাম নিজের কোন 'সস্তা সংস্করণ' প্রকাশ করেনি যে, তার পরিপ্রেক্ষিতে 'এই শক্তি পরীক্ষা' থেকে নিস্তার পাওয়া যেতে পারে। যে ব্যক্তি ধারণা করে বসেছে যে, ঈমানের এই অপরিহার্য উপাদান থেকে বঞ্চিত থেকেও কতক পরিমাণে ঈমান ও খোদার সন্তোষ লাভ করা যেতে পারে,[১] সে নিশ্চিতরূপেই ধোকার মধ্যে লিপ্ত হয়ে আছে।

খিলাফত যুগের ইতিহাসে দৃষ্টান্ত

এই চিন্তাধারার মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও কেন্দ্রীয় জিনিস যাকে একটি নতুন 'দলিল'ও বলা যায়–তা হলো এই যে, যে জিনিসটি সাহাবাদের হাতে ত্রিশ বছরের বেশী পুরোপুরি টিকে থাকল না, তার জন্যে এমন কোন চেষ্টা করা সম্পূর্ণ নিরর্থক। এটি এই অর্থে নিশ্চিতভাবেই এক প্রকাণ্ড 'দলিল' যে, সাধারণ লোকদের মনোবলের ওপর এর খুবই নৈরাশ্যব্যঞ্জক প্রভাব পড়ে। তাই ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মুলমানদের মধ্যে নৈরাশ্য ও হতাশার বিষ ছড়াবার কাজে এই ধারণাটি যত কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে, তার আন্দাজ করাই কঠিন। কিন্তু এই 'দলিল' বাস্তব দৃষ্টিতেও দলিল এবং এটি শুধু সাধারণ ভাবাবেগকেই প্রভাবিত করে না, বরং বুদ্ধিবৃত্তির কাছেও এর গুরুত্ব স্বীকার্য–এ কথার সঙ্গে প্রকৃত সত্যের কোনই সম্পর্ক নেই। কারণ, এই যুক্তিধারায় যে জিনিসটিকে ভিত্তি করে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দায়িত্বকে নিজের পক্ষে বাতিল ভাবা হয়েছে, এই দায়িত্ব পালনের সঙ্গে কার্যত তার কোন সম্পর্কই নেই। কোন নীতি, আদর্শ ও লক্ষ্যের প্রতি আপনি যখন ঈমান এনেছেন, তখন তার দাবিসমূহ আপনার পূর্ণ করতে হবেই। সে নীতি ও লক্ষ্যকে কখনো দীর্ঘকালব্যাপী কার্যকরী রাখা যায়নি–আপনার দায়িত্ব পালনের ওপর এর কোনই প্রভাব পড়তে পারে না। এই ভিত্তির ওপর কেউ যদি আপন দায়িত্ব পালনে বিরত হয়, তা হবে তার কথা ও কাজের বৈপরীত্যের এক নিকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত। ভেবে দেখা দরকার যে, ইসলাম নিছক সত্য দ্বীন বলেই কি আমরা তার ঝাণ্ডা সমুন্নত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছি, না এর পেছনে অন্য কোন কারণ রয়েছে? যদি অন্য কোন কারণ থাকে তো ইহকালীন ও পরকালীন দিক থেকে এর কোন দাবিই আমাদের প্রতি অবশ্য পালনীয় হতে পারে না এবং তার জন্যে সংগ্রামের পথ পরিহার করার অপবাদও আমাদের প্রতি আরোজিত হতে পারে না। আর প্রথম কথাটি যদি সত্য

১. এই প্রসঙ্গে 'সাফল্য সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি', 'মুমিনের আসল দায়িত্ব' ইত্যাকার বিষয়ে পূর্ববর্তী আলোচনাগুলোকে স্মরণ রাখা উচিত। নচেৎ এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হবার আশঙ্কা রয়েছে।

হয়-যেমন প্রত্যেক মুসলমান সম্পর্কে প্রত্যাশা করা উচিত-তো একজন অমুসলমানও খিলাফত যুগের ইতিহাসের আশ্রয় নেয়ার ব্যাপারে আমাদেরকে সত্যাশ্রয়ী বলতে পারে না। ত্রিশ ও চল্লিশ বছর তো দূরের কথা, এ ব্যবস্থা যদি প্রকৃত ও আদর্শ রূপে সাফল্যের সঙ্গে কখনো একদিনের তরেও কায়েম না হয়ে থাকতো, তবু তার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমাদের দায়িত্ব পুরোপুরি বহাল থাকতো এবং এ জন্যে জীবনপণ করে সংগ্রাম করতে হতই। আমরা যখন একে সত্য বলে মেনে নিয়েছি এবং এর ঝাণ্ডাকে সমুন্নত করার দাবি করেছি, তখন আমাদের পক্ষে এটা দেখবার কোনই অবকাশ নেই যে, এ পথে কে কী কাজ করেছে এবং কবে করা হয়েছে। বরং আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ করবে সেই লক্ষ্য যাকে সত্য ভেবে আমরা কবুল করে নিয়েছি। ইতিহাস আমাদের দায়িত্ব কখনো নির্ধারণ করতে পারে না।

সম্ভবত এই তথাকথিত দলিলটির নিকটতম স্বাভাবিক ফলাফল সম্পর্কেও চিন্তা করা হয়নি। নচেৎ এতোবড়ো বিভ্রান্তিকর কথা কখনো মুখ থেকে বেরুতো না। ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সম্পর্কে এই ধরনের ছোট-বড় জিনিস ব্যবহার করা যথার্থ যদি বিবেচিত হয়, তাহলে এই যুক্তিধারা আমাদেরকে কোথায় নিয়ে পৌঁছায়, তাও দেখা দরকার। আপনারা হয়ত পড়েছেন যে, কিতাব ও সুন্নাতে একজন আদর্শ মুমিনের বিভিন্নরূপ গুণাবলী বিবৃত হয়েছে এবং আল্লাহ ও রসূল আদর্শ ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে অত্যন্ত উঁচু ধারণা পেশ করেছেন। এত উঁচু ধারণা যে, তাতে পুরোপুরি উত্তীর্ণ আবু বকর সিদ্দীক (রা), উমর ফারূক (রা), উসমান গণী (রা), আলী মুরতাযা (রা), আবু জার গিফারী (রা), সালমান ফারসী (রা), সোহাইব রুমী (রা), বিলাল হাবশী (রা) এবং এদেরই মত কয়েক শত কি কয়েক হাজারের বেশী লোক সৃষ্টি হয়নি। আর বর্তমানে তো এ ধরনের লোক খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। এক্ষণে যে যুক্তিধারা খিলাফতে রাশিদার আদর্শ যুগের বরাত দিয়ে আমাদের ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম থেকে দূরে থাকবার প্রেরণা দিচ্ছে, সেই যুক্তির কাছেই আদর্শ মুসলমান হবার কামনা ও প্রচেষ্টা বরং নিছক মুসলমান থাকা সম্পর্কেই ফতোয়া জিজ্ঞেস করা উচিত। তাকে নিশ্চিতভাবেই এই ফতোয়া দিতে হবে যে, আজকের অমন আদর্শ ঈমানের কথা ও ধারণা ছেড়ে দেয়াই উচিত। আর ঐ ঈপ্সিত আদর্শ গুণরাজির জন্যে কোনরূপ চেষ্টা থেকেও বিরত থাকা উচিত। এমনকি, নিছক মুসলমান হিসেবে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষাও ভ্রান্ত হবে। কারণ এসব কাজ তোমাদের মত দুর্বল লোকদের সাধ্যায়ত্ত নয়। স্পষ্টত প্রথম দলিলটিকে যদি আপনি ভ্রান্ত মনে না করেন তো এই দ্বিতীয় দলিলটিকেও রদ করতে পারেন না। যদি খিলাফতে রাশিদার স্বল্পকাল স্থায়ী সামাজিক ও রাষ্ট্রিক

ব্যবস্থা আমাদের কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্যে মন থেকে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ধারণা মুছে ফেলবার অধিকার দিতে পারে, তাহলে দ্বীনদারী ও তাকওয়ার ব্যাপারেও এই 'অক্ষমতার অধিকার' প্রয়োগ করতে না পারার কোনই হেতু নেই। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, আজকে যদিও একজন 'আবু বকর'ও জন্ম হচ্ছে না, কিন্তু এক ব্যক্তিও সিদ্দীকী ও ফারূকী ঈমান অর্জন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হতে কিংবা আদর্শ ঈমানের আকাঙ্খা ও প্রচেষ্টা থেকে বিরত হতে প্রস্তুত নয়। বরং এর বিপরীত দেখা যাচ্ছে যে, নিজেকে যেমন উন্নত ও আদর্শরূপে গড়ে তোলবার চেষ্টা চলছে, তেমনি অন্যান্য লোকদেরকেও সাচ্চা মুসলমান বানাবার জন্যে তবলিগী সংস্থা কায়েম করা হচ্ছে, ধর্ম প্রচারের জন্যে প্রতিষ্ঠানাদি খোলা হচ্ছে, কুরআন ও হাদীস শিক্ষা দেয়ার জন্যে বিদ্যায়তন চালু করা হচ্ছে। কেন এরূপ করা হচ্ছে? কেন সিদ্দীক ও ফারূকের মত ইসলামী বৈশিষ্ট্য অর্জন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে ইসলামের নাম উচ্চারণই ছেড়ে দেয়া হচ্ছে না? এর জবাবে তো এ কথাই বলা হবে যে, আবু বকর সিদ্দীক (রা) ও উমর ফারুক (রা) ছিলেন ইসলামের আদর্শ ও উন্নত নমুনা। তাঁদের মত ঈমান ও তাকওয়া আমরা অর্জন করতে না পেরে থাকলে তার অর্থ এই নয় যে, ইসলামকে একেবারে ছেড়েই দিতে হবে। বরং ঐ সকল নমুনাকে সামনে রেখে নিজেদের সামর্থ ও যোগ্যতা অনুযায়ী পুরোপুরি চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া এবং যতদূর সম্ভব তাঁদের ন্যায় দ্বীনদারী অর্জন করার চিন্তায় নিয়োজিত থাকাই হচ্ছে আমাদের কর্তব্য। ইতিহাস আমাদের সামেন আদর্শ ও দৃষ্টান্ত হিসেবে ইসলামের এই সুউচ্চ নমুনাগুলোকে পেশ করছে এই জন্য যে, তাদেরকে আমাদের অনুসরণ করতে হবে। আমরা যে যতটুকু শক্তি ও সামর্থ্য পাই, তদানুযায়ী তাদের রঙে নিজেদেরকে রাঙিয়ে তুলতে হবে। তাঁরা যে-পর্যায়ে অবস্থান করেছিলেন, সেদিকে আমাদের সাধ্যানুসারে পদক্ষেপ করতে হবে। প্রশ্ন হল এই যে, ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও এই কথাটিই কেন ভাবা এবং বলা হয় না? এই নীতিগত কথাটিকে ঈমান ও আমলের এক সীমাবদ্ধ পরিসরেই কেন সীমিত রাখা হয়? এর পরিধিকে কেন অধিকতর ব্যাপক বিষয়াদি পর্যন্ত বিস্তৃত হতে দেয়া হয় না? নিশ্চিতভাবেই এই সীমিতকরণের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। এ কারণেই খিলাফতে রাশিদা সংক্রান্ত বিষয়টিকেও এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করা আবশ্যক। হযরত আবু বকর, উমর, উসমান ও আলীর (রা) ব্যক্তিগত জীবনের ন্যায় তাঁদের খিলাফত ব্যবস্থাও ছিল এক আদর্শ ও অনুসরণযোগ্য ব্যবস্থা। আল্লাহ তায়ালার হিকমত ও অভিপ্রায়ে এই ব্যবস্থাটি ইতিহাসের বুকে সুরক্ষিত হয়ে আছে এজন্যে যে, সত্য দ্বীনের অনুবর্তিগণ একে চিরদিন এক উন্নত আদর্শ ও অনুকরণযোগ্য নমুনা হিসেবে গ্রহণ করবে। খোদা তাদের বাহুতে যতটা শক্তি যোগাবেন, এই নমুনার অনুকণে তারা ততটাই

চেষ্টা করতে থাকবেন এবং তাদের প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এই নমুনার প্রতিরূপ না হওয়া পর্যন্ত তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস গ্রহণ করবে না। যেমন করে ঐ মহাপুরুষদের ঈমান ও তাকওয়াকে ব্যক্তিগত জীবনের জন্যে এক আদর্শ নমুনা হিসেবে সামনে রেখে নিজস্ব ঈমান ও তাকওয়াকে ক্রম বিকশিত করার জন্যে পুরোপুরি চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য—এক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি নীতি অবলম্বন করতে হবে। এই চেষ্টা ও সাধনায় যতখানি সফলতা লাভ করা যায়, এ কাজের জন্যে ততখানিই আমরা দায়িত্বশীল আর ইসলামকে তার সঠিক রূপে যতটুকু আমরা কায়েম করতে পারি, তাকে খোদায়ী জীবন-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাই বলা যাবে। যেমন করে আবু বকর সিদ্দীক (রা) ও উমর ফারুক (রা) বনে যাওয়া আমাদের প্রতি ফরয নয়, বরং ঐ পূর্ণাঙ্গ নমুনাগুলোকে সামনে রেখে সাধ্যানুযায়ী তাঁদের সঙ্গে সাদৃশ্য সৃষ্টি করাই আমাদের কর্তব্য—তেমনি সর্বাবস্থায় তাঁদের ন্যায় আদর্শ খিলাফতের প্রতিষ্ঠা করা আমাদের জিম্মাদারী নয়। আমাদের আসল জিম্মাদারী হচ্ছে এই যে, যতদূর সম্ভব তাঁদের প্রতিষ্ঠিত খিলাফতের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে পুরোপুরি চেষ্টা করতে হবে এবং পরবর্তী বংশধরগণকে ক্রমাগত এই সাদৃশ্যের রঙকে অধিকতর উজ্জ্বল করে তোলার প্রয়াস চালাতে হবে।

কাজেই এই ত্রিশ বছরের খিলাফত-যুগকে নিজের জন্যে আদর্শ ও নমুনা হিসেবে গ্রহণ করা উচিত এবং এর উৎকর্ষতায় ভীত হবার পরিবর্তে এর থেকে কাজের শিক্ষা লাভ করা উচিত। মানবতার এই সমুন্নতির যুগটি হচ্ছে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথে প্রেরণাদায়ক জিনিস—তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ করবার জিনিস নয়! এর নামে যদি অন্তরে নৈরাশ্য ও হতাশা উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, তবে তার চাইতে আক্ষেপের বিষয় আর কিছুই হতে পারে না! এ নামে তো চুম্বকের আকর্ষণ এবং সে আকর্ষণে তরঙ্গের ন্যায় উচ্ছলতা রয়েছে। মুসলমানদের যদি বিশ্বাস থাকে যে, মানবতার কল্যাণ শুধু সত্য দ্বীনের প্রতিষ্ঠার সঙ্গেই সম্পৃক্ত এবং তাদের হৃদয় যদি ঐ স্বর্ণ যুগের—যে যুগে আসমানের ন্যায় এই জমিনেও খোদার অভিপ্রায় পুরোপুরি কার্যকরী হয়েছিল—প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার স্বাভাবিক দাবি হচ্ছে এই যে, অতীতের এই মনোরম সত্যকে পুনরায় বাস্তব জগতে ক্রিয়াশীল দেখার জন্যে তাদের হৃদয় অবিরাম অস্থির ও অশান্ত থাকবে। যে-ব্যক্তির ঈমানের এমনি অস্থিরতা না থাকবে, তা প্রকৃতপক্ষে ঈমান পদবাচ্যই নয়, বরং তা নিরুত্তাপ ধারণার একটি মন্দির মাত্র।

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি গুরুতর ভুল ধারণা

উপরে যা কিছু নিবেদন করা হয়েছে, তার থেকে মূলত এই ধারণাই ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা মাত্র ত্রিশ বছর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

প্রকৃতপক্ষে এই অদ্ভুত ধারণাটি কোন নিরেট জ্ঞান-তথ্য ও ঐতিহাসিক সত্য থেকে উদ্ভূত হয়নি, বরং একে সুপরিকল্পিতভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই ধারণা সৃষ্টিতে আমাদের চতুর দুশমনদের কুটিলতা এবং নির্বোধ বন্ধুদের সরলতা উভয়েরই সমান ভূমিকা রয়েছে। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, হযরত আবু বকর (রা) এবং হযরত ওমর (রা)-এর পরেও যেমন মুসলমান সৃষ্টি হয়েছে এবং বরাবর সৃষ্টি হয়ে আসছে, তেমনি তাঁদের খিলাফতের পরও দীর্ঘকাল যাবত ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম ছিল। পার্থক্য শুধু ছিল এই যে, ঐ মহামানবদের ব্যক্তিত্ব যেমন নিষ্কলঙ্ক ছিল, তেমনি তাঁদের খিলাফতও ছিল কল্যাণ ও মঙ্গলের পূর্ণ দৃষ্টান্ত। পক্ষান্তরে পরবর্তী মুসলিম শাসকদের ব্যক্তি-চরিত্র যেমন ত্রুটিপূর্ণ ছিল, তাঁদের সময়কার খিলাফত ব্যবস্থাও ছিল তেমনি ত্রুটিপূর্ণ। ব্যক্তি-চরিত্রের ত্রুটিপূর্ণ হওয়া যদি কোন অবস্থায়ই তাঁদের অমুসলিম হবার সমার্থক না হয়, তবে ঐ খিলাফত ব্যবস্থার ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার অর্থও এ হতে পারে না যে, ঐ সমস্ত খিলাফত ধর্মহীন এবং ঐগুলোর অধীনস্থ রাষ্ট্র-ব্যবস্থা অনৈসলামী ছিল। অন্যকথায় বলা যায়, মুসলিম জনগণের মধ্যে যেমন ইসলামী চরিত্রের মান বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে, তেমনি কুরআন ও সুন্নাহকে আইনের উৎস হিসেবে স্বীকৃতি দানকারী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার মানও বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। জনগণের মধ্যে যেমন দুর্বলতার সৃষ্টি হয়ে থাকে, তেমনি রাষ্ট্রব্যবস্থায়ও হয়ে থাকে। তাই ঐ ত্রিশ বছরকাল স্থায়ী খিলাফতে রাশিদার সকল পর্যায়ও নিজস্ব প্রাণবস্তুতে একরূপ ছিল না। বরং উসমান গনী (রা) ও আলী মুরতাযার (রা) খিলাফতকাল সিদ্দীকী ও ফারূকী ফিলাফতের চাইতে কিছুটা নিম্নমানের ছিল। এটা হাদীস এবং ইতিহাস থেকেও প্রতিপন্ন হয। কাজেই আমরা যেমন জনগণের দুর্বলতার সমালোচনা করলেও তাদেরকে ইসলামী সীমার বহির্ভূত মনে করি না, তেমনি এই ত্রিশ বছরের খিলাফত যুগের পরবর্তী রাষ্ট্রীয় কাঠামোগুলোকে কঠোরতর ভাষায় সমালোচনা করা যেতে পারে এবং সেগুলোকে জাহেলী উপাদানে সংমিশ্রিতও বলা যেতে পারে; কিন্তু সেগুলোকে সম্পুর্ণ অনৈসলামী এবং জাহেলী ঘোষণা করলে তা হবে নিতান্তই বাড়াবাড়ির শামিল। এই কারণেই সত্যাশ্রয়ী আলেমগণ যেমন দুস্কৃতিকারী মুসলমানদেরকে হেদায়েত ও সদুপদেশ দানের দায়িত্ব পালন করে আসছেন, তেমনি ঐ অসদাচারী শাসকদের অন্যায়াচরণেও সমালোচনা করতেন এবং তাদের রাষ্ট্র পরিচালন-ব্যবস্থার ত্রুটি নির্দেশ করে, সর্বদা তার সংশোধনের চেষ্টা করে আসছেন। কিন্তু এর চাইতে সামনে এগিয়ে কখনো তাঁরা এই মর্মে ফতোয়া জারি করেননি যে, এই রাষ্ট্রব্যবস্থাগুলো একেবারে কুফরী ও অনৈসলামী ছিল।

ফলকথা, খিলাফতে রাশিদার পরও মুসলিম দেশগুলোতে দীর্ঘকাল যাবত যে-রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু ছিল, কম-বেশী তা ইসলামীই ছিল। আদালতে ইসলামী

আইন অনুসারে বিচার-ফয়সালা হত। ইসলামের শরয়ী’ বিধান অনুসারেই শাস্তি প্রদান করা হত। ইসলামী বিধি অনুসারেই সম্পত্তি ভাগ-বন্টন করা হত। মোটকথা, তখন খারাবী যা কিছু ছিল শাসকদের মনোনয়ন-পদ্ধতি এবং তাদের ব্যক্তি-চরিত্রে। নচেত জীবনের সাধারণ বিষয়াদিতে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব (Authority) ছিল কুরআন ও সুন্নাহরই। এমন কি কোন নিকৃষ্টতম শাসকও কোন অনৈসলামী কাজ আঞ্জাম দিতে চাইলে শরয়ী’ বিধানের মুখোশ পরতে বাধ্য হত। এবং খোদায়ী দ্বীন ও কানুনের পরিবর্তে নিজের মনগড়া দ্বীন ও কানুন চালিয়ে দেয়ার কল্পনা পর্যন্ত সে করতে পারত না।

অবশ্য এতে কারো ভুল বোঝা উচিত নয়। আমার এ-আলোচনার উদ্দেশ্য খিলাফতে রাশিদার পরবর্তী রাষ্ট্রব্যবস্থগুলোকে খালেস ইসলামী রাষ্ট্র আখ্যা দেয়া নয়। আর ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যও মুতাছিম বিল্লাহ বা হারুনুর রশীদের মত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহবান জানানো এবং তেমনি রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট থাকার সদুপদেশ দেয়াও নয়। বরং আমার বলার উদ্দেশ্য শুধু এই যে, খিলাফতে রাশিদার যুগ খতম হবার পরও আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান এক দীর্ঘকাল যাবত দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকরী ছিল। যদিও প্রাণবস্তু ও বহিরাকৃতি উভয় দিক থেকেই তার ধরণটা ছিল ক্রুটিপূর্ণ। কিন্তু সমস্ত ক্রুটি সত্ত্বেও ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে তার প্রতিষ্ঠা ও কার্যকারিতাকে মোটেই অস্বীকার করা চলে না। কাজেই এই রাষ্ট্রব্যবস্থা মাত্র কয়েকদিন প্রতিষ্ঠিত ছিল–এহেন প্রচারণা জ্ঞান ও তথ্যের দিক থেকে যেমন বিশ্বাসঘাতকতা, তেমিন ঐতিহাসিক দিক থেকেও বিরাট প্রতারণার নামান্তর। এর প্রধান লক্ষ্য ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে জনমনে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা সবচাইতে কার্যকরী ব্যবস্থা

যারা খিলাফতে রাশিদার–অন্য কথায় ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত আয়ুষ্কালকে সম্বল করে এই তত্ত্বটি দাঁড় করাতে চান যে, এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা অভ্যন্তরীণ প্রকৃতির দিক থেকেই এখন এক অকার্যকরী ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে, তারা ইসলামের মুকাবিলায় আর কোন রাষ্ট্রব্যবস্থা পুরোপুরি আদর্শিক মান অনুযায়ী এর চাইতে বেশী দিন প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকরী রয়েছে–এ কথা কখনো বলেন না। তারা কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থার কথা বলতে চাইলেও রাজতন্ত্র ও একনায়কত্বের কথা নিশ্চয়ই বলবেন না। কারণ প্রকৃতপক্ষে এগুলো রাষ্ট্রব্যবস্থাই নয়। আর রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করা হলেও এর ভিত্তি হচ্ছে পুরোদস্তর 'জংলী আইনে'র ওপর, যাকে গোটা মানবতা সর্বসম্মতভাবে বাতিল করে দিয়েছে। এমতাবস্থায় কোন রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা বলতে চাইলে শুধু গণতান্ত্রিক ও কম্যুনিস্ট

ব্যবস্থার কথাই বলা যেতে পারে। আজ গোটা দুনিয়ায় এ দু'টি ব্যবস্থারই প্রতিপত্তি চলছে এবং নিজ নিজ শিবির থেকে এদের অনেক প্রশংসা ও গুণকীর্তনও প্রচারিত হচ্ছে। কিন্তু এই ব্যবস্থাগুলোকে কখনো ত্রিশ বছর নয়, ত্রিশ মাস, বরং ত্রিশদিনও পুরোপুরি আদর্শিক মান অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকরী করার দাবি করা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। বরং এর বিপরীত–ইতিহাস ও রাজনীতির গোটা পুস্তকাদিই একথার সাক্ষ্য বহন করছে যে, গণতন্ত্র কি কম্যুনিজম–কোন মতবাদই কার্যত তার পূর্ণাঙ্গ আদর্শিক মানে উন্নীত হতে পারেনি। আর বাস্তব দুনিয়ায় শুধু কিতাবের পাতায় পাতায় বিবৃত মতাদর্শের কোনই গুরুত্ব নেই।

গণতন্ত্র সম্পর্কে প্রখ্যাত চিন্তাবিদ বার্নাড শ' বলেছেনঃ

এই লক্ষ্য অর্জনের পথে এমন একটি সমস্যা রয়েছে, যা প্রায় দুঃসমাধেয়। আর তা হল এই আত্মপ্রসাদ যে, প্রতিটি নাগরিকের ভোটাধিকার লাভ করাই হচ্ছে গণতন্ত্রের সাফল্যের চাবিকাঠি। অথচ এই জিনিসটির কারণেই গণতন্ত্রের লক্ষ্য চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়ে যায়। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার নীতি গণতন্ত্রকে মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করে। শিক্ষিত ও চিন্তাশীল লোকেরা গণতন্ত্র চায় বটে, কিন্তু ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে তাদের মর্যাদা এক নগণ্য সংখ্যালঘুর বেশী কিছু নয়।

ইতালীর রাষ্ট্রনায়ক মেনজিনী লিখছেন;

মানুষ বাদশাহর আকারে একজন হোক কি গণতন্ত্রের রূপে বেশী হোক–কথা সমানই হবে।

ডীন রঞ্জ স্পষ্ট বলছেনঃ

একটি পূর্ণাঙ্গ গণতান্ত্রিকও ততটা গণতন্ত্র হতে পারে না, যতটা গণতান্ত্রিক মতবাদ তাকে গণতন্ত্রী আখ্যা দেয়।

লর্ড ব্রান্স এবং গণতন্ত্রের আরো বহু সমর্থককে বাধ্য হয়ে এই স্বীকৃতি দিতে হয়েছেঃ

প্রকৃত গণতন্ত্র কখনো এবং দুনিয়ার কোথাও বাস্তবায়িত হতে পারেনি।

এরপর কম্যুনিজমের ব্যাপারটি তো গণতন্ত্রের চাইতেও বেশী নাজুক। এমনকি, বর্তমান আলোচ্য বিষয়ে এ মতবাদটি তো উল্লেখযোগ্যই নয়। এটা কোন বিরুদ্ধ প্রচারণার কথা নয়, বরং এ এক স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত সত্য। যদি এই মতবাদটির ইপ্সিত লক্ষ্যের কথা সামনে রাখা হয়, তবে আরও এ সত্য দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। এর প্রখ্যাত ও প্রমাণ্য নায়ক ফ্রেডারিক এঞ্জেলসের ভাষণ অনুসারে কম্যুনিস্ট ব্যবস্থার চরম লক্ষ্য হচ্ছেঃ

'এমন একটি সমাজ গঠন করা, যেখানে বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকবে না, ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার জন্যে সংঘর্ষ হবে না। মানুষ হবে প্রকৃতির সচেতন নিয়ামক। নিজের ইতিহাস তৈরী করবে। সামাজিক উপকরণাদি তার নিজস্ব অভিপ্রায় অনুসারে ফলদান করবে। সে অভাব ও দারিদ্র্যের জগৎ থেকে মুক্ত হয়ে শক্তি কর্তৃত্বের জগতে প্রবেশ করবে এবং রাষ্ট্র ও সরকার অতীতের স্মৃতিতে পর্যবসিত হবে।' (সোস্যালিজম)

আজকে কম্যুনিজমের ক্ষমতা দখলের পর প্রায় চল্লিশ বছর[১] অতিক্রান্ত হয়েছে। বর্তমানে সে বিভিন্ন রাষ্ট্রে কর্তৃত্ব করে চলছে। কিন্তু এই আদর্শিক সমাজ ব্যবস্থা কি কোথাও পরিলক্ষিত হচ্ছে? রাশিয়া হচ্ছে এর সবচাইতে প্রথম ঘাঁটি এবং সুদৃঢ় দুর্গ। কিন্তু কারো মুখ থেকে কি কখনো এই দাবি শোনা গিয়েছে যে, সেখানে কোন শ্রেণীভেদ, অভাব-অনটন ও রাষ্ট্র-সরকারের অস্তিত্ব নেই? এবং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ইতিহাস নিজেই তৈরী করছে? স্পষ্টত, সেখানে যখন এইসব কিছু বর্তমান নেই, তখন এমনি পর্বত-প্রমাণ মিথ্যা কে বলতে পারে? তাই কম্যুনিজমের সমর্থকদের কৈফিয়ত হচ্ছেঃ এখন এই ব্যবস্থা অন্তর্বর্তী কাল অতিক্রম করে চলছে এবং ক্রমবিকাশ ও পরিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করার পর এ ঈপ্সিত আদর্শিক মানে উন্নীত হবেই। কম্যুনিস্ট মতবাদ ভবিষ্যতে কখনো নিজের দাবি ও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এমনি সমাজ গঠন করতে পারবে কিনা, বর্তমানে এটা আলোচ্য বিষয় নয়। বর্তমানে তো শুধু দেখবার বিষয় হল, কম্যুনিজম এখনো পর্যন্ত, একদিনের তরেও তার ইপ্সিত আদর্শিক রূপে কোথাও প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকরী হতে পারেনি। এ কথা বাস্তব অবস্থা থেকে যেমন প্রমানিত, কম্যুনিজমের প্রতিটি সমর্থকের কাছেও তেমনি স্বীকৃত।

অন্যান্য রাষ্ট্রব্যবস্থার এই পর্যালোচনার ফলে বাস্তব অবস্থা কি দাঁড়াল? দুনিয়ার উল্লেখযোগ্য মতবাদ ও ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে কোন ব্যবস্থা নিজরে ঈপ্সিত আদর্শিক রূপে প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকরী হয়ে থাকলে তা শুধু ইসলামী ব্যবস্থাই হয়েছে। এ ছাড়া এমন আর কোন মতবাদের সঙ্গে দুনিয়া পরিচিত নয়, যা স্বল্পতম সময়ের জন্যেও নিজের ঈপ্সিত রূপ প্রদর্শন করতে পেরেছে। কাজেই কোন রাষ্ট্রব্যবস্থার পুর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠা ও কার্যকারিতাই যদি তার গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠি হয় তো সে মাপকাঠি কেবল ইসলামের কাছেই রয়েছে বরং তার এই বিশিষ্ট মর্যাদাকে অন্য কোন ব্যবস্থাই চ্যালেঞ্জ করতে পারে না। এ সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা মাত্র স্বল্পকাল প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে পুনরায় তার প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রাম করা একটি অর্থহীন কাজ—এটা কতখানি বিস্ময়কর কথা!

১. এখানে স্মর্তব্য যে, প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে ১৯৫৭ সালে। তার আরো অনেক বছর অতিক্রান্ত হলেও প্রবন্ধের বিষয়ে কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। —অনুবাদক

(৪) প্রতীক্ষার নীতি

এবার যারা প্রতীক্ষার নীতি অবলম্বন করেছেন এবং নিজেরা শান্তি ও নিশ্চিন্ততার নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে অন্যান্য লোকদেরকে দৃঢ় পদক্ষেপ ও দ্রুতগামিতার বিচার-বিবেচনা করছেন–যারা এই কাজকে নিজ জীবনের আসল কর্তব্যছ বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও এতে অংশগহণকারী পুরনো লোকদের সংকল্প ও আন্তরিকতা সন্দেহজনক মনে হওয়ায় কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করতে বিরত রয়েছেন, তাদের চিন্তাধারাটা পর্যালোচনা করা যাক।

কপটতাদুষ্ট মানসিকতা

এই চিন্তাধারার অন্তঃসারশূন্যতা সম্পর্কে কী বলা যায়, তা ভাবতে গিয়ে আমাদের বিচার-বুদ্ধি সত্যিই বিস্মিত হয়ে যায়। একটা জিনিসকে শুধু অবশ্য-কর্তব্য বলেই স্বীকার করা হচ্ছে, কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের বাস্তব সম্পর্ক হচ্ছে এই যে, যতক্ষণ অন্য লোকেরা তাদের কর্তব্য পালন না করবে, ততক্ষণ আমরা তার জন্যে এক পাও সামনে এগোব না। এটা মূলত এমনি ধরনের যুক্তি যে, ইমাম যদি তাদের মতানুযায়ী সৎ খোদাভীরু ও নামাযী না হয় তো এই ভদ্রলোকেরা শুধু তার পেছনে নামায পড়তেই অস্বীকার করবে না, বরং নামায পড়াই একেবারে ছেড়ে দিবে এবং নিজস্ব খোশখেয়াল অনুযায়ী কাল হাশরের মাঠে এই অজুহাত দেখিয়েই নিস্তার পেয়ে যাবে যে, খোদা! আমরা তো নামায পড়াকে অবশ্য-কর্তব্যই মনে করতাম এবং চব্বিশ ঘন্টা তার জন্যে অজু করে প্রস্তুতও ছিলাম; কিন্তু মুয়াযযিনের আযান এবং ইমামের নামাযের মধ্যে আমরা আন্তরিক নিষ্ঠা ও খোদা পরস্তির ভাবধারা খুঁজে পাইনি বলে নামায পড়িনি। একটু তলিয়ে চিন্তা করার পরও কি এহেন চিন্তা ও যুক্তিধারার জন্যে কোন শরয়ী কিংবা যুক্তিসম্মত ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়? মনে করুন, যায়েদ ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে আহবান জানাচ্ছে এবং আমাদের কর্তব্য-বিচ্যুতি সম্পর্কে সাবধান করে দিয়ে বিস্মৃত দায়িত্বকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে–পরন্তু আপনা থেকে সে এ পথে পদক্ষেপও করেছে; কিন্তু তার বাস্তব যোগ্যতা-আন্তরিক নিষ্ঠা ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তার প্রতি আপনি পুরোপুরি সন্তুষ্ট নন, বরং সে এবং তার অন্যান্য সহকর্মীকে আপনার অযোগ্য, বে-আমল, নিষ্ঠাহীন ও অমুত্তাকী মনে হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, তার এই সব ত্রুটি-বিচ্যুতি কিভাবে আপনার দায়িত্বকে নাকচ এবং আপন কর্তব্য থেকে আপনাকে অব্যাহতি দিবে? আপনি কি এই সত্যকে এজন্যেই বিশ্বাস করেছিলেন যে, যায়েদ এবং তার সহকর্মীদেরও এটাই অভিমত? আপনি কি সত্য দ্বীনের প্রতিষ্ঠাকে নিজ জীবনের আসল কর্তব্য বলে মেনে নিয়েছিলেন এই শর্ত সহকারে যে যায়েদ এবং তার সহকর্মীরা প্রথমে

সঠিকভাবে কর্তব্য-পালনের বাস্তব প্রমাণ দিলে তবেই আমরা নিজেদের সুখ-শয্যা থেকে উঠব এবং শান্তির নীড় থেকে বাইরে পদক্ষেপ করব? কুরআনের মুল দাওয়াতে সাড়া দেয়ার জন্যে আপনি কি তখনি দায়িত্বশীল, যখন অন্যান্য লোকদেরকে এ পথে কুরবানী কতে দেখবেন? যদি তা না হয়-আর কুরআনই সাক্ষী যে, তা মোটেই নয়-তবে নিজের প্রবৃত্তির বাহানা ও গাফলতিই বা কম কিসে যে, অন্যান্য লোকদের দুর্বলতা খুঁজতে আপনি অবসর পান? অন্যান্য লোকেরা যদি বাস্তবিকই আপনার ধারণার অনুরূপ হয়, তবে খোদার সামনে তারা নিজেরাই জবাবদিহি করবে। আপনি কেন অকারণ কার মধ্যে কী আছে বা নেই-এই খোঁজাখুঁজির ঝামেলা পোহাতে যাবেন? নিজের কৃতকর্ম সম্পর্কে প্রত্যেকেরই চিন্তা করা উচিত। অন্যান্য লোকদের অসন্তোষজনক অবস্থা যদি লক্ষ্য করতে হয় তো শিক্ষা লাভের জন্যেই করা উচিত-এটাই হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার দাবি। হযরত লোকমান (আ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, 'আপনি আদব শিখেছেন কার থেকে?' জবাবে তিনি বলেন, 'বেয়াদবের কাছ থেকে।' মুমিনদেরকেও আল্লাহ বিচক্ষণ দেখতে চান এবং এখনি শিক্ষামূলক ও বিচক্ষণসুলভ দৃষ্টিকে কাজে লাগাবার জন্যে তাদেরকে তাকিদ করেছেন। গোটা কুরআনকে তিনি অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট জাতিগুলোর দীর্ঘ কাহিনী দিয়ে এজন্যেই পূর্ণ করে দিয়েছেন যে, মুমিনরা যেন তাদের চিন্তা ও কর্মের ভ্রান্তি সম্পর্কে উত্তমরূপে অবহিত হয় (وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ) এবং তার থেকে হামেশা বেঁচে থাকে। কাজেই এই পরিস্থিতির-ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহবায়ক, কর্মী বা দলের এই অযোগ্যতা প্রদর্শনমূলক অবস্থার-দাবি কিছু থাকলে তা হচ্ছে এই যে, তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি, প্রদর্শনী মনোবৃত্তি ও অন্যায়াচারণকে নিজের জন্যে অকর্মণ্যতার সার্টিফিকেট বানাবার পরিবর্তে তার থেকে বরং নিজে বেঁচে থাকুন এবং পূর্ণ খোদা-পরস্তি ও আন্তরিকতার সঙ্গে এর ঝাণ্ডা নিয়ে সামনে অগ্রসর হোন। এ ছাড়া আর কোন সত্য কথা থাকলে তা হচ্ছে এই যে, ঐসব কর্মীদের জণ্যেও এই ভাবে হেদায়েত, সৎ সাহস, আন্তরিকতা ও কর্মশক্তির দোয়া করুন যে, তাদের চেঁচামেচি তাদের নিজেদের পর্যন্ত শুধু 'বাচনিক শ্লোগান ও নিষ্প্রাণ দাবি' হলেও আমাদের পক্ষে তো তা-ই হেদায়েত ও নসিহত প্রমাণিত হয়েছে। এই কারণে তারা বাস্তবিকই আমাদের শুকরিয়ার পাত্র-ঠাট্টা-বিদ্রূপ বা বিরোধিতার নয়। যে-নির্বোধ ও হতভাগ্য ব্যক্তি অন্ধকার রাত্রে প্রদীপ হাতে রাস্তার মুখে দাঁড়িয়ে থাকে এবং অন্যান্য লোকদেরকে গন্তব্যস্থল দেখিয়ে দিলেও নিজের চোখের ওপর ঠুলি বেঁধে রাখে, তার জন্যে আপনার অবশ্যই আক্ষেপ করা উচিত; কিন্তু তার প্রতি নির্মমভাবে সমালোচনার বান নিক্ষেপ করা যেমন বেইনসাফী, তেমনি তার প্রদীপের আলো থেকে উপকৃত

না হওয়াটাও নির্বুদ্ধিতা ও দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। সৌভাগ্যবান ব্যক্তি হামেশাই অন্যের থেকে শিক্ষা ও সদুপদেশ গ্রহণ করে থাকে। আর বুদ্ধিমত্তার দাবি হচ্ছে এই যে, কথকের ব্যক্তিত্বের চাইতে তার বক্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত। কাজেই সত্য দ্বীন প্রতিষ্ঠার আহবান শুনে আল্লাহর সফলকাম বান্দাদের মত নীতি অবলম্বন করুন–'যারা আল্লাহর বাণীকে কান লাগিয়ে শোনে এবং তারপর উত্তম বাণীর অনুবর্তনে লেগে যায়' اَلَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهُ-زمر:١٨ ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাওয়াত' 'আল্লাহ্‌র বাণী' (القول) কিনা, এ সম্পর্কে তো কোন বিতর্কই নেই। কারণ, এটি সর্বসম্মতভাবে আল্লাহর বাণী (القَوْل)। কাজেই অনতিবিলম্বে এবং কোনরূপ কালক্ষেপণ না করেই এ আহবানে সাড়া দেয়া উচিত। যদি গোটা দুনিয়াও এ দায়িত্ব পালনে অসম্মত হয়, তবু মনে রাখবেনঃ আপনার জিম্মাদারী কিছুমাত্র হ্রাস পেতে পারে না। অন্যান্য লোকদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার জন্যে প্রতীক্ষা করারও আপনার অধিকার নেই। এ ধরনের প্রতীক্ষা সত্যপ্রীতির সম্পূর্ণ বিপরীত জিনিস। যে–ব্যক্তি সত্যের স্বরূপ জানার পরও প্রতীক্ষার নীতি অবলম্বন করে, সে প্রকৃতপক্ষে সত্যের মূল্যই জানে না, বরং প্রকারান্তরে সে তার পথে বাঁধারই সৃষ্টি করে।

প্রসঙ্গত, যে-হতভাগ্য ও বিশ্বনিন্দিত দলটি নবী করীম (স) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের জীবন-পণকারী সংগ্রামের মুকাবিলায় এমনি নীতি অবলম্বন করেছিল, তাদের অবস্থা ও পরিণতির কথাটা একবার স্মরণ করে নেয়া একান্ত আবশ্যক। এই দলটির পক্ষে নবী করীম (স)-এর আন্দোলনে যোগদান করার ব্যাপারে এই কর্তব্যবোধই যথেষ্ট ছিল না যে, তারা যে কাজটির জন্যে নিজেদের প্রাণপাত করেছে, তাকে আমরাও সত্য বলে 'স্বীকৃতি' দিয়েছি; বরং এরা হক ও বাতিলের এই সংগ্রাম থেকে দূরে দাঁড়িয়ে এর ফলাফল লক্ষ্য করত এবং যখন মুসলমানদের বিজয় নিশান উড্ডীন হতে দেখত, তখনি তাদের জামায়াতে এসে যোগদান করতঃ

اَلَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ

(نساء: ١٤١)

এরা তোমাদের ব্যাপারে প্রতীক্ষায় বসে থাকে যদি আল্লাহর তরফ থেকে তোমাদের বিজয় সূচিত হয় তো অমনি এসে বলেঃ আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না?

চিন্তা করে দেখুন, আজকে যারা ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকে নিজেদের মর্যাদাগত কর্তব্য মনে করেও নিছক অন্যান্য লোকদের প্রতীক্ষায় বসে রয়েছে

এবং তাদেরই জন্যে বাস্তব কাজে অংশগ্রহণ করছে না, আয়াতে উল্লিখিত মুনাফিকদের মানসিকতার সঙ্গে তাদের মানস-প্রকৃতির কী নিকট সম্পর্ক বর্তমান। ঐ 'মুনাফিকরা' যেমন সত্যের খাতিরেই সত্যের সাহায্য সহায়তা করত না, তেমনি আজকের এই 'মুসলমানদের' দৃষ্টিতে সত্যের সত্য হওয়াটাই শুধু কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্যে যথেষ্ট নয়। পার্থক্য এই যে, তারা মুসলমানদের বিজয়লাভের জন্যে অপেক্ষায় বসে থাকত, আর এই ভদ্রলোকেরা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহবায়কদের সঙ্কল্প ও আন্তরিকতার ব্যাপারে কোন 'প্রশস্ত হৃদয়ে'র জন্যে প্রতীক্ষা করছে। কিন্তু সত্যের অনুবর্তন ও কর্তব্য পালন থেকে পলায়নের ব্যাপারে উভয়ের আচরণই একরূপ।

আর এক ধাপ সামনে

বিষয়টি যদি এ পর্যন্ত সীমিত থাকত এবং প্রতীক্ষা ও ইন্তেজারের নেতিবাচক দিকেই ক্ষান্ত থাকা যেত, তবে আর বিশেষ আক্ষেপের ব্যাপার ছিল না। কিন্তু যখন দেখা যায় যে, লোকেরা এই সীমা পর্যন্ত ক্ষান্ত থাকতে প্রস্তুত নয়, বরং খোদা-পরস্তি, কুরআনে অনুবৃত্তি ও সুন্নাহ-প্রীতির দাবিদার উম্মতের মধ্যে একশ্রেণীর লোক এই প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার 'মিথ্যা দাবিদার'রা ময়দান থেকে কবে পালিয়ে যাবে এবং তারা তাদের ঠাট্টা ও বিদ্রূপের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার সুযোগ পাবে−তখন ধৈর্য ও সংযম অবলম্বন করা সত্যিই কঠিন হয়ে পড়ে। এই ভদ্রলোকেরা একটি অর্থপূর্ণ মুচ্‌কি হাসির সঙ্গে বলে থাকেন যে, এই চেতনাহীন ও ভাবাবেগপ্রবণ দলটি শুধু 'ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা' 'ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা'র চিৎকার করছে, কিন্তু যুগের ঘটনা প্রবাহই এদেরকে মৃত্যুর কোলে নিক্ষেপ করবে−আর এই কথাটুকু বলে যেন তারা আপন দায়িত্বটাই পালন করে ফেল্লেন, এমনি একটা ভাবভঙ্গি দেখাতেও কসুর করেন না! কিন্তু তাদের হয়ত জানা নেই যে, তাদের এই বিদ্রুপবাণ খোদ তাদেরই কণ্ঠনালী পর্যন্ত গিয়ে প্রবেশ করে।

আফসোসের বিষয় যে, আজকে মুসলমানদের অন্তর ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপনা থেকে এমনি বঞ্চিত হয়ে গিয়েছে যে, নিজে কিছু করতে না পারলে অন্যান্য লোকের কাজও তারা বরদাশ্‌ত করতে পারে না। এমতাবস্থায় যে-হৃদয়কে সত্য দ্বীনের ভালবাসা ও প্রাণোৎসর্গের আশ্রয়স্থলে পরিণত করা হয়েছিল, আজকে সেখানে এমন আকাঙ্ক্ষা প্রতিপালিত হচ্ছে, যা' শুধু কুফর ও কুফরী প্রভাবের বিরুদ্ধেই নিয়োজিত হওয়া উচিত ছিল−এটা বিশ্বাস করার মত মন-মগজ কোথায় পাওয়া যাবে? অথচ কারো মধ্যে যদি আলআহর দ্বীনকে জিন্দা করার জন্যে বাস্তব পদক্ষেপ করার মত সম্ভ্রম ও হিম্মতই না থাকে তো

তার প্রত্যাশা থেকে নিজের মন-মগজকে এক মুহূর্তের জন্যেও খালি হতে না দেয়া এবং আল্লাহর কিছু বান্দা এর জন্যে পদক্ষেপ করে থাকলে তাদের জন্যে কর্মনিষ্ঠা, দৃঢ়তা, সত্যের সাহায্য ও শুভ ফলাফলের দোয়া করতে থাকাই হচ্ছে তার ঈমানের নূন্যতম দাবি। কিন্তু কেউ যদি এতটুকুও করতে না পারে তো তার অর্থ হচ্ছে যে, তার ভিতরকার সত্যপ্রীতির শেষ স্ফুলিঙ্গটিও নিভে যাচ্ছে। কিন্তু খোদা না করুন, এর চাইতেও সামনে এগিয়ে যদি সে সত্যের আহবানকে ফেতনা আখ্যা দেয়, লোকদেরকে তার দিকে এগোতে বারণ করতে শুরু করে এবং তার জন্যে দুনিয়ার বিপদ-মুসিবত কামনা করতে থাকে, তবে তা হবে তার চরম দুর্ভাগ্যের নামান্তর। এমতাবস্থায় তার ইসলামের নামোচ্চারণেই লজ্জাবোধ করা উচিত। কারণ এমতাবস্থায় সে মানবিকতা ও প্রকাশভঙ্গির সামান্য পার্থক্যসহ ঠিক সেই জায়গায় অবস্থান করবে, যেখান থেকে কিছু হতভাগ্য লোক একদা নবী করীম (স) ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের সম্পর্কে ধ্বংস কামনা করত। কুরআন নিম্নোক্ত ভাষায় তাদের কথা উল্লেখ করেছেঃ

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ ،

(توبة:٩٨)

এমন কিছু সংখ্যক গ্রাম্য লোক রয়েছে, যারা (আল্লাহ্র পথে) কিছু ব্যয় করতে থাকে, তাদেরকে নির্বোধ মনে করে আর তোমাদের (মুসলমানদের) জন্যে আপদকালের প্রতীক্ষা করতে থাকে।

কিংবা সে এমন স্থানে থাকবে, যেখান থেকে বিশ্বনবীর চিত্তজয়ী আহবানকে এই বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিলঃ

شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ* (طور: ٣٠)

এ-তো একজন কবিমাত্র; আমরা এর জন্যে আয়-উপার্জনের পথ খুঁজছি।

কাজেই আল্লাহ্ যাদেরকে বিচারবুদ্ধি দিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে দিয়েছেন ঈমানের প্রতি কিঞ্চিত ভালবাসাও তারা এই মারাত্মক এবং ঈমান ধ্বংসী মানবিকতার কাছেও ঘেঁসতে পারে না।

(৫) প্রতিশ্রুত মাহদীর প্রতীক্ষা

সর্বশেষ দলটিতে রয়েছে এমন সবলোক, যারা ইমাম মাহদীর জন্যে প্রতীক্ষায় আছে। তাদের চিন্তা ও যুক্তিধারার সূত্র হল এই যে, হযরত রসূলে আকরাম (স) ত্রিশ বছর পর খিলাফতে রাশিদার খতম হয়ে যাবার কথা বলে গিয়েছেন।

কাজেই ঐ সময়ের মধ্যে তা' খতমও হয়ে গিয়েছে। অপরদিকে তিনি এই সংবাদও দিয়ে গিয়েছেন যে, দুনিয়া যখন তার আয়ূষ্কাল পুরো করে ফেলবে, তখন এক 'মরদে সালেহ' (الامام المهدى) আত্মপ্রকাশ করবেন। তাঁর দ্বারা দুনিয়ার বুকে আবার নবুয়্যতপন্থী খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। এই যুক্তি-ধারার সমাপ্তি কথা এই যে, এ লক্ষ্যবস্তুটি সত্যাশ্রয়ী হলেও এজন্যে আমরা আপাতত কোন চেষ্টা সাধনা করতে বাধ্য নই।

যুক্তিধারা, না যুক্তির প্রতারণা

ইসলামী নীতি ও লক্ষ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা অতদূর গিয়ে পৌঁছেছে যে, এ-ধরনের কথাবার্তাকে আজ দলিল মনে করা হচ্ছে আর এমন প্রকাণ্ড দলিল যে, মুসলমানদের জীবন-লক্ষ্য ও জীবন-নীতিকেই তা বদলে দিতে পারে। এমনকি, তা আফিমের বড়ি হয়ে বহু সাধারণ অসাধারণ ব্যক্তিকেও তাদের জীবনের পরম কর্তব্য সম্পর্কে উদাসীন ও অনুভূতিহীন করে রেখেছে। এই কারণেই এটা যে দলিল নয়, বরং প্রবৃত্তি ও দৃষ্টিশক্তির একটা ধোকা মাত্র–একথাটা সুস্পষ্ট করে বলে দেয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

এই প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম দেখা দরকার যে, মাহদীর আত্মপ্রকাশের সংবাদ আমরা পেয়েছি কোত্থেকে? এবং দ্বীনী প্রত্যয়ের তালিকায় তাঁর স্থানই বা কোথায়?

এই প্রশ্নের জবাব পেতে হলে সর্ব প্রথম কুরআনের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। কিন্তু তার পৃষ্ঠায় আমরা এর কোন উল্লেখই দেখতে পাই না। অথচ দ্বীন-ইসলামের মৌলিক শিক্ষার ক্ষেত্রে জীবনের বুনিয়াদী কর্তব্য নির্ধারণে প্রভাবশীল হবার মত গুরুত্ব এর থাকলে কুরআন এর সম্পর্কে আমাদের অবশ্যই স্পষ্ট নির্দেশ দান করত এটা সাধারণ বিচার-বুদ্ধির কথা। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। এটা একথাই চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করে যে, দ্বীনী চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণায় এ প্রশ্নটির কোনই মৌলিক গুরুত্ব নেই। আর বাস্তব অবস্থা যখন এই যে, তখন মুসলিম জাতির জীবন লক্ষ্যের মত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাকে কোন ফয়সালা করার অধিকার দেয়া চিন্তা ও দৃষ্টিশক্তির প্রকাণ্ড অক্ষমতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

অবশ্য হাদীসে এ সম্পর্কে কিছু ভবিষ্যদ্বাণী লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু প্রশ্ন হলঃ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মুসলমানদের প্রতি যে বিরাট দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে, তার সঙ্গে এই ভবিষ্যদ্বাণীর কী সম্পর্ক রয়েছে? এর থেকে তো কেবল এই কথাটুকু জানা যাচ্ছে যে, দুনিয়া ধ্বংস হবার আগে একটি সোনালী যুগ আসবে। তখন দুনিয়ার বুক থেকে জুলুম ও অশান্তি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে

যাবে। দুনিয়া শান্তি ও সুবিচারে কানায় কানায় ভরে উঠবে এবং সারা বিশ্বে আবু বকর সিদ্দীক (রা) ও উমর ফারূক (রা)-এর ন্যায় নবুয়্যতপন্থী খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। কিন্তু এর থেকে এটা কিভাবে প্রমাণিত হয় যে, মধ্যবর্তী যুগসমূহের জন্যে সারা দুনিয়ায় কুফরী ও শয়তানী শক্তির কর্তৃত্ব অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছে? ইসলামের সোনালী যুগ খোলাফায়ে রাশিদীনের সমাপ্তির পর থেকে মাহদীর আত্মপ্রকাশ পর্যন্ত দুনিয়ার কোথাও আল্লাহ্‌র দেয়া জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে না–উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে তো এ সম্পর্কে কোন দূরবর্তী ইঙ্গিতও নেই। বরং ইসলামের ইতিহাসই সাক্ষী যে, উক্ত সোনালী যুগের অবসানের মাত্র সতেরো বছর পর হযরত উমর বিন আব্দুল আযীযের শাসনকালে প্রায় খোলাফায়ে রাশিদীনের মতই এই সৌভাগ্য-সূর্য উদিত হয়েছিল। এই কারণে ঐ শাসনকালটিও ইসলামের ইতিহাসে সোনালী যুগ বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাছাড়া মাহদীর আবির্ভাব সম্পর্কে যে ধরণের হাদীস দেখা যায়, প্রায় সেই ধরণেরই অপর কয়েকটি হাদীসে মাহদীর পূর্বে ইসলমী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে কতিপয় আন্দোলন গড়ে ওঠার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে এবং মুসলমানদের প্রতি তার সহায়তা করা বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে এখানে দু'টি বর্ণনা উল্লেখযোগ্যঃ

اذا رايتم الايات السوداء قد جائت من قبل خراسان فاتوها ولم حبوا على الثلج فان فيها خليفة الله المهدى-

তোমরা যখন দেখবে যে, খোরাসানের দিক থেকে কালো কালো ঝাণ্ডা এগিয়ে আসছে, তখন বরফের ওপর দিয়ে হিঁচড়ে যেতে হলেও তোমরা সেখানে গিয়ে পৌঁছুবে। কারণ তার মধ্যে আল্লাহ্‌র হেদায়েত প্রাপ্ত খলিফা থাকবে।

يخرج رجل من وراء النهر يقال له الحارث حراث على مقدمة رجل يقال له منصور يواصنى او يمكن لال محمد كما مكنت قريش لرسول صلى الله عليهوسلم وجب على كل مسلم نصره او قال اجابته (ابوداؤد)

মা-ওরায়েন নাহার[১] 'হারীস হারাস' নামক এক ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করবে। তার সামনে (অর্থাৎ তার সিপাহসালার) মনছুর নামক এক ব্যক্তি থাকবে।

১. মধ্য এশিয়ার একটি স্থানের প্রাচীন নাম।

সে মুহাম্মদ-পরিবারের জন্যে শক্তি ও ক্ষমতা সৃষ্টি করবে—কোরাইশরা যেমন রসূলুল্লাহ (স)-এর জন্যে করেছিল। তার সাহায্য করা প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি অবশ্য কর্তব্য। অথবা বলা হয়েছেঃ তাঁর আহবানে সাড়া দান করা।

এটা মনে করা উচিত নয় যে, উক্ত বর্ণনাগুলোতে যেসব ব্যক্তির আবির্ভাবের সংবাদ দেয়া হয়েছে, তাদের সবার দ্বারা একই ব্যক্তি অর্থাৎ 'প্রতিশ্রুত মাহদী'কেই বুঝানো হয়েছে। কারণ, হাদীসের বর্ণনা অনুসারে মাহদীর আবির্ভাব হবে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে—মা-ওরায়েন নাহার কিংবা খোরাসান থেকে নয়। অনুরূপভাবে তাঁর নাম হবে আঁহযরত (স)-এর নামানুসারে—'হারীস হারাস' নয়। পরন্তু তিনি আরবী লশকরদের মাঝে আত্মপ্রকাশ করবেন—খোরাসানী বা তুরানী বাহিনীর মধ্যে নয়। সর্বোপরি এই ভুল ধারণাও হওয়া উচিত নয় যে, কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে যত সত্য-সাধকই আবির্ভূত হবেন, উক্ত বর্ণনাগুলোতে রসূলুল্লাহ (স) তাঁদের সবার নামই হিসেব করে বলে দিয়েছেন। বরং তিনি শুধু কতিপয় ব্যক্তি এবং কয়েকটি যুগের নামই উল্লেখ করেছেন। এর উদ্দেশ্য হলো, এ-ধরনের সুযোগ যখনই আসবে, সত্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সহায়তা করা প্রতিটি মুসলমানেরই অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়াবে—এই কথাটিকে গুরুত্ব সহকারে বুঝিয়ে দেয়া। কাজেই প্রতিশ্রুত মাহদী আসার পূর্বে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব থেকে জাতি নিষ্কৃতি লাভ করেছে—এই ভিত্তিহীন কল্পনার অন্তঃসারশূন্যতা কি এর থেকেই প্রকট হয়ে উঠে না।?

তাছাড়া বিষয়টি সম্পর্কে নীতিগত দিক থেকে চিন্তা করে দেখা দরকার যে, একটি মৌলিক দায়িত্বের প্রকৃতি কী দাবি করে? এটা তো এক প্রামাণ্য সত্য যে, ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাই প্রতিটি মুসলমানের একমাত্র জীবন লক্ষ্য। এই দায়িত্ব ও কর্তব্যের খাতিরে চেষ্টা-সাধনা করাই ঈমানের বাস্তব প্রমাণ। মুমিনের প্রকৃতি হলো মিথ্যা ও পাপের সঙ্গে তার কোন আপোস নেই এবং দুনিয়ার কোথাও তাদের অস্তিত্ব সে দেখতে পারে না। আর আল্লাহ্‌র বন্দেগী ও কুরবানী আনুগত্যের সর্বশেষ দাবি হলো, যতক্ষণ সত্য দ্বীনের কোন একটি অংশ নিষ্ক্রিয় থাকবে কিংবা দুনিয়ার একটি ধুলিকণাও মিথ্যার পদতলে নিষ্পিষ্ট হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানের চেষ্টা-সাধনা ক্ষান্ত হবে না। কাজেই প্রত্যেক মুমিনকে অনিবার্যভাবে এই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবেই—সর্বাবস্থায়, সকল যুগের সকল পরিবেশে এবং সকল জায়গায়ই চালাতে হবে। ইমাম মাহদী যখন আসবেন, তখন তিনি নিজের দায়িত্বই পালন করবেন—আপনার-আমার দায়িত্ব নয়। আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি যে কর্তব্যভার ন্যস্ত করবেন, সেই ভার বহন করার জন্যেই তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করবেন—অন্য কারো ভার তিনি তুলে নেবেন না, নিতে পারেন না। কাজেই তাঁর প্রয়াস-প্রচেষ্টা অন্য কোন মুসলমানের দায়িত্ব পালনের

স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। তিনি অন্যের পক্ষ থেকে যেমন নামায, রোযা ইত্যাদি পালন করবেন না, তেমনি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামও করবেন না। লোকেরা তো এখনই তার চেষ্টা-সাধনার ওপর ভরসা করে বসে রয়েছে, অথচ তাঁর অস্তিত্ব এখনো কল্পনার জগত থেকে বাস্তব জগতে আসেনি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, তিনি নিজের জমানায়ও কোন মুসলমানের তরফ থেকে কোন দ্বীনী কর্তব্য পালন করবেন না। তখনও প্রতিটি মুসলমানকে তাঁর মতই নিজের কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে হবে। অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ)-এর ভাষায়, 'প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের ক্রস নিজেরই বহন করতে হবে'। এবং যে ব্যক্তি বহন না করবে সে 'আসমানী বাদশাহী'তে প্রবেশ লাভ করবে না। এই সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক মুসলমানেরই এই দোয়া এবং কামনা অবশ্যই করা উচিত যে, তার যেন এমন সুদিন দেখবার সৌভাগ্য হয়, যখন জুলুম ও অশান্তিতে ক্লান্ত দুনিয়া শান্তি ও সুবিচারের রহমতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। কিন্তু কারও এক লহমার জন্যেও এই আত্মতুষ্টির প্রবঞ্চনায় পড়া উচিত নয় যে, কোন অনাগত মহাপুরুষের জীবনের বিনিময়ে এখন সমগ্র মুসলমানকেই তাদের মৌলিক দায়িত্ব–ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম থেকে নিষ্কৃতি দেয়া হয়েছে; নচেত খ্রীস্টানরা যেমন ধারণা করে রেখেছিল যে, ঈসা (আ) শূলে চড়ে তাদেরকে সৎকাজ করার সমস্ত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে গিয়েছেন, এটাও ঠিক তেমনি ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

আত্মজিজ্ঞাসার প্রয়োজন

ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য যে-সব 'দর্শন' পেশ করা হয়, উপরের বিস্তৃত আলোচনা তার গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা পরখ করে দেখা গেল। যদি এই আলোচনা সম্পর্কে শান্ত মনে চিন্তা করা হয় এবং দলীয়, রাজনৈতিক ও তকলিদী বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হয়ে খালেছ সত্যসন্ধ দৃষ্টিভঙ্গিতে নিজস্ব চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ড যাচাই করে দেখা হয়, তবে গাফলত ও বক্রচিন্তার ফলে আমাদের মানসিকতার ওপর যে অন্ধকার ছায়া ফেলে আসছে এবং আমাদের জীবন-লক্ষ্যকে নিষ্প্রভ করে রাখছে, তা অবিলম্বে দূরীভূত হতে পারে। কিন্তু এ কথা হামেশা মনে রাখতে হবে যে, নিজের জিজ্ঞাসাবাদের ব্যাপারে নফস অত্যন্ত ধোকাবাজির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। তার পক্ষে কোন অবাঞ্ছিত ও অপ্রীতিকর সত্যের মুকাবিলা করা বড়ই কষ্টকর ব্যাপার। এ কারণেই যে সত্য তার কাছে ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কুরবানী দাবি করে–শুধু জান-মালের কুরবানীই নয়, বরং আবেগ-উচ্ছ্বাস, ঝোঁক-প্রবণতা, জ্ঞান-বুদ্ধি, চিন্তা-কল্পনা এবং পুরনো কর্মনীতির ভালবাসা ও বিদ্বেষ পর্যন্ত–তার বিরুদ্ধে সে মিথ্যা ও ফেরেববাজি শেষ তীরটি পর্যন্ত নিক্ষেপ করে থাকে। কারণ শুধু

জানমালের কুরবানীর চাইতে এইসব জিনিসের কুরবানী কখনো কখনো অত্যন্ত কঠিন হয়ে থাকে। একদিক থেকে সত্যের আলো ঝিলিক দিয়ে ওঠে এবং মনও স্বতঃস্ফূর্ত বলে ওঠে, লক্ষ্য স্থল এইদিকে–অন্যদিক থেকে নফসের বাহানা ও অসঅসাও মাথা উঁচু করে এবং মানুষকে জিজ্ঞেস করে, এতদিনকার ছুটাছুটি ও প্রয়াস-প্রচেষ্টা তা হলে মিথ্যার পথে ছিল? সমকালীন পীর বুজর্গ, নেতৃবৃন্দ, আলেম সমাজ এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা কি তবে সবাই ভুল পথে চলছে? এই প্রশ্নগুলো মনস্তাত্বিক অস্ত্রে এমনি সুসজ্জিত হয়ে আসে যে, মানুষ এর খপ্পর থেকে খুব কমই বাঁচতে পারে। এর ফলে সে একটি জিনিসকে সত্য জেনেও তাকে সত্য বলে স্বীকৃতি দিতে পারে না। মানব প্রকৃতির এই স্বাভাবিক দুর্বলতা হামেশাই সত্যের আন্দোলনের পথ সবচাইতে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তার আনুগত্য দাবির জবাবে হতভাগ্য মানুষের জবান থেকে এই আওয়াজ উচ্চারণ করিয়েছেঃ

بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا (بقرة)

'আমরা তো সেই জিনিসেরই অনুসরণ করব, যার অনুসরণ করতে আমরা বাপ-দাদাকে দেখেছি।'

কাজেই সত্য ও পুণ্যপথের সত্যিকার সন্ধান পেতে চাইলে নফসের এই সর্বনাশা দুর্বলতা ও কুমন্ত্রণা থেকে মানুষকে পুরোপুরি সতর্ক থাকতে হবে। তার এই বিরাট নীতিকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, সত্য ও মিথ্যার মাপকাঠি কোন ব্যক্তি নয়–একমাত্র মুহাম্মাদ (স) ছাড়া; কোন দল নয় 'আসহাবে মুহাম্মদ' নামক দলটি ছাড়া। এই সত্যটি সামনে না থাকলে মানুষ তার চিন্তা ও কর্মের নিরপেক্ষ সমালোচনাই করতে পারে না। আর এ কাজটি না হলে হিদায়েত বা সুপথপ্রাপ্তির আশা করাই বাতুলতা মাত্র। কাজেই আলোচ্য বিষয়ে কেবল আল্লাহর কিতাব, রসূলের সুন্নাত এবং আসহাবে রসূলের আদর্শই আমাদের সামনে রাখা উচিত। যদি সত্য ও হেদায়েতের এই সকল উৎসের ভিতর একজন মুসলমানের জীবন-লক্ষ্য এটাই নির্দেশিত হয়ে থাকে যে, তার প্রতিটি নিশ্বাস ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চিন্তা, স্মরণ, প্রচেষ্টা ও সংগ্রামে ব্যয়িত হওয়া উচিত, তবে এই কাজের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করে দেয়া একান্তই কর্তব্য। সেই সঙ্গে এই উদ্দেশ্য ও সঙ্কল্পের পথে বাধা সৃষ্টিকারী প্রতিটি জিনিসকে–তা কোন পীর-মুরর্শিদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা হোক, কোন দলীয় সম্পর্ক হোক, কি আজ পর্যন্তকার চিন্তা ও কর্মধারা হোক দূরে নিক্ষেপ করা কর্তব্য। এই জিনিসগুলো যদি ঐ সত্য পথে চলতে বাধা দান করে তবে মনে করতে হবে যে, এগুলো হচ্ছে নফসের আবরণ এবং শয়তানের ফেতনা মাত্র। খোদা এই জিনিসগুলোকে

মানুষের জন্যে সৃষ্টি করে রেখেছেন শুধু তার সত্যপ্রীতির পরীক্ষার জন্যে। যে ব্যক্তি এই আবরণ ও ফেতনা ছিন্ন ও পর্যুদস্ত করে কর্তব্যের ডাকে সাড়া দেয়, সে নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যবান লোক। নচেত মনে রাখতে হবে যে, কোন ভক্তি-শ্রদ্ধা, সম্পর্ক-সম্বন্ধ ও বাহানা-অজুহাতই খোদার পাকড়াও থেকে আমাদের বাঁচাতে পারে না। বস্তুত যতক্ষণ পর্যন্ত মনের সামনে সত্যের রহস্য উদঘাটিত না হয়, ততক্ষণ মানুষকে কতকটা অক্ষম বলে মানা যেতে পারে। কিন্তু যখনি সত্য উন্মোচিত ও গোচরীভূত হয় এবং মন তার সত্যতাও স্বীকার করে নেয়, তখন মনে করতে হবে যে, যুক্তি-প্রমাণ সব পূর্ণ হয়ে যায় এবং অক্ষমতার দরজাও বন্ধ হয়ে যায়। এরপর হয় কর্মোদ্যম ও জীবন-সাফল্য রয়েছে, নতুবা রয়েছে কর্তব্যের অস্বীকৃতি ও ব্যর্থতার শাস্তি। কারণ, সত্যকে সত্য বলে জানার পর তার প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা কুরআনে বর্ণিত ফেরাউনী নীতি অনুসরণেরই শামিল। সে নীতিটি হলঃ

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوْا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا (نحل)

'যখন তাদের সামনে আমাদের স্পষ্ট নিদর্শনাদি এল, তখন তারা বললঃ 'এ-তো পরিস্কার যাদু'। আর তাদের মনে ঐ নিদর্শনাদির সত্যতা সম্পর্কে বিশ্বাস পোষণ করা সত্ত্বেও তারা জুলুম ও অবাধ্যতার কারণে সেগুলোকে অবিশ্বাস করল।'

আর এহেন নীতি অনুসরণের পরিণাম ফল কি হতে পারে, তা সবারই জানা কথা।

নিঃসন্দেহে, এটি অত্যন্ত কঠিন পথ। এর প্রতিটি পদক্ষেপও কন্টকাকীর্ণ। কিন্তু এছাড়া খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করার দ্বিতীয় কোন পথ নেই। কাজেই দুনিয়া ও আখেরাতকে বরবাদ করতে না চাইলে এ পথই আমাদের অবলম্বন করতে হবে। কারো পদতল যদি পথের কন্টক সইবার মত হিম্মত না রাখে তো তার জন্যে সর্বশেষ ও সহনযোগ্য কর্মনীতি হচ্ছে এই যে, সে যেখানে আছে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে। আর কেউ তার কাছে জিজ্ঞেস করলে তাকে অবশ্যই বলে দিবেঃ আমার নিজের এ-পথে চলবার তওফীক নেই বটে, কিন্তু সত্য ও মুক্তির রাজপথ হচ্ছে এটিই। কাল আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে কর্তব্যচ্যুতির সঙ্গে-সঙ্গে সত্য গোপন করার অপরাধে যাতে দোষী সাব্যস্ত হতে না হয়, এটা সে-জন্যেই করা দরকার। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার মধ্যে এতটুকু সৎ সাহসও না থাকলে নিজের পায়ের মত জবানও বিরত রাখা উচিত এবং কোন অবস্থায়ই

অন্যান্যদেরকে এপথ থেকে বিরত রাখার অপরাধ নিজের ঘাড়ে নেয়া উচিত নয়। কারণ এরূপ আচরণ হচ্ছে স্পষ্টত (صَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) অর্থাৎ আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখার শামিল। আর এ হচ্ছে এমন এক অভিশাপ, যার কল্পনা করতেই একজন মুসলমানের শিহরিত হয়ে ওঠা উচিত।

আজ মুসলিম জাতির কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দল এহেন দুর্ভাগ্যে লিপ্ত কিনা, এ-প্রশ্ন এখানে অবান্তর। কারণ, এরূপ পরিস্থিতি আজ না থাকলেও কাল আসতে পারে। পূর্ববর্তী জাতিগুলোর কৃতকর্ম সম্পর্কে হযরত ঈসা (আ)-এর নিম্নোক্ত বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ আশঙ্কাকে একেবারে অমূলক বলা চলে নাঃ

> 'হে কপট ধর্মবেত্তা! তোমাদের প্রতি আফসোস যে, তোমরা লোকদের জন্যে আসমানের বাদশাহীর দরজা বন্ধ করে দিচ্ছ। কারণ তোমরা নিজেরা তো সেখানে প্রবেশ করছই না–প্রবেশ লাভেচ্ছুদেরও প্রবেশ করতে দিচ্ছ না।' (মথিঃ অধ্যায়–২৩)

আমাদের প্রার্থনা এই যে, কোন মুসলমান সত্য-দুশমনীর এহেন অভিশাপে লিপ্ত হতে পারে–খোদা এমন দুর্দিন যেন কখনো না দেন।

ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কর্মনীতি

লক্ষ্যের সাথে কর্মনীতির স্বাভাবিক সম্পর্ক

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, সত্য দ্বীনের প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে আমাদের জীবনের আসল লক্ষ্য এবং কোন অজুহাত কিংবা বাহানাই এ-দায়িত্ব থেকে আমাদের অব্যাহিত দিতে পারে না। কাজেই এখন পূর্ণ অভিনিবেশ ও গুরুত্বের সাথে চিন্তা করা উচিত যে, এ লক্ষ্য অর্জনের জন্যে কিভাবে সংগ্রাম করতে হবে? এর জন্যে কি কোন বিশিষ্ট কর্মনীতি আছে? অথবা যে কোন দিক থেকেই এই গন্তব্যস্থলের দিকে যাত্রা করা যেতে পারে? যারা সমাজ-বিজ্ঞান সম্পর্কে সামান্য পড়াশুনাও করেছেন, তারা অবশ্যই জানেন যে, কোন বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে উত্থান ঘটেছে, এমন প্রত্যেকটি জাতিরই একটি বিশিষ্ট মেজাজ এবং একটি বিশিষ্ট চিন্তাধারা থাকে; তেমনি থাকে তার গঠন, সংগঠন ও পুনর্গঠনেরও একটি বিশিষ্ট ধরণ। তার চিন্তাধারার ন্যায় তার পুনর্গঠন পদ্ধতিও তার নিজস্ব লক্ষ্য–যে লক্ষ্য নিয়ে জাতির উত্থান ঘটে থাকে–নির্ধারণ করে থাকে।

এই নীতিগত সত্যটিকে কতিপয় দৃষ্টান্তের সাহায্যে উত্তমরূপে অনুধাবন করা যেতে পারেঃ

মনে করা যাক, আমাদের একটি জাতীয় রাষ্ট্র কায়েম করতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে আমাদের কয়েকটি কাজ করতে হবেঃ প্রথমত, আপন জাতির লোকদের মনে স্বাদেশিক উন্নতি ও জাতীয় শাসনক্ষমতর আসক্তি পুরোপুরি জাগিয়ে তুলতে হবে; তাদের মধ্যে নিজেরাই নিজেদের শাসনকর্তা হবার প্রত্যয় ও সঙ্কল্প পয়দা করতে হবে; পরন্তু জাতীয় মর্যাদার খাতিরে বিলীন হবার জন্যে তাদের মধ্যে আত্মোৎসর্গের আগুন জ্বালাতে হবে এবং নিজেদের এই প্রিয় লক্ষ্য অর্জন করার জন্যে তাদের শক্তিসামর্থ্যকে একটি নির্দিষ্ট প্লাটফর্মে জমায়েত করতে হবে। এই কাজগুলো যখন সমাধা করা হবে, তখন বুঝতে হবে যে, কামিয়াবির তামাম শর্তই পূর্ণ করা হয়েছে। এরপর আর এটা মোটেই দেখবার প্রয়োজন নেই যে, আমাদের পতাকাতলে যারা সমবেত হয়েছে, তারা তওহীদ, রিসালাত, কিয়ামত ও কর্মফল সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করে? তারা দ্বীন-ইসলামের কতটা আনুগত্য করে? তারা সততা, দয়ার্দ্রতা, পবিত্রতা, সৎ স্বভাব, খোদাভীতি ইত্যাকার গুণরাজি দ্বারা নিজেদেরকে কতখানি বিভূষিত

করেছে? এর ভিতর থেকে কোন একটি জিনিসও দেখবার প্রয়োজন নেই। কারণ, যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আমাদের সামনে রয়েছে, তার পক্ষে এ-জিনিসগুলো মোটেই বাঞ্ছিত নয়, বরং কতকটা ক্ষতিকর। এখানে ঈপ্সিত জিনিস হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলোর সঙ্গে অন্ধ দুশমনী এবং আপন জাতির প্রতি নির্বিচার ভালবাসা পোষণ এবং এই দুশমনী ও ভালবাসার মাধ্যমেই সব কিছু সম্পাদন করা।

এমনিভাবে দেশে কেউ কম্যুনিস্ট শাসন ও কম্যুনিস্ট জীবন পদ্ধতি কায়েম করতে চাইলে প্রথমত এখানকার অধিবাসীদের মন-মগজে কম্যুনিস্ট জীবনদর্শন, কম্যুনিস্ট অর্থ ও রাষ্ট্রনীতি এবং কম্যুনিস্ট নীতিশাস্ত্রের 'গুণাবলী' বদ্ধমূল করতে হবে। লোকদের মনে শুধু পুঁজিবাদই নয়, বরং পুঁজিবাদের বিরুদ্ধেও তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করতে হবে। ধর্মবাদী লোকদের মনে খোদা ও রসূল সম্পর্কে যেরূপ প্রত্যয়ের সৃষ্টি হয়, মার্কস ও লেনিন সম্পর্কেও তেমনি প্রত্যয়ের সৃষ্টি করতে হবে এবং খোদা, রসূল, আখেরাত, ধর্ম, নৈতিকতা, সৎকর্ম ইত্যাদি বিষয়কে স্বার্থপর পুঁজিবাদীদের মনগড়া ছল-চাতুরী আখ্যা দিয়ে এবং মানুষের মন-মগজ থেকে এগুলোর প্রভাব নিশ্চিহ্ন করে তার ওপর নিরেট জড়বাদী জীবন-দর্শন ও জৈবিক বিশ্বদর্শনের ছাপ এঁকে দিতে হবে। পরন্তু এই ভিত্তিগুলো যখন স্থাপিত হবে এবং এক বিপুল সংখ্যক লোককে এই চিন্তাধারা ও মতবাদের অনুসারী করে তোলা হবে, তখন তাদের একটি সংঘবদ্ধ দল গঠন করে একদিকে জনসাধারণকে নিজেদের প্রোপাগাণ্ডা দ্বারা প্রভাবিত করার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে, অন্যদিকে গোপন ও প্রকাশ্য সম্ভাব্য তামাম উপায়ে প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থাকে উৎখাত করার অভিযান শুরু করতে হবে। এমনিভাবে জনগণের হাতে শাসন ব্যবস্থা উৎখাত হয়ে কম্যুনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

অনুরূপভাবে কেউ যদি সংঘবদ্ধভাবে দস্যুবৃত্তি করতে চায়, তবে এমন লোকদেরকেই সে তালাশ করবে, যারা হবে শক্ত-দেহ, নির্ভীক হৃদয় ও রক্তপিপাসু চরিত্রের অধিকারী। যাদের হৃদয় দয়ার্দ্র, রক্তপাত ও হত্যাকাণ্ডকে যারা ঘৃণা করে—এমন লোকেরা তার কোনই কাজে আসবে না। এই ধরনের লোকদের সংগ্রহ করার পর সে তাদের মধ্যে উপরোক্ত 'জরুরী ও কার্যকরী' গুণাবলী আরো স্থিতিশীল করে তোলার চেষ্টা করবে। তাদেরকে লুঠতরাজ শিক্ষা দেবে, অস্ত্রপাতি সরবরাহ করবে। এরপরই সে কোথাও গিয়ে নিজের ঈপ্সিত কাজ শুরু করতে পারবে।

ফলকথা, দুনিয়ার প্রত্যেকটি লক্ষ্যাভিসারী জাতিরই অবস্থান হচ্ছে এইরূপ। সে নিজের মধ্যে এমন লোকদেরই শুধু স্থান দিয়ে থাকে, যারা তার লক্ষ্য ও

উদ্দেশ্যের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ পোষণ করে এবং সেই উদ্দেশ্যের প্রকৃতির সঙ্গে পুরোপুরি সুসামঞ্জস্য কর্মনীতি ও কর্মধারা অবলম্বন করে। 'উম্মতে মুসলিমা' বলে আখ্যাত জাতি এবং দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেও এই সার্বজনীন নীতির ব্যতিক্রম হতে পারে না। এই লক্ষ্যটি অর্জনের জন্যেও একটি বিশেষ কর্মনীতি থাকা উচিত। এবার সে কর্মনীতির প্রতিই আমরা আলোকপাত করব।

কর্মনীতির উৎস

এই উদ্দেশ্যে আমাদের দৃষ্টি স্বভাবতই কুরআন ও সুন্নাহর প্রতি গিয়ে নিবদ্ধ হয়। কেননা, যেখান থেকে দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠা আমাদের জীবনের কর্তব্য বলে সাব্যস্ত হয়, সে কর্তব্য পালন করার নীতিও ন্যায়ত সেখান থেকেই পাওয়া উচিত।.এখন প্রশ্ন হল, কুরআন ও সুন্নাহ কি আমাদের এই প্রয়োজনটি অনুভব করেছে? এর জবাব যে কোন দিক থেকেই ইতিবাচক। ইসলাম সম্পর্কে যার সামান্য জ্ঞান আছে, তিনিও একথা ভাল করেই জানেন যে, কুরআন ও কুরআনের ধারক যেভাবে মুসলিম জাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেছেন, তেমনি তার কর্মনীতি সম্পর্কেও তিনি কোন অস্পষ্টতা রেখে যাননি। তাই একমাত্র অন্ধ ছাড়া যে কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তিই কুরআন ও হাদীসের পাতায় পাতায় এই কর্মনীতি উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান রূপে দেখতে পারে—যেমন অন্ধকার রাত্রির আসমানের বুকে দেখা যায় দীপ্যমান তারকারাজি। কুরআন, কুরআনের অবতরণ-পদ্ধতি এবং কুরআনের ধারকের জীবনাদর্শ—এই তিনটি জিনিসই এই কর্মনীতির স্পষ্ট সন্ধান বলে দেয়। দৃশ্যত এ তিনটি জিনিসকে পৃথক পৃথক বলে মনে হয়, কিন্তু আলোচ্য লক্ষ্যের দিক থেকে তিনটি জিনিসই মুলত এক। কুরআনের আয়াত হচ্ছে এ-ক্ষেত্রে মুলভিত্তির তুল্য আর বাকী জিনিস দু'টি হচ্ছে তারই অনুগামী ও উপকরণ মাত্র, এ-কারণেই দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার মূলনীতি ও কর্মধারার মৌল ব্যাখ্যা আমাদের তার থেকেই নেয়া উচিত।

ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কুরআনী নীতি

ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে যেসব নিয়ম-নীতি অবলম্বন করা দরকার, কুরআনে হাকীম অধ্যয়ন করলে তা' অতি সহজেই জানা যেতে পারে। বরং প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এই নিয়ম নীতির বিস্তারিত বিবরণ দ্বারা গোটা কুরআনই পরিপুর্ণ। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত জিনিস। কারণ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাই যখন তার মূল ও কেন্দ্রীয় বিষয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই তার গোটা আলোচনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তার নীতি, পদ্ধতি ও মাধ্যমের

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থাকা উচিত। কিন্তু কুরআন তার বক্তব্য-বিষয়কে মানব মনে পুরোপুরি বদ্ধমূল করে দেবার এবং ভালমত সুরক্ষিত রাখার জন্যে কোন জরুরী বা সংক্ষিপ্ত পন্থা অবলম্বন করেনি। এই কারণেই ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মূলনীতি ও কর্মনীতিকে যেমন সে অসংখ্য পৃষ্ঠা জুড়ে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছে এবং বিভিন্ন জায়গায় তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করেছে, তেমনি কোন কোন জায়গায় তা সমষ্টিগতভাবেও বিবৃত করা হয়েছে। এতে কয়েকটি মাত্র বাক্যের মধ্যেই তার পুরো চিত্র যুগপৎ দেখা যেতে পারে। এ-ধরনের 'সমষ্টিবাচক বাক্যে'র মধ্যে সবচাইতে বেশী সমষ্টিবাচক ও বিস্তৃত অর্থবোধক আয়াতসমূহ হচ্ছেঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ*
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ
كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ....
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ* وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ (ال عمران)

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে সঠিকরূপে ভয় কর এবং মুসলিম অবস্থা ছাড়া দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করো না। তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রুজ্জ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর সেই অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন তোমরা একে অপরের দুশমন ছিলে; অতঃপর তিনি তোমাদের হৃদয়কে পরস্পর জুড়ে দিলেন আর তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই-ভাই হয়ে গেলে। ....আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা লোকদেরকে সুকৃতির দিকে ডাকবে আর দুষ্কৃতি থেকে বিরত রাখবে। এ-ধরণের লোকেরাই হচ্ছে কল্যাণপ্রাপ্ত। আর (দেখ) তোমরা সেই সব লোকের মত হয়ে যেও না, যারা স্পষ্ট পথ-নির্দেশ লাভের পরও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে এবং মতানৈক্যে লিপ্ত হয়েছে।' (আল-ইমরান)

এই আয়াতসমূহ মদীনার প্রাথমিক পর্যায়ে, অর্থাৎ হিজরী ৩ সালে অবতীর্ণ হয়েছিল। এটা ছিল মুসলিম জাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের ভিত্তি স্থাপন ও সংগঠনের পর্যায়। ঠিক এ-সময়েই ইসলামী জীবন ও রাষ্ট্রব্যবস্থার এক সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক প্রোগ্রাম নিয়ে এ-আয়াত ক'টি খোদার তরফ থেকে

অবতীর্ণ হয়। এতে শুধু ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বাস্তব কর্মনীতিই নির্দেশ করা হয়নি, বরং সে কর্মনীতিতে কি ধারাক্রম অবলম্বন করা উচিত স্পষ্ট তাও বলে দেয়া হয়েছে। পরন্তু এই লক্ষ্য অর্জনের সংগ্রাম কোন কোন পর্যায় অতিক্রম করে আপন লক্ষ্য স্থলে গিয়ে উপনীত হয়, উল্লিখিত প্রোগ্রাম সম্পর্কে একটু তলিয়ে চিন্তা করলে তার তিনটি অংশ বা ধারা গোচরীভূত হবেঃ (১) খোদাভীতি, (২) সশৃঙ্খল সংগঠন এবং (৩) সুকৃতির আদেশ ও দুষ্কৃতির প্রতিরোধ। এই তিনটি ধারা হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মৌলিক কর্মনীতি। এগুলোকে একটু বিস্তৃত করে বললে দাঁড়ায় এইঃ

(১) তাকওয়া বা খোদাভীতি

ইসলামী জীবন ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে সর্বপ্রথম যে জিনিসটির আবশ্যক এবং যাকে এ পথের প্রথম শর্ত আখ্যা দেয়া উচিত তা اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ* আয়াতে বিবৃত হয়েছে। আয়াতটির তাৎপর্য হলঃ যে-ব্যক্তি নিজেকে ঈমানদার বলে দাবি করে এবং সেই ঈমানের দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি লাভের ইচ্ছা পোষণ করে, তার পক্ষে 'তাকওয়া' বা খোদাভীতি অবলম্বন করা এবং জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তে 'মুসলিম' হিসেবে জীবন যাপন করা একান্ত অপরিহার্য। কুরআনের ভাষায় 'তাকওয়ার' বাস্তব ও পূর্ণাঙ্গ অর্থ হলোঃ আল্লাহ তা'য়ালার সমস্ত বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালন করা এবং তার কোন আদেশ লংঘন বা নিষিদ্ধ কাজ সম্পাদনে ভয় করা। অনুরূপভাবে সাচ্চা, ফর্মাবর্দার ও নিষ্ঠাবান আনুগত্যকারীদের বলা হয় 'মুসলিম'। অন্যকথায়, যে ব্যক্তি খোদায়ী বিধানের সামনে স্বেচ্ছায় মাথা নত করে দিয়েছে, তাকেই বলা হয় মুসলিম। এই দু'টি পরিভাষার অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নির্দিষ্ট কর্মসূচীর প্রথম অংশ বা ধারা হলোঃ প্রতিটি মুসলমানকে সর্বপ্রথম নিজের জীবনেই আল্লাহর দেয়া জীবন-ব্যবস্থাকে কায়েম করতে হবে। তার ভয়-ভীতিও আশা-আকাঙ্ক্ষার সমস্ত প্রার্থনাকে আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট করে দিতে হবে; সমস্ত ভক্তি-শ্রদ্ধাও অনুনয়-বিনয়কে তাঁরই সন্তুষ্টির জন্যে উৎসর্গ করতে হবে। সকল আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়ে কেবল সেই এক প্রভুর আনুগত্যের বেড়িই গলায় পরিধান করতে হবে। নিজের নফসকে তাঁর অসন্তুষ্টি সৃষ্টিকারী সকল বিষয় থেকে মুক্ত করে তাঁর সন্তুষ্টি বিধানকারী গুণরাজিতে ভূষিত করতে হবে। নিজেকে আল্লাহ তায়ালার সার্বক্ষণিক গোলাম ভাবতে হবে এবং তার কোন আদেশ পালনেই গড়িমসি ও সঙ্কোচবোধ করা যাবে না। নিজের দৃষ্টিকে হামেশা আল্লাহ তায়ালার সন্তোষ লাভ ও হুকুমবর্দারির প্রতি নিবদ্ধ করে রাখতে হবে। এ পথে যতই বিরুদ্ধতা,

দুর্বিপাক, প্রতিকূলতা ও হতাশা আসুক না কেন, নিজের দৃষ্টিকে কখনো লক্ষ্যচ্যুত করা যাবে না। কার, এই জিনিসগুলো দৃশ্যত কষ্টকর ও দুঃখজনক সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রকৃত সত্যপ্রীতি ও খোদাভীতির জন্যে এগুলো হচ্ছে অপরিহার্য পরীক্ষার স্তর। এই স্তরগুলো অতিক্রম না করলে কারো ঈমান ও তাকওয়াই খোদার কাছে বিশ্বাস ও গৃতীত হতে পারে না। তাই কুরআন ঘোষণা করেছেঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ .... الخ (بقرة: ١١)

আমরা অবশ্যই ভয়, বিপদ, অনশন এবং ধর্মপ্রাণও উৎপাদনের ক্ষতি দ্বারা তোমাদের অর্থাৎ তোমাদের ঈমানের দাবিকে পরীক্ষা করব। হে নবী! যারা ধৈর্য ও সংযমের দ্বারা (এই সকল বিপদ ও ক্ষয়ক্ষতিকে) সহ্য করবে, তাদেরকে (সাফল্যের) সুসংবাদ দাও।

أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ*

(عنكبوت)

লোকেরা কি মনে করেছে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি', এই কথাটুকু বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে এবং এ ব্যাপারে তাদের পরীক্ষা করা হবে না? অথচ তাদের পূর্ববর্তী লোকদেরও আমরা পরীক্ষা গ্রহণ করেছি। অতএব, তোমাদের মধ্যে কে (ঈমানের দাবিতে) সর্তবাদী আর মিথ্যাবাদী, আল্লাহ্ তা অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখবেন।

কাজেই এই জিনিসগুলো দেখে ঘাবড়ানোর পরিবর্তে ধৈর্য ও স্থৈর্যের সাথে এগুলোর মুকাবিলা করা উচিত। নচেত যে-হৃদয় এই সব বাধা-বিপত্তি দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে, তা কখনো ঈমানের স্বাদ উপভোগ করতে পারে না। আর যে বক্ষদেশে এহেন পরীক্ষার মুকাবিলা করার মত হিম্মত থাকে না, তা কখনো তাকওয়ার আলোয় উদ্ভাসিত হতে পারে না। বস্তুত, যে-ব্যক্তি আল্লাহর নির্ধারিত সীমা-সংরক্ষণ ও কুরবানী বিধি-ব্যবস্থার অনুবর্তনে নিজের জান, মার, দল, গোত্র, জাতি ও দেশের তথাকথিত স্বার্থের জন্যে আগে থেকেই চিন্তান্বিত হয় এবং সত্যের আনুগত্যের জন্যে জান ও মালের পূর্ণ নিরাপত্তার শর্ত আরোপ করে–সে নিজের ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে বড়ই ধোকার মধ্যে রয়েছে। এমন ব্যক্তির মুখে অবশ্য ইসলাম এবং চেহারা-সুরাতে তাকওয়ার নিদর্শন থাকতে পারে, কিন্তু তার ভিতরে এ সবের জন্যে স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

ফলকথা, ঈমানদার লোকদের পরীক্ষা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার একটি সাধারণ নীতি। এই নীতির তাগিদেই তিনি ইসলাম ও তাকওয়ার পথকে বিপদাপদ ও দুর্যোগের পাহাড়ে পুরপূর্ণ করে রেখেছেন। কাজেই যে-ব্যক্তি اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ এর খোদায়ী আদেশ পালন করতে ইচ্ছুক, তার পক্ষে ঐ পাহাড়ের সঙ্গে সংঘর্ষ-মুখর হওয়া এবং তার আঘাতকে বরদাশ্‌ত করা অপরিহার্য।

(২) সুশৃঙ্খল সংগঠন

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা প্রোগ্রামের দ্বিতীয় ধারাটি وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوا এই আয়াতাংশে বিবৃত হয়েছে। এই আয়াতাংশে যে বিষয়টির নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা দু'টি অংশে বিভক্তঃ প্রথমত, তামাম ঈমানদার লোকেরা–যারা খোদায়ী বিধান ও সীমারেখার অনুবর্তনে তৎপর এবং নিজেদের ব্যক্তিগত সংশোধন ও পরিশুদ্ধির জন্যে সচেষ্ট–সমবেতভাবে একটি সুদৃঢ় ও সুশৃঙ্খল জামায়াত গঠন করবে এবং গোটা জামায়াত একই দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ন্যায় পরস্পর সম্পৃক্ত হবে। দ্বিতীয়ত, এই ভাবে তাদেরকে সম্পৃক্ত রাখার জন্যে কোন গোত্রীয় ও স্বাদেশিক সম্পর্ক, কোন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ, কোন পার্থিব ও বস্তুগত উদ্দেশ্যে নয়–'আল্লাহর রজ্জু'ই হবে মূল-সূত্র। অর্থাৎ প্রতিটি মুসলমান তার বন্দেগীর জন্যে যে-প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছে অথবা যে-কুরআনের অনুবর্তনে এক ব্যক্তি মুসলমান হয়ে থাকে কিংবা যে-দ্বীনের আনুগত্য ও প্রতিষ্ঠার জন্যে মুসলিম জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা-ই হবে তাদের একমাত্র ঐক্যসূত্র। ফলকথা, জাতির সুসংহত ও সংঘবদ্ধ থাকাটা যেমন জরুরী বিষয়, তেমনি এই সংহতি, শৃঙ্খলা ও ঐক্যের সূত্র হবে কেবল আল্লাহর রজ্জু (حبل الله) বরং একটু তলিয়ে দেখলে তো এটাকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে–এতখানি গুরুত্বপুর্ণ যে, কোন কোন নিরুপায় অবস্থায় তো জাতীয় ঐক্য ও সংগঠন ছাড়াও ঈমানদার ব্যক্তি খোদার দরবারে মার্জনা ও নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে; কিন্তু এই ঐক্য ও সংগঠনের মূল সূত্রকে কোন অবস্থায়ও বর্জন করা হলে তার জন্যে খোদার জিজ্ঞাসাবাদ থেকে কখনো নিস্তার পাওয়া যাবে না। কাজেই এই ভ্রান্তি করো মধ্যেই থাকা উচিত নয় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে শুধু ঐক্যই–তা যে-কোন উদ্দেশ্যে ও ভিত্তির ওপরই হোক না কেন–বুঝি কাম্য ও ঈপ্সিত। বরং প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ঐক্যের ভিত্তি যদি কোন বাতিল উদ্দেশ্য হয়, তবে তা শুধু ইসলামের দৃষ্টিতে অবাঞ্ছিতই নয়, চরম ঘৃণিত এবং অভিশপ্তও। এমন কি চোর-ডাকাতদের মধ্যকার ঐক্য থেকে এই ঐক্যের তিল পরিমাণও পার্থক্য নেই। বস্তুত যে ঐক্যের ভিত্তি হচ্ছে সত্যের আনুগত্য ও প্রতিষ্ঠা, ইসলাম কেবল তেমন ঐক্যই দাবি করে।

অবশ্য একটু তলিয়ে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, ইসলামী জীবন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত কর্মসূচীর এই ধারাটি প্র্যথম ধারা থেকে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন কোন জিনিস নয়, বরং তারই একটি স্বাভাবিক দাবি। একজন শিক্ষার্থীকে তার নিজস্ব মানস-প্রকৃতিই অন্যান্য সহপাঠীর সঙ্গে আন্তরিকতা, হৃদ্যতা ও প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য করে। একজন শিক্ষিত ও জ্ঞান-পিপাসু ব্যক্তির রুচিজ্ঞান ও স্বভাবধর্মই তাকে বিদ্বান ও বিচক্ষণ লোকদের সাহচর্য অবলম্বনে অনুপ্রাণিত করে। অনুরূপভাবে একজন সদাপ্রফুল্ল ব্যক্তি তারই মত একজন জিন্দাদিল লোকের প্রতি স্বভাবতই আকৃষ্ট না হয়ে পারে না। যদি কোন শিক্ষার্থী তার সহপাঠীদের সঙ্গে, কোন শিক্ষিত ব্যক্তি বিদ্বান লোকদের সাথে, কোন সদানন্দ ব্যক্তি জিন্দাদিল লোকদের সঙ্গে কোনরূপ সম্পর্ক স্থাপন না করে, তবে যথার্থ অর্থে সে ছাত্র, শিক্ষিত ও সদাপ্রফুল্ল লোকই নয়। সাধারণ ভাষায় সমপ্রকৃতির এই টানকেই বলা হয় সমশ্রেণীর আকর্ষণ। নীতিগতভাবে ধর্মভীরু লোকদের মধ্যেও এই সমশ্রেণীর আকর্ষণ ক্রিয়াশীল হওয়া উচিত এবং তা হয়েও থাকে। এক ব্যক্তির হৃদয় যখন খোদাপরস্তির ভাবধারায় পরিপূর্ণ হয়, তখন সে তারই মত সত্যের অনুবর্তী ও তাকওয়ার মাধুর্য গ্রহণকারী লোকদের প্রতি স্বভাবতই আকৃষ্ট হয়। দু'টি হৃদয়ে সত্যিকার খোদাপরস্তি বর্তমান থাকবে আর তা সত্ত্বেও তারা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন ও সম্পর্কহীন হয়ে থাকবে–এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। বরং তাদের পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টি হওয়া অনিবার্য। যদি এরূপ না হয় তো বুঝতে হবে যে, খোদাপরস্তির খোলসের ভিতরে অন্য কোন ভাবধারা প্রতিপালিত হচ্ছে। কারণ, একই মনযিল ও একই পথের দুই পথিক একে অপরের কাছে নিঃসম্পর্ক হয়ে থাকতে পারে না। এই কারণেই দেখা যায় যে, কুরআনের কোথাও মুসলমানদের পরিচয় দেয়া হয়েছেঃ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ এবং بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ শব্দাবলী দ্বারা আবার কোথাও তাদের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা হয়েছে رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ এবং أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ শব্দাবলীর সাহায্যে; যেন ইসলামের অনুবর্তীদের পরস্পরে সম্মিলিত থাকাটাই হচ্ছে তাদের ঈমান ও খোদাপরস্তির মাপকাঠি। কুরআনের দৃষ্টিতে ঈমানদার লোকদের পক্ষে এই গুণটি অর্জন করা কতখনি গুরুত্বপুর্ণ তা বুঝতে হলে এর নেতিবাচক দিক সম্পর্কিত কতিপয় বিধির ওপর আলোকপাত করা প্রয়োজন। এর একটি বিধি হলঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا اٰبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا
الْكُفْرَ عَلَى الْإِيْمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ*

(توبة: ٢٣)

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের বাপ ও ভাইয়রা যদি ঈমানের মুকাবিলায় কুফরকে অগ্রাধিকার দেয়, তা'হলে তাদেরকে আন্তরিক বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক বানিও না; তোমাদের মধ্যে যারাই এরূপ করবে, তারা জালেম বলে গণ্য হবে। (তাওবাঃ ২৩)

এর থেকে জানা গেল যে, একজন খাঁটি মুমিন ও মুত্তাকী অন্যান্য মুমিন ভাইদের থেকে–তারা বংশীয় ও গোত্রীয় দিক থেকে তার অপরিচিতই হোকনা কেন–বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে না। অনুরূপভাবে সে পাপাচারী ও খোদাদ্রোহী লোকদের সাথেও–তারা নিকটতম আত্মীয়-স্বজনই হোক না কেন–আন্তরিক হৃদ্যতা রাখতে পারে না। এমন কি, কুরআন এর সম্ভাবনাও স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। এ সম্পর্কিত অপর একটি আয়াতে কথাটি ব্যাখ্যা করা হয়েছেঃ

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْۤا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ (مجادلة: ٢٢)

তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান পোষণকারী কোন দলকে সেইসব লোকের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ পাবে না, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের শত্রুতা ও বিরুদ্ধতায় দৃঢ়সঙ্কল্প–তারা তার আপন পিতা, পুত্র, ভাই কিংবা বংশীয় লোকই হোক না কেন। (মোজাদিলাহঃ ২২)

এই ঘোষণাগুলো থেকে এ-সত্য একবারে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মানবীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঈমানী বন্ধনের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। একদিকে সে বিভিন্ন বংশ ও গোত্রের লোকদেরকে পরস্পর ভাই-ভাই বানিয়ে যুক্ত করে দেয়, অন্যদিকে তার প্রচণ্ড শক্তি তামাম পার্থিব বন্ধনকে নিষ্প্রাণ ও অকেজো করে ফেলে। এ হচ্ছে একটি সূর্যের মত–এর সামনে গোটা তারকারাজিই অনুজ্জ্বল ও দীপ্তিহীন হয়ে যায়। পরন্তু ঈমানের এই নেতিবাচক ক্রিয়াকাণ্ড তার ইতিবাচক ক্রিয়াকাণ্ডকে অধিকতর শক্তিশালী করে দেয় এবং ঈমানদার লোকদের মধ্যকার ঐক্যকে অত্যন্ত সুদৃঢ় করে তোলে।

ফলকথা, একটি সুনির্দিষ্ট নীতি ও লক্ষ্যের অনুসারী অন্যান্য দলগুলো তাদের সভ্যদের যতখানি শৃঙ্খলার দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে, আল্লাহর দীন তার অনুবর্তীদেরকে তার চাইতেও বেশী দৃঢ়তার সাথে সম্পৃক্ত হবার নির্দেশ দিয়েছে। অনৈক্য ও মতভেদকে সে যারপরনাই ঘৃণ্য কাজ বলে গণ্য করে এবং তাকে সত্য দীনের সম্পূর্ণ প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করে। এমনকি, জনৈক পয়গম্বর [হযরত হারুন (আ)] তাঁর কওমের অধিকাংশ লোককে স্পষ্ট মূর্তিপূজায় লিপ্ত হতে দেখেও তাদেরকে শুধু মৌখিক উপদেশ দান পর্যন্তই ক্ষান্ত রইলেন এবং কওমের ঐক্য ও

সংহতি হয়ত বিনষ্ট হবে–এই আশঙ্কায় তিনি তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ থেকেও বিরত রইলেন। অতঃপর হযরত মূসা (আ) যখন সিনাই পাহাড় থেকে প্রত্যাবর্তন করে এই ব্যাপারে কঠোর জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, তখন তিনি ওজর পেশ করে বললেনঃ خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (আমি ভয় করেছি যে, আপনি এসে বলবেনঃ তুমি বনী ইসরাঈলের মধ্যে অনৈক্যের সঞ্চার করেছ।)

(৩) সুকৃতির আদেশ ও দুষ্কৃতির প্রতিরোধ

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা প্রোগ্রামের তৃতীয় ভিত্তি وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ এই আয়াতে বিবৃত হয়েছে। এর তাৎপর্য হলঃ ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ জীবনে সত্য দ্বীন কায়েম করা এবং এমন লোকদের পরস্পর মিলিত হয়ে একটি জামায়াত গঠন করাই যথেষ্ট নয়, বরং এই দু'টি জিনিসের সঙ্গে যে 'কল্যাণ ও সুকৃতি'কে তাঁরা গ্রহণ করেছে, তার দিকে অন্য লোকদেরও আহবান জানানো এবং যে 'দুষ্কৃতি'কে বর্জন করেছে, তাকে নির্মূল করার জন্যে অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাওয়াও আবশ্যক। এমনকি খোদার দুনিয়া থেকে তাঁর দ্বীন ছাড়া অন্য দ্বীনের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

বস্তুত এই প্রোগ্রামের দ্বিতীয় ধারাটি যেমন প্রথম ধারারই অনিবার্য দাবি, তেমনি এই তৃতীয় ধারাটিও তার স্বাভাবিক পরিণতি। এটা তার প্রকৃতির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কোন পৃথক ও স্বতন্ত্র বিধান নয়। সুকৃতির আদেশ কিভাবে ঈমান ও তাকওয়ার স্বাভাবিক দাবি, ঈমান ও তাকওয়ার স্বরূপ ও তাৎপর্য সম্পর্কে একটু তলিয়ে চিন্তা করলেই এটা সহজে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঈমান ও তাকওয়ার যথার্থ প্রাণবস্তু কি? শুধু আল্লাহ তায়ালার প্রতি প্রীতিপূর্ণ শ্রদ্ধা। কোন প্রীতিপূর্ণ শ্রদ্ধা প্রীতিভাজনের সন্তুষ্টির জন্যে কী দাবি করে? চারদিকে তারই খ্যাতি ও কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা। নচেত প্রীতিভাজনের ইচ্ছাকে পদদলিত হতে দেখেও যে-হৃদয় অস্থির হয়ে উঠে না, সে হৃদয় জীবন্ত প্রীতিতে পরিপূর্ণ–একথা কে বলতে পারে? কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়ার বুকে বাতিল ও অসত্যের চিহ্ন পর্যন্ত বর্তমান থাকবে ততক্ষণ খোদার প্রতি ভালবাসা ও সত্যের আকর্ষণ কোন খোদাপরস্ত ব্যক্তিকে আদৌ নিশ্চিন্তে বসে থাকতে দিতে পারে না। কোন ব্যক্তি, দল বা দেশকে সে আল্লাহর দ্বীনের বন্ধন থেকে মুক্ত এবং শয়তানী শক্তির অনুগত দেখবে আর শান্ত মনে তাকে বরদাশত করে নিবে, এটা ইসলাম ও ঈমানের সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাপার। কাজেই ইসলামের অনুবর্তীদের সংগঠন সুকৃতির আদেশ দানের ব্যাপারে উদাসীন হলে ইসলামী জীবন প্রতিষ্ঠার কর্তব্য পালিতই হতে পারে না। ঈমানদার লোকেরা যদি নিজেদের জীবন পর্যন্তই খোদায়ী বিধানের অনবর্তনকে

যথেষ্ট মনে করে নেয় এবং বাকী দুনিয়ার ব্যাপারে তাদের কোন ভ্রুক্ষেপই না থাকে, তা'হলে اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ※ এর নির্দেশ শুধু পালনের আকাঙ্ক্ষা পর্যন্তই সীমিত থেকে যাবে।

তাছাড়া, সুকৃতির আদেশ দানের ব্যাপারটি আরো একটি দিক থেকে মুমিন, মুসলিম ও মুত্তাকী হবার স্বাভাবিক দাবির মধ্যে শামিল হয়ে আছে। তাহলো আল্লাহর বান্দাদের প্রতি ভ্রাতৃত্ব, ভালবাসা ও কল্যাণ কামনার দিক। যে-ব্যক্তি ইসলাম সম্পর্কে অবহিত, তার এটা অনবহিত থাকার কথা নয় যে, খোদার সৃষ্টিকে ভাল না-বাসা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে ভালবাসা করার হক কিছুতেই আদায় হতে পারে না। কারণ, খোদার সৃষ্টিকে রসূল (স) তাঁর 'পরিবার' বলে আখ্যা দিয়েছেন (الخلق عيال الله - بيهقى) এবং তার কল্যাণ-কামনাকে ঈমানের নিদর্শন বলে অভিহিত করেছেন لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مسلم। মানুষের কল্যাণ-কামনার বহুতরো উপায় হতে পারে। কিন্তু মানুষকে গোমরাহী, দুষ্কৃতি ও ধ্বংসের পথ-যে পথে চলার ফলে মানুষের ইহকাল ও পরকালে আযাবে পরিণত হয়-থেকে বাঁচানোর চাইতে তার কল্যাণ-কামনা আর কিছু হতে পারে না। কাজেই কোন মুমিন যখন তার অন্যান্য সধর্মী ভাইদেরকে দুষ্কৃতি ও পাপাচার থেকে বিরত রাখার এবং পুণ্য ও সুকৃতির পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করে, তখন সে কোন বাহ্য কারণের তাগিদে করে না, বরং তাঁর ঈমানের সৃষ্ট কল্যাণ-কামনার প্রেরণায়ই করে থাকে। তার ঈমান যেমন অন্নহীনকে আহার করাতে, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান করতে এবং দুর্বল ও অসহায়কে সাহায্য দান করতে উদ্বুদ্ধ করে, তেমনি বরং তার চাইতেও বেশী তীব্রতার সঙ্গে সে সত্য-বঞ্চিত মানবগোষ্ঠীকে সৌভাগ্যের কুঞ্জি সরবরাহ করার জন্যে তাকে ব্যাকুল করে তোলে; কারণ সে-কুঞ্জি পাবার পর তারা আর কখনো ক্ষুধার্ত ও উলঙ্গ হবে না (أَنَّ لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى), তাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে কোন আশঙ্কা থাকবে না, তাদের অতীত এবং বর্তমান সম্পর্কেও কোন ভয় থাকবে না। (لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)। তার ঈমানী দৃষ্টিভঙ্গিই তাকে বলতে থাকে যে, অন্যান্য মানুষের প্রতি এই মৌলিক ও প্রধানতম কল্যাণ-কামনা প্রদর্শিত না হলে বাকী সমস্ত সহানুভূতি ও কল্যাণ-কামনাই অর্থহীন। কারণ এ সবের দ্বারা খোদার বান্দাদের প্রতি কর্তব্য আদৌ পালিত হবে না আর খোদার বান্দাদের প্রতি কর্তব্য পালন না-করা খোদার প্রতি কর্তব্য পালন না করারই শামিল।

ঈমান, ইসলাম ও তাকওয়ার সঙ্গে 'সুকৃতির আদেশ'-এর এ হচ্ছে অভ্যন্তরীণ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক। এ ছাড়া তাদের সঙ্গে তাদের একটা বাহ্যিক ও যুক্তিযুক্ত সম্পর্ক রয়েছে। একে আমরা ইসলামী দাওয়াতের রাজনৈতিক প্রয়োজনও বলতে

পারি। অর্থাৎ সুকৃতির আদেশটা ঈমান ও ইসলামের স্বাভাবিক দাবি হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের একটি রাজনৈতিক প্রয়োজনও আছে বটে। আর তা হল এই যে, ইসলামী দাওয়াতের ঝাণ্ডাবাহী দল শুধু পুণ্য ও সুকৃতি প্রতিষ্ঠার কর্তব্য পালন করেই নিজের ঈমানী মর্যাদা পুরোপুরি বজায় রাখতে এবং নিজস্ব লক্ষ্য অর্জনে সম্পূর্ণ কামিয়াব হতে পারে। এর বিভিন্ন কারণ রয়েছেঃ

(১) ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বাস্তব সংগ্রাম হচ্ছে সত্য ও মিথ্যার এক দীর্ঘ ও প্রচণ্ড লড়াইরই অপর এক নাম। লড়াই ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যাপারে প্রকৃতির একটি অবিচল নিয়ম এই যে, অগ্রগতির বাস্তব সাহসিকতা যার রয়েছে, সাফল্য কেবল সে-ই লাভ করে। অস্তিত্ব, ঊর্ধ্বতন ও ক্রমবিকাশ কেবল সম্মুখগতির মধ্যেই রয়েছে। কোন প্রকাণ্ড শক্তিশালী বাহিনীও যদি শত্রুর মুকাবিলায় সামনে এগিয়ে হামলা করতে না জানে, তবে পরাজয়ের হাত থেকে সে কিছুতেই বাঁচতে পারে না। অনুরূপভাবে কোন আন্দোলন যদি শুধ অভ্যন্তরীণ সংগঠন পুনর্গঠন নিয়েই ব্যস্ত থাকে আর বাহ্যিক পরিবেশের সংশোধনের প্রতি অমনোযোগী হয়, তবে সেও পতনের হাত থেকে বাঁচতে পারে না। এই কারণেই যে দল বা জামায়াত আল্লাহর মনোনীত দ্বীনের প্রতিষ্ঠার জন্যে সচেষ্ট, সে শয়তানী ঘাঁটিগুলোর ওপর ক্রমাগত হামলা না-চালানো পর্যন্ত কিছুতেই সাফল্যের উপযোগী হতে পারে না। আর এই হামলা যে-অস্ত্রের দ্বারা করা যেতে পারে, তা হচ্ছে সুকৃতির আদেশ ও দুষ্কৃতির প্রতিরোধ নামক অস্ত্র।

(২) একটি প্রাণীদেহ যেমন বিভিন্ন কারণে কিছু-কিছু করে ক্ষয় হতে থাকে এবং তার স্বাভাবিক শক্তি বহাল রাখা ও তার শিরা-উপশিরায় রক্ত সঞ্চালিত করে ক্ষয়প্রাপ্ত শক্তি পূরণ করার জন্যে উপযুক্ত খাদ্যের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তেমনি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়োজিত দলকেও এমন সব কারণ ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, যা তার শক্তিমত্তাকে প্রভাবিত করে ফেলে। এই কারণে তার ঈমানকেও শক্তি-সঞ্চারক খাদ্য সরবরাহের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই খাদ্য তার ঈমানকে সতেজ, গতিবান ও উন্নতিশীল রাখার জন্যে তার মধ্যে খোদাপরস্তির শক্তি সঞ্চারিত করতে থাকে। এ-কাজটি যদি না হয় তো তার শক্তি ধীরে-ধীরে নিস্তেজ হতে থাকবে এবং তার নিজের উপর থেকেই দ্বীনের কর্তৃত্ব শিথিল হয়ে পড়বে। এইসব 'শক্তি-সঞ্চারক খাদ্যে'র ভিতর–যাদ্বারা ঈমানী শক্তি অর্জিত হয়–'সুকৃতির আদেশ ও দুষ্কৃতির প্রতিরোধ' হচ্ছে একটি উত্তম 'খাদ্য'।

(৩) এই বিশ্বজগত এবং এর প্রতিটি জিনিসকে স্বভাবতই গতিবান করে সৃষ্টি করা হয়েছে–স্থিতির সঙ্গে এর প্রকৃতি একেবারেই অপরিচিত। এই কারণে কোন এক বিশেষ স্থানে সে স্থির হয়ে থাকতে পারে না। তাকে কোন না কোন দিকে গতিশীল হতে হবেই। সে যদি সামনে এগোবার সুযোগ না পায় তো অবশ্যই পিছু হটতে থাকবে। গতিশীলতার এই নিয়মটি ইসলামী জীবন প্রতিষ্ঠার

ব্যাপারেও ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। এর প্রকৃতিই হল, একটি জীবন্ত ও বিজয়ী আন্দোলনরূপে যথারীতি এর সামনে অগ্রসর হওয়া উচিত। নতুবা যেখানেই সে স্থির হয়ে দাঁড়াবে এবং তার গতিশলতা স্থিতিশীলতায় রূপান্তরিত হবে, সেখান থেকেই সে পিছু হটতে শুরু করবে। এই গতিশীলতার একটি মাত্র বাস্তব রূপ রয়েছে, যার নাম হচ্ছে সুকৃতির আদেশ ও দুষ্কৃতির প্রতিরোধ।

এই সকল অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণেই সুকৃতির আদেশ হচ্ছে ঈমান, ইসলাম ও তাকওয়ার এক স্বাভাবিক দাবি।

বিশ্বনবীর অনুসৃত কর্মনীতির সাক্ষ্য

ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার এই কর্মনীতি ও কর্মপন্থা তো আমরা কুরআন থেকে পেলাম। এবার কুরআনের শিক্ষাদাতা বিশ্বনবী (স)-এর অনুসৃত কর্মনীতির প্রতি আলোকপাত করলে দেখা যাবে যে, কুরআনের ভিতর যে নীতি শব্দের আকারে সুরক্ষিত ছিল, এখানে তা বাস্তব রূপেই বর্তমান রয়েছে। এবং সেই নীতির ভিত্তিতেই বিশ্বনবী (স) একটি জাতি গঠন করে আল্লাহ্‌র মনোনীত জীবন-ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন।

মহানবীর আমলে গোটা আরব দেশ ছিল শয়তানী শক্তির লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ। সেই প্রতিকুল পরিবেশে তিনি আপন সংগ্রামের সূচনা করলেন। একটি সংক্ষিপ্ত কালেমা দ্বারা। সে-কালেমার বাস্তব অর্থ ছিল এই যে, মানুষের তামাম চিন্তা-কল্পনা, আবেগ-প্রবণতা এবং তার জীবনের তাবৎ সমস্যা ও বিষয়কে এক আল্লাহর বিধানের অধীন করে দিতে হবে। তিনি ছাড়া এই দুনিয়ায় আর কেউ নিজের স্বাধীন মর্জি মাফিক আইন ও শাসন চালাবার অধিকারী নয়। এই অভিনব আওয়াজটি যেসব বধির কানে গিয়ে ফিরে এসেছিল এবং একে স্তব্ধ করার জন্যে যেসব মানবতা-ধ্বংসী জুলুম-পীড়নের আশ্রয় নেয়া হয়েছিল, কোন দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরই তা অজানা নয়। রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাকে রক্তচক্ষু দেখিয়েছে, দেশের স্বার্থ বাধা সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছে, সময় ও পরিবেশ সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। অসুবিধা ও বিপদাপদ পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। ধ্বংস ও মৃত্যু-বিভীষিকা আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র এই বান্দাহ তাঁর আওয়াজ কখনো এতটুকু স্তিমিত হতে দেননি। বরং যুগধর্ম, ঘটনাপ্রবাহ এবং ভবিষ্যতের সম্ভাব্য বিপদাপদ-এর প্রতিটি জিনিসের প্রতি চোখ বন্ধ করে যে সত্য-তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, অন্যের কাছে তা-ই প্রচার করে চলছিলেন অবিশ্রান্তভাবে। নিজস্ব তওহীদ-বিশ্বাস ও জীবন-দর্শনে তিনি ছিলেন নিতান্তই একাকী; কিন্তু তা সত্ত্বেও সে বিশ্বাস ও দর্শনকে এক মুহূর্তের তরেও তিনি গোপন করে রাখতে সম্মত হননি—অথচ তাঁর বাকশক্তি রুদ্ধ করার জন্যে গোটা দুনিয়াই ছিল দৃঢ় সঙ্কল্প।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সত্যের দাওয়াতই লোকদের হৃদয় জয় করতে শুরু করল এবং যাদের মধ্যে সত্য গ্রহণ করার মত যোগ্যতা তখনও বাকী ছিল তারা দু'একজন করে তাঁদের অনুবর্তি দলে এসে শামিল হতে লাগল। তিনি তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম এক খোদার গোলামী ও বন্দেগীর ছাপ অঙ্কিত করে দিলেন এবং নীতিগতভাবে তাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন যে, তাঁর সন্তুষ্টি লাভই তোমাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। কারণ, তিনি যেমন তোমাদের জীনব দান করেছেন, তেমনি জীবন ধারণের উপায়-উপকরণও সরবরাহ করেছেন। তাঁর আইন-বিধানই শুধু তোমাদের মানা উচিত। কারণ, তিনি ছাড়া সব তোমাদের মতই দুর্বল ও পরাধীন। এমনিভাবে ক্রমাগত শিক্ষা ও ট্রেনিং-এর সাহায্যে তাদের দিলকে তিনি এক খোদার বন্দেগীর জন্যে এক অজেয় দুর্গে পরিণত করলেন। এমনি অজেয় যে, তওহীদী আদর্শের দুশমনরা তাদের জুলুম, উৎপীড়ন ও প্রতিহিংসার তাবৎ অস্ত্র প্রয়োগ করেও কোন মুমিনের দিলকে তওহীদের ভালবাসা থেকে মুক্ত করতে পারেনি।

এই শিক্ষা, অনুশীলন ও পরিশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী দলের অন্তর্ভুক্ত লোকদেরকে তিনি একই পবিারভুক্ত লোকদের মত পরস্পরে মিলিয়ে দিতে লাগলেন। নৈতিক দিক থেকে এই মিলন এতখানি সুদৃঢ় ছিল যে, তার সামনে ভাই-ভাই সম্পর্ক পর্যন্ত ম্লান হয়ে গেল। অপরদিকে সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে তা এমনি সুসংহত ও সুসঙবদ্ধ প্রমাণিত হল যে, আজ পর্যন্ত দুনিয়ার কোন সংগঠন তার সংঘবদ্ধতাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেনি। এই ব্যাপারে তিনি মুসলমানদেরকে যে অসাধারণ নির্দেশ প্রদান করেন, তার বিস্তৃত আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। আর সেই নির্দেশকে তাঁরা যেভাবে কার্যকরী করেছেন, বিশ্ববাসীর সামনে তাও অত্যন্ত স্পষ্ট। জীবনের সমস্যাবলী ও বিষয়াদিতে যখনি সংঘবদ্ধতার কোন সুযোগ এসেছে–সে বিষয় যত সাধারণই হোকনা কেন–তাকে তিনি হাতছাড়া হতে দেননি। এমনকি, তিন ব্যক্তি একত্রে কোথাও সফরে গেলে তাদের মধ্যেও একজনকে আমীর (নেতা) বানাবার এবং তারই নেতৃত্বাধীনে পথ চলবার জন্যে তিনি নির্দেশ দিতেন– (إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ (مشكوة)) এইভাবে তিনি মুসলমানদের মন-মানসে সংঘবদ্ধতার গুরুত্ব দুঢ়মূল করে দেন এবং তাদেরকে একই দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত পরস্পর জুড়ে দেন। আর এই ঐক্যের মধ্যে বিভেদ ও বিশৃঙ্খলার বীজ যাতে পথ খুঁজে না পায়, এরও তিনি পুরোপুরি ব্যবস্থা করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাদেরকে পুরোদস্তর সতর্ক করে দেন যে, জাতির এই ঐক্য ও সংহতি কেবল মামুলি ধরনের একটি 'রাজনৈতিক' প্রয়োজনই নয়, বরং একটি খাঁটি দ্বীনি প্রয়োজন। এই প্রয়োজন ছাড়া যে-কাজের জন্যে একজন নবী হিসেবে আমার এবং একটি জাতি হিসেবে তোমাদের আবির্ভাব ঘটেছে, তা কিছুতেই পূর্ণ হতে পারে না। তোমাদের মাথার ওপর আল্লাহর সাহায্য ঠিক তখনি ছায়া বিস্তার করবে, যখন তোমরা জামায়াত

(একটি সংঘবদ্ধ দল) রূপে বাস করবে يَدُ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ । যে-ব্যক্তি এই জামায়াতী শৃঙ্খলা থেকে এক বিঘত পরিমাণও দূরে থাকল সে যেন আপন গলদেশ থেকে ইসলামের বেড়িই খুলে ফেলল– مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يُرَاجِعَ - ترمذى –আর এই বিচ্ছিন্ন অবস্থায়ই যদি সে মরে যায়, তবে তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু। مَنْ مَاتَ وَهُوَ مُفَارِقٌ لِلْجَمَاعَةِ مَاتَ مَيْتَةً الْجَاهِلِيَّةِ، مسلم জাতির পবিত্র ঐক্যসূত্রকে যে ছিন্ন করার চেষ্টা করবে, তার শিরোচ্ছেদ কর—

مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هٰذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ (مسلم)

এই দু'টি বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি এবং তাঁর সঙ্গী মুমিনরা আল্লাহর দ্বীনকে অন্যান্য লোকদের কাছে পৌঁছানোর কাজে যথারীতি নিয়োজিত থাকতেন। এবং যাকেই জাহেলিয়াতের ময়লায় লিপ্ত দেখতেন, তাকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে এক খোদার পূজারী, এক মনিবের গোলাম ও এক শাহানশার প্রজার বানাবার চেষ্টা করতেন। তাঁরা যে-কোন দুষ্কৃতিকে দেখা মাত্রই তাকে নির্মূল করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। মোটকথা, অনাচার, অবিশ্বাস ও বিশৃঙ্খলার যে সয়লাব থেকে খোদা তাঁদের নাজাত দিয়েছেন তাতে অন্য কাউকে নিমজ্জমান দেখতে তাঁরা কিছুতেই প্রস্তুত ছিলেন না। এই দাওয়াতী সংগ্রাম মক্কায় মাত্র ১৩ বছর চলতে পেরেছিল। অতঃপর তার সাফল্য ও ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি সত্যের দুশমনদের পক্ষে অসহনীয় হয়ে দাঁড়াল। তাঁরা নবী করীম (স)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে চাইল। এই কারণে তিনি এবং তাঁর অনুবর্তিগণ তাঁদের প্রিয় জন্মভূমিকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং মদীনায় গিয়ে তাঁদের আন্দোলনের কেন্দ্র স্থাপন করেন। কিন্তু দুশমনরা সেখানেও তাঁদের নিশ্চিন্তে থাকতে দিল না। অবশ্য মুমিনদের একটি সুসংঘবদ্ধ দল ইতোমধ্যেই সংগৃহীত হয়েছিল। তাই দুষ্কৃতিকে সমূলে উৎপাটিত করে সুকৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করার শেষ অস্ত্রটি এবার প্রয়োগ করা হল। অর্থাৎ পাপাচারকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে আন্তরিক ও মৌলিক প্রচেষ্টা ছাড়াও এবার 'হাতের' প্রচেষ্টাও শুরু হয়ে গেল। কিছু কাল পর্যন্ত শয়তানী শক্তিগুলোই অগ্রবর্তী হয়ে মদীনার উপর হামলা চালাতে লাগল। নবী করীম (স) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ শুধু প্রতিরক্ষার কাজ করতে লাগলেন। এই প্রতিরক্ষায় তাঁরা জান ও মালের সব রকম সম্ভাব্য কুরবানী দিয়ে সত্যের সাক্ষ্য পূর্ণ করে দিলেন। এমনকি, এই প্রতিরক্ষামূলক নীতির মধ্যেই কুফরীর প্রতিপত্তি খর্ব হতে লাগল এবং গোটা আরব দেশে শয়তানী শক্তির ঝাণ্ডা ভূমিসাৎ হল। এই বিজয় দেখে মুসলমানদের হৃদয় আল্লাহর সাহায্যের জন্যে আনন্দ ও

কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তাদের পক্ষে তখনও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার কোন অবকাশ ছিল না। এই কারণেই তাঁদের সওয়ারী পশুর পিঠের জিন ও হাওদা আগের মতই বাঁধা রইল। কারণ আরবে যদিও দুষ্কৃতিকারী শক্তি পরাজিত হয়েছিল, কিন্তু তার বাইরে সর্বত্র তার কর্তৃত্ব পূর্ণ সমারোহে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর দুষ্কৃতি যেখানেই থাক, তাকে নিশ্চিহ্ন করতেই হবে–এ কর্তব্যটি মুসলমানরা কিছুতেই ভুলতে পারল না।

একটি ভুল ধারণার নিরসন

এই দীর্ঘ আলোচনা থেকে এ সত্য একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এই তিনটি মৌলিক নীতি কুরআন ও সুন্নাহ উভয় থেকেই প্রমাণিত হয়। এ কারণে, এই তিনটি মূলনীতিকে পূর্ণ সঙ্কল্প ও দৃঢ়তার সঙ্গে বাস্তবায়িত না করলে এ দায়িত্ব কিছুতেই পালিত হতে পারে না। কিন্তু এ ব্যাপারে কারো এই ভুল ধারণা হওয়া উচিত নয় যে, এটা বাস্তবায়নে কোন কালগত ধারাক্রম রয়েছে এবং সে অনুসারে প্রথম নীতিটি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হবার পর দ্বিতীয়টির সূচনা করা এবং দ্বিতীয়টি কার্যকরী করার পর তৃতীয়টি অনুসরণ করা আবশ্যক। বরং তার বিপরীত–সত্য কথা হল এই যে, ঐ তিনটি মূলনীতির ওপরই যুগপৎ কাজ শুরু করা উচিত। এই বিরাট অভিযানের প্রক্কালে মানুষের একমাত্র প্রয়োজন হলঃ মনের পূর্ণ একাগ্রতা ও অন্তরের খাঁটি সাক্ষ্য সহকার 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-র প্রতি দৃঢ় ঈমান পোষণ করা। এই ঈমান ও স্বীকৃতির পর এক ব্যক্তি যখন 'হে ঈমানদারগণ' বলে আমন্ত্রিত লোকদের দলে শামিল হয়ে যায়, তখন কুরআন একই সঙ্গে এই তিনটি মূলনীতি তাঁর সামনে উপস্থিত করে। এমতাবস্থায় নিজের অবস্থা, সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুসারে এদের বাস্তবায়নের চেষ্টা করাই হচ্ছে তার কর্তব্য।

এক কথার–এই তিনটি মুলনীতির ভিত্তিতে এক সঙ্গে কাজ করার সব চাইতে বড় প্রমাণ হল এই যে, বাস্তব অনুসৃতির দিক থেকে এদের মধ্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করা আদপেই সম্ভব নয়। কারণ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় নীতিদ্বয় নিজস্ব স্বরূপের দিক থেকে প্রথম নীতির প্রভাব-বর্জিত কোন স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন নীতিই নয়; বরং তারা সেই মূলকাণ্ডেরই শাখা-প্রশাখা মাত্র কিংবা অন্তত তার স্বাভাবিক দাবিসমূহের অন্তর্গত। কাজেই এদেরকে গ্রহণ না করে প্রথম নীতিকে কার্যকরী করাই সম্ভব নয়। অন্য কথায়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধারাকে কার্যকরী করা আসলে প্রথম ধারার বাস্তবায়নকে পূর্ণতর করারই শামিল।

এই দাবির যথার্থতা প্রমাণ করার জন্যে কোন নতুন আলোচনার প্রয়োজন নেই; ইতোপূর্বে তাকওয়ার যে-সঠিক, পূর্ণাঙ্গ ও বাস্তব মর্মার্থ বিবৃত করা হয়েছে, সেটুকু ভালমত অন্তর্নিবিষ্ট করে নেয়াই যথেষ্ঠ। আর তা হল এই যে, আল্লাহ তায়ালার অবতীর্ণ সমগ্র বিধি-ব্যবস্থার যথাযথ অনুবর্তন এবং তাঁর নির্ধারিত

সীমারেখার অনুসরণকেই বলা হয় তাকওয়া। এই বিষয়টিকে যদি মনের ভিতর দৃঢ়ভাবে বদ্ধমুল করে দেয়া যায় তো এ-সত্য আপনার থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার শেষ মূলনীতি দু'টি প্রকৃতপক্ষে প্রথম নীতিরই শাখা-প্রশাখা কিংবা তার নিকটতম দাবিসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এর কারণ এই যে, কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে যে সব বিধি-ব্যবস্থা ও সীমারেখার অনুসরণ ও অনুবর্তনকে তাকওয়া বলা হয়, আপন লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে তামাম ঈমানদার লোকদের পরস্পর ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত হওয়া এবং সুকৃতির আদেশদানকে নিজস্ব ঈমানী জিন্দেগীর কর্মনীতি বানিয়ে নেওয়াও তারই অন্তর্ভুক্ত। তাই সর্বপ্রথম পারস্পরিক ঐক্য সম্পর্কেই কয়েকটি আয়াতের সাক্ষ্য দেখুনঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ* (توبة: ١١٩)

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় (তাকওয়া) কর এবং সাচ্চা মুমিনদের সঙ্গে থাক। (তাওবা ঃ ১১৯)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ* (حجرات : ١٠)

ঈমানদার লোকেরা পরস্পর ভাই-ভাই; অতএব দুই ভাইয়ের মধ্যে (মতভেদ ও বিরোধ সৃষ্টি হলে) নিষ্পত্তি করিয়ে দাও। তোমরা আল্লাহকে ভয় (তাকওয়া) কর, যাতে করে তাঁর অনুগ্রহলাভে ধন্য হতে পার। (হুজরাত ঃ ১০)

وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ* (روم: ٣١-٣٢)

তাকে ভয় (তাকওয়া) কর, নামায কায়েম কর এবং মুশরিকদের সঙ্গে থেকো না। অর্থাৎ সেই সব লোকের সঙ্গে যারা নিজস্ব দ্বীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে আর এখন প্রত্যেক দলই নিজ নিজ চিন্তা-কল্পনায় লিপ্ত হয়ে আছে। (.......ঃ ৩১-৩২)

এর প্রথম আয়াতে সাচ্চা মুমিনদের সঙ্গে যুক্ত থাকাকে, দ্বিতীয় আয়াতে দু'টি বিচ্ছিন্ন মুমিন হৃদয়কে পুনর্বার জুড়ে দেয়াকে 'তাকওয়া' বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর তৃতীয় আয়াতে একদিকে জাতীয় অনৈক্যকে শির্কের প্রতীক আখ্যা দেয়া হয়েছে। অন্যকথায় বলা হয়েছে, জাতীয় ঐক্য হচ্ছে তওহীদের নিদর্শন। অপরদিকে এতে তওহীদ-বিশ্বাসীদের কাছে তাকওয়া ও নামায প্রতিষ্ঠার দাবি করা হয়েছে। এই দু'টি জিনিসের মধ্যে একটি (অর্থাৎ–তাকওয়া) হচ্ছে তওহীদের অন্তরঙ্গ, অপরটি (অর্থাৎ–নামায) বহিরঙ্গ। এই সকল বিষয় থেকে এ

সত্য স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, জাতীয় অনৈক্য নামায ও তাকওয়া উভয়েরই মুল ভাবধারার পরিপন্থী। পক্ষান্তরে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি হচ্ছে তাকওয়ার অন্যতম জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। এটি বর্তমান না-থাকা প্রকৃত তাকওয়ার অস্তিত্ব না-থাকারই শামিল।

এই ভাবে সুকৃতির আদেশ দানকেও কল্যাণ ও তাকওয়ার কাজ বলে অভিহিত করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আরও কয়েকটি আয়াত দেখুনঃ

يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرَاتِ .... وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ*

(ال عمران: ١٠-١٤)

এরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান পোষণ করে, সুকৃতির আদেশ দেয় ও দুষ্কৃতি থেকে বিরত রাখে এবং উত্তম কাজে নিয়োজিত থাকে। .....আর আল্লাহ মুত্তাকী লোকদের সম্পর্কে অবহিত।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ* (توبة: ١٢٣)

হে ঈমানদারগণ! তোমরা সেই সব কাফেরদের সঙ্গে লড়াই কর, যারা তোমাদের নিকটে রয়েছে এবং তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। স্মরণ রেখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সঙ্গে রয়েছে।

এর প্রথম আয়াতে স্পষ্টত সুকৃতির আদেশ ও দুষ্কৃতির প্রতিরোধকে মুত্তাকী লোকদের বিশিষ্ট গুণ এবং তাকওয়ার কাজ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় আয়াতে দুষ্কৃতি প্রতিরোধের একটি বিশেষ রূপ–অর্থাৎ ইসলামের দুশমনদের সঙ্গে লড়াই করাকে তাকওয়া বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এবার আর একটি আয়াতে এই দু'টি সত্যকে একত্রে দেখুনঃ

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (توبة)

মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী পরস্পরের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক; তারা লোকদেরকে সুকৃতির আদেশ দেয় ও দুষ্কৃতি থেকে বিরত রাখে।

এই আয়াতে জাতীয় ঐক্য ও সুকৃতির আদেশ দান–উভয় জিনিসকে ঈমানের বাস্তব রূপ হিসেবে একই সঙ্গে পেশ করা হয়েছে।

এই সমস্ত আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে এ-ভ্রান্তির আর কোন অবকাশই থাকেনা যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম ধারাটি পুরোপুরি কার্যকরী না হলে এবং মানুষের অন্তর্দেশ তাকওয়ার আলোয় উদ্ভাসিত না হলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধারার প্রতি মনোনিবেশ করাই সমীচীন নয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, এই ধারণাটি একটি জীবন্ত সত্য হয়ে আমাদের বেশুমার লোকদের মন-মানসের ওপর চেপে আছে এবং ইসলামের খেদমত সম্পর্কে আমাদের চিন্তা ও কর্মের গতিকে এটি একেবারেই বদলে ফেলেছে। ইসলামী খেদমতের যে-গাড়ীর তিনটি চাকার ওপর চলা উচিত ছিল এবং ঐ তিন চাকা ছাড়া যা আইনত চলতেই পারে না, তাকে শুধু একটি মাত্র চাকার দ্বারা চালাবার বিস্ময়কর প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এর স্বাভাবিক ফল দাঁড়াচ্ছে এই যে, এ-গাড়ীটি এক ইঞ্চি পরিমাণও সামনে না এগিয়ে নিজ জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাটিতে ধ্বসে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এ-ধারণাটি হচ্ছে এক প্রকাণ্ড আবরণ—এটি বিশেষভাবে আমাদের ধার্মিক লোকদের দৃষ্টিশক্তির উপর পড়ে আছে। এর বাহির দিকটি নিঃসন্দেহে ধর্মপরায়ণমূলক; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসলামী চিন্তা-পদ্ধতির সঙ্গে এই মতবাদের কোনই সম্পর্ক নেই। কারণ এক ব্যক্তি যখন ঈমানদার লোকদের দলভুক্ত থাকে এবং নিজস্ব সাধ্যানুযায়ী সুকৃতির আদেশ দানের দায়িত্ব পালন করে যায়, কেবল তখনই সে সাচ্চা মুত্তাকী হতে পারে। এমতাবস্তায় একজনকে প্রথমেই আদর্শ ও পূর্ণাঙ্গ মুত্তাকী হতে হবে এবং তারপরই সে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি এবং সুকৃতির আদেশ দানের কাজ করতে পারবে—এ ধরনের কথা বলা একান্তই অর্থহীন। বস্তুত ঐ তিনটি ধারার দৃষ্টান্ত হচ্ছে একটি বৃক্ষের শাখা-প্রশাখার মতঃ যেমন বীজ থেকে কচি অঙ্কুর উদগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাতে শিকড়, কাণ্ড ও পাতার সৃষ্টি শুরু হয়ে যায় এবং এই তিনটি জিনিস একই সঙ্গে বিকশিত হতে থাকে। কখনো বীজ থেকে শিকড় বেরিয়ে খুব মোটা-তাজা হওয়ার পর তার থেকে কাণ্ড বেরোতে এবং কাণ্ড পূর্ণ পরিণতি লাভ করার পর তার থেকে পাতা বেরোতে দেখা যায় না।

অনুরূপভাবে মানুষের অন্তরে যখন ঈমানের বীজ বপন করা হয়, তখন তার থেকে শুধু তাকওয়ার শিকড়ই বেরোয় না এবং এক দীর্ঘকাল যাবত খুব মোটা তাজা ও মজবুত হওয়ার পরই জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও সুকৃতির আদেশ দানের সুযোগ আসে না, বরং দাঁড়ায় এই যে, অঙ্কুর উদগমের সঙ্গে সঙ্গেই তার থেকে জাতীয় ঐক্য ও সুকৃতির আদেশ দানের শাখা-প্রশাখা ও পত্র-পল্লব বেরোতে থাকে। অতঃপর ভূমির উর্বরতা ও বীজের উৎকর্ষতা অনুযায়ী তাকওয়ার শিকড় যতটা গভীরে গিয়ে পৌছায় ডাল-পালা ও পত্র-পল্লবও ততটাই উন্নত ও সবুজ-শ্যামল রূপ ধারণ করতে থাকে। এমনকি, একদিন চারদিকে أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ এর মনোরম দৃশ্য পরিস্ফূট হয়ে উঠে।

দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম হচ্ছে এমন একটি সংগ্রাম যাতে পুরোপুরি চেষ্টা চালানো হলে ব্যর্থতার কোন সম্ভাবনাই বাকি থাকবে না। কারণ, মুমিন তার শক্তি-সামর্থ্যকে এই কাজে নিয়োজিত করবে এবং তার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত নিয়োজিত রাখবে– তার কাছে তার প্রভুর দাবি এর চাইতে মোটেই বেশী নয়। তার কাছ থেকে হিসাবও এইটুকুরই গ্রহণ করা হবে। তাতে যদি তার আচরণ এ রকম ছিল বলে প্রমাণিত হয় তো খোদার সন্তুষ্টি তাকে পরিবেষ্টন করে নিবে এবং আখেরাতের কল্যাণ লাভে সে ধন্য হবে। কাজেই সে যখন দুনিয়ায় এই প্রচেষ্টার হক আদায় করল, তখন স্পষ্টত সে নিজের জীবন-লক্ষ্য এবং ঈমানের বুনিয়াদী দাবি পূরণ করল।

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব

খায়রুন প্রকাশনী ©